ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি'র পুরস্কারপ্রাপ্ত

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন

২০০৬-২০১০

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি'র পুরস্কারপ্রাপ্ত

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন

২০০৬-২০১০

টিআইবি'র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন ২০০৬-২০১০

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৩
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

এই সংকলনে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসমূহের মতামত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের নিজস্ব এতে টিআইবি'র প্রাতিষ্ঠানিক মতামতের প্রতিফলন নেই।

সম্পাদনা
আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, টিআইবি

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: **978-984-33-7980-1**

মুখবন্ধ

গণমাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৯ থেকে প্রতিবছর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যা একদিকে যেমন সাধারণ পাঠককে দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে অবহিত করে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে প্রতিকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। গণমাধ্যমের এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উত্তরোত্তর বিকাশে সহায়ক হিসেবে টিআইবি'র বাৎসরিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার। ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাছাই করা ১২টি প্রতিবেদন নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলনটির দ্বিতীয় খণ্ড।

সংকলনটি গণমাধ্যম কর্মী, গবেষক, নীতি নির্ধারক এবং শিক্ষার্থীসহ দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে আগ্রহী সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করছি। পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক, জুরিবোর্ডের সদস্য, সংবাদপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদক এবং সংকলনটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

প্রতিবেদনের নাম	পৃষ্ঠা
আমরা কি খাচ্ছি!	০৭
ডায়াগনস্টিক সেবার নামে প্রতারণা	৩৭
খুলনা মহানগরীর স্বাস্থ্যসেবার হালচিত্র	৫১
মধুপুরের বিভিন্ন ব্যাংক, সাব-রেজিষ্টার অফিস ও ভূমি অফিস কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে জালিয়াতির সিন্ডিকেট	১০৫
উপাচার্য-কথা	১১১
Grafts reign supreme in import trade	১৪৭
দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৬৭
Justice delayed, justice denied	১৮৯
খুলনায় অবৈধ পাঠ্য বইয়ের কারবার	১৯৯
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের হালচাল	২১৫
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	২২৯
কোচিং নির্ভর শিক্ষা	২৬৫

আমরা কি খাচ্ছি!

প্রতিবেদন
আমরা কি খাচ্ছি

প্রতিবেদক
আবুল খায়ের

প্রকাশের তারিখ
২০ জুন ২০০৫ থেকে
৩১ জুলাই ২০০৫

সংবাদপত্র
দৈনিক ইত্তেফাক

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক ইত্তেফাক
সিনিয়র রিপোর্টার

মরা মুরগি ভেজাল ও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি খাবারে মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা, নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই

রাজধানীতে মরা মুরগি দিয়ে খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে বাজারজাত, বিষাক্ত রং মেশানো ফলসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী এবং ভেজাল ও নিম্নমানের খাবার ব্যাপকহারে বাজারজাত করা হলেও এর নিয়ন্ত্রণ করার মত কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন, ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী এখন ভয়ংকর পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার ফলে ক্যান্সার, কিডনী নষ্ট, লিভারের ক্ষতি ও সংক্রামক ব্যাধিসহ বিভিন্ন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন গত এক বছরে প্রায় এক হাজার খাবারের হোটেল ও ফাস্ট ফুডের দোকানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে লাইসেন্সকৃত খাবারের হোটেল, ফাস্টফুডের দোকানের সংখ্যা সহস্রাধিক এবং অবৈধ দশ সহস্রাধিক বলে কমকর্তারা জানান।

রাজধানীতে মরা মুরগি একশ্রেণীর হোটেল, ফাস্টফুড ও চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সরবরাহের ঘটনা নিয়ে গতকাল রবিবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন প্রশাসনে তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল দৈনিক ইত্তেফাকে মরা মুরগি সরবরাহ নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের টনক নড়ে। সিটি কর্পোরেশন থেকে রাজধানীর সকল মুরগির আড়তকে মরা মুরগি সরবরাহে কিংবা বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা এবং মরা মুরগি বিক্রি ও যত্রতত্র ফেলে রাখা থেকে বিরত থাকার জন্য গতকাল নির্দেশ জারি করা হয়। গতকাল কাপ্তান বাজারে আড়তদার সমিতি মরা মুরগি বেচাকেনা বন্ধ এবং সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে গতকাল সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগে মরা মুরগি বেচাকেনা ও সরবরাহসহ খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণের করুণ ও বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরেন। কর্মকর্তারা বলেন, রাজধানীতে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ করার যে অর্ডিন্যান্স রয়েছে তা ৪৬ বছর আগের তৈরি। এত বছরে এ অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা হয়নি। এই অর্ডিন্যান্সে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য বাজারজাত, বিক্রি, সংরক্ষণ এবং তৈরি করার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন আইন নেই। মাত্র ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা জরিমানা এবং তিনদিন থেকে তিনমাস কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এ অর্ডিন্যান্সে শুধু ১০৭ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল ও মান নিয়ন্ত্রণ করতে সিটি কর্পোরেশন কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর বাইরে কোন ভেজাল ও অন্য খাদ্যদ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। এই অর্ডিন্যান্সের বাইরে কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে কর্মকর্তারা উল্টা হয়রানির শিকার হন। অর্ডিন্যান্সে পানির মান নিয়ন্ত্রণ করার বিধান নেই।

ভেজাল ও নিম্নমানের প্রমাণিত হলে জড়িত হোটেল মালিক কিংবা যেকোন খাদ্যদ্রব্য তৈরি ও বাজারজাতকারীরা জরিমানা পিয়নের মারফত পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। সাধারণত তাদের সাজা হয় না এবং কেবল জরিমানাই হয়। এই অর্ডিন্যান্সের কারণে ভেজাল খাদ্যসামগ্রী সরবরাহকারী হোটেল ও ফাস্টফুড দোকানের মালিকরা সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গুরুত্ব দেয় না। দুর্বল অর্ডিন্যান্সের কারণে মরা মুরগি সরবরাহসহ এই ধরনের জীবনহানিকর খাদ্যদ্রব্য এখন প্রকাশ্যে বাজারজাত, সংরক্ষণ ও বিক্রি হচ্ছে। পরিস্থিতি খুবই নাজুক অবস্থা বলে কর্মকর্তারা জানান।

রং মেশানো ও মরা মুরগি এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারে যে ধরনের রোগ-ব্যাধি হয়

রং দিয়ে কাঁচা ফল পাকানো ও টমেটো, অন্যান্য সবজি, মসল্লা কিংবা খাদ্যদ্রব্য রং করে দেদারসে বাজারজাত করা হচ্ছে। ক্রেতারা এসব খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে যান। তারা জানেন না রং মেশানো ফল ও শাক-সবজি কিংবা এ ধরনের যেকোন খাদ্যসামগ্রী স্বাস্থ্যের জন্য কত ক্ষতিকর। ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে কাঁচা ফল ও টমেটো পাকা করা হয়। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য রং করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে। একটি কক্ষে কাঁচা ফল, শাক-সবজি অথবা যেকোন খাদ্যসামগ্রি রেখে এক টুকরা ক্যালসিয়াম কার্বাইড রেখে কক্ষটি বন্ধ করে দিলে কয়েক ঘন্টা পর পাকা রং হয়ে যায়। আবার স্প্রে করে পাকানো হয়। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী রান্না করার মসল্লায় রং মিশিয়ে বিক্রি করে বলে কর্মকর্তারা জানান। ক্যালসিয়াম কার্বাইড এক ধরনের বিষ বলে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা জানান। এই বিষ মেশানো ফল কিংবা যে কোন খাদ্য দ্রব্য খেলে কিডনী নষ্ট, ক্যান্সার, লিভারের মারাত্মক ক্ষতি ও যেকোন ধরনের সংক্রামক এবং মরণব্যাধি হওয়ার আশংকা সবচেয়ে বেশী বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। দেশের অন্যতম কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ হারুন অর রশীদ একই অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, যে কোন রং মেশানো খাদ্যসামগ্রী খেলে ক্যান্সার, কিডনী নষ্টসহ জটিল ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। মরা মুরগি দিয়ে তৈরি খাবার খেলে হঠাৎ কিডনী নষ্টসহ প্রাণহানি হওয়ার মত জটিল ব্যাধির আশঙ্কা প্রায় ৯৯ ভাগ নিশ্চিত এবং শিশুদের জন্য একশত ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। দুর্বল আইন করে এ মারাত্মক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। জেনে শুনে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের মত হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকান তদারকি করার কেউ নেই

গতকাল সরেজমিনে মতিঝিল, শাহজাহানপুর, ফকিরাপুল, পুরাতন ঢাকা ও সায়েদাবাদ এলাকায় গিয়ে বহু হোটেল এবং ফাস্টফুডের দোকানে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের ও ভেজাল মজাদার খাবার খেতে দেখা যায় লোকজনকে। হোটেল ম্যানেজার ও দোকান কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করা হলে তারা জানান, সিটি কর্পোরেশনের লোকজন বছরে দুই একবার আসেন এবং একটি প্যাকেট হাতে তুলে দিলে তারা চলে যান। এই হলো ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের নমুনা। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় চাদর ঝুলিয়ে কিংবা ভবনের গলিতে অসংখ্য খাবারের হোটেল দেখা যায়। হোটেল মালিকরা জানান, সাধারণত তাদের খাদ্যদ্রব্যের মান সম্পর্কে কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করতে আসেনি।

সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা বলেন

রাজধানীর ১০টি অঞ্চলে মাত্র ১৮ জন ইন্সপেক্টর। এই সীমিত জনবল দিয়ে তারা বছরের পর বছর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। একদিকে জনবল সংকট, অপরদিকে দুর্বল অর্ডিন্যান্স। এই দুই বিষয়ের মধ্যে যেটুকু দায়িত্ব পালন করা যায় তাই করা হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা জানান। ১৯৯৩ সাল থেকে ৪৬ বছরের এই অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে শাস্তির বিধান তিন বছর থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানা নিম্নে ৫ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। শুধু এই অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দি। সংশোধিত অর্ডিন্যান্স ব্যতীত ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন।

কেক জেলি ও সসের বেশিরভাগ ভেজাল ও বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো

কেক জেলি সস। সব বয়সের সব মানুষের প্রিয় খাদ্য। চটজলদি খাবারে (ফাস্টফুড) ও সুপের সঙ্গে বেশি করে সস না মেশালে খাওয়াই তো জমে না। কিন্তু কেক সস ও জেলির সাথে আমরা যে বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল গিলছি তা কি আমরা জানি? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, এদেশে এখন জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি হলো ভেজাল ও নিম্নমানের খাবার। এ খাদ্য শিশুদের জন্য ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনবে। তাদের অভিমত জরুরি কর্মসূচী নিয়ে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য বিভাগের খাদ্যসামগ্রীর পরীক্ষাগারের তথ্যানুযায়ী কেক তৈরির জন্য ডালডাসহ যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই ভেজাল, নিম্নমানের ও খাবারের অনুপযোগী। সস ও জেলিতে বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হয়। এগুলো তৈরি করা হয় নোংরা পরিবেশে। সিটি করপোরেশন থেকে জানা যায়, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কেক, সস ও জেলি তৈরীর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিমাসে জরিমানা করা হচ্ছে। কিন্তু দুর্বল অধ্যাদেশের কারণে ১০০ থেকে ৩০০ টাকা জরিমানা দিয়ে সংশ্লিষ্টরা প্রকাশ্যে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসমগ্রী তৈরি ও বাজারজাত করে যাচ্ছে। গতকাল সোমবার সরেজমিনে পুরোন ঢাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার পাড়া-মহল্লার নোংরা পরিবেশে কয়েকটি বেকারি সস ও জেলি তৈরীর কারখানায় গিয়ে যা দেখা গেছে তা পিলে চমকানোর মতো।

ময়দা, ডালডা, তেল, চিনি, ডিম, দুধ, বেকিং পাউডার ও সুগন্ধির জন্য এক ধরনের কেমিক্যাল এবং চাল কুমড়োর মোরব্বা দিয়ে কেক তৈরির কথা জানিয়েছেন কারখানার কর্মীরা।

কেকে পঁচা ডিম ব্যবহারের কথাও তারা স্বীকার করেছেন। তারা নিজেরা জানে না এই রং ও কেমিক্যাল ভাল না মন্দ। ময়লা আবর্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশে কারখানায় শ্রমিকদের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাদের দেহ থেকে ঝরে পড়া ঘাম মিশছে কেক, জেলি, সসে। মাছি, পোকামাকড় বসছে খাদ্যসামগ্রীর উপর ।

সিটি কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারে এই সকল খাদ্যসামগ্রীতে কি ধরনের রং ও কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে তা পরীক্ষার যন্ত্র নেই। তবে কর্মকর্তারা এই সকল খাদ্য সমগ্রী পরীক্ষার জন্য সরেজমিনে নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারেন, উক্ত রং ও কেমিক্যাল এক ধরনের বিষাক্ত দ্রবণ। যে পরিবেশে এ সকল খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা হয়, ক্রেতারা এক নজর দেখলে ওগুলো আর খাবেনা না বলে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের ধারণা।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবিদ হোসেন মোল্লা বলেন, যে কোন ধরনের ভেজাল খাবার শিশুসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য ক্ষতিকর। বিষাক্ত রং কিংবা কেমিক্যাল মেশানো খাদ্যসামগ্রী খেলে রক্তে গিয়ে বিষক্রিয়া করে। দেহযন্ত্রের কার্যক্রম অকেজো হয়ে পড়ে। পরে যে কোন ধরনের জটিল ব্যাধি হতে পারে বলে তিনি জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনকোলজি বিভাগীয় প্রধান ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আকরাম হোসেন বলেন, বিষাক্ত রং কিংবা কেমিক্যাল মেশানো খাদ্যসামগ্রী খেলে মুত্রথলিতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিষক্রিয়া বোন ম্যারোতে জমা হয়। বোন ম্যারো ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে বেশি। এক্ষেত্রে শিশুরাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এক পরিসংখ্যানের কথা উল্লেখ করে বলেন, রংয়ের কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ক্যান্সার রোগ বেশি দেখা যায়।

অধিকাংশ মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির পানি পানের অযোগ্য! হেপাটাইটিস এ এবং ই হওয়ার আশঙ্কা

পানির অপর নাম জীবন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সম্পর্কে সচেতনতা এখন গ্রামে পর্যন্ত বেড়েছে। গরিব রিকশাওয়ালাও বিশুদ্ধ পানির জন্য বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার কিনতে ও কসুর করছে না। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি হিসেবে এই বোতলের চাহিদা প্রচুর। এর কারণ হচ্ছে মরণব্যাধি হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' ভাইরাস ও কলেরা ডায়রিয়া আমাশয়সহ পানিবাহিত রোগব্যাধি। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি পান করার সচেতনতা এখন তুঙ্গে। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসহ সকল অফিস আদালতের কর্তা ব্যক্তিরা নিরাপদ পানি হিসেবে মিনারেল ওয়াটার পান করে থাকেন। তবে উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তারা কিংবা অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনও জানেন না কি ধরনের মিনারেল ওয়াটার তারা পান করছেন। বেশীরভাগ মিনারেল ওয়াটার বোতলজাত করা হয় রাজধানীর এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ গণশৌচাগার থেকে কিংবা ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি থেকে। ঢাকার বাইরের শহর, জেলা শহর ও উপজেলা শহরে মিনারেল ওয়াটার তৈরি হয় নদী-নালা অথবা আর্সেনিকযুক্ত টিউবওয়েলের পানি থেকে। এই সকল বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার রাজধানীর রেলষ্টেশন, বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, মোড়ে মোড়ে সিগনালে এবং সর্বত্র ব্যাপকহারে বিক্রি হচ্ছে। মহাখালী আন্তর্জাতিক উদরাময় কেন্দ্রে (আইসিডিডিআরবি) পরীক্ষাগারে বাজারজাতের বেশীরভাগ কোম্পানীর মিনারেল ওয়াটার পরীক্ষা করা হয়। এতে ৯৮ ভাগ কোম্পানীর মিনারেল ওয়াটার পানের অযোগ্য বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়। মিনারেল বলতে যা উপকরণ থাকা দরকার তার কিছুই নেই।

১০০ মিলিমিটার পানি পরীক্ষায় টোটাল কলিফর্ম ও ফিকাল কলিফর্ম নামের দু'ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ১০ থেকে ২৫টা পর্যন্ত পাওয়া যায়। কোন কোন কোম্পানীর মিনারেল ওয়াটারে শতাধিক কিংবা অগণিত ব্যাকটেরিয়া থাকার প্রমাণও পরীক্ষায় মিলেছে। আইসিডিডিআরবির বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফর্মুলার অনুযায়ী পান করার পানিতে যদি একটি ফিকাল কলিফর্ম অর্থাৎ মানুষের মলের কলিফর্মও পাওয়া যায়। তাহলে ঐ পানি পান করা নিরাপদ নয়। সেখানে মিনারেল ওয়াটারে শতাধিক পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে এই পানি পান করা জনস্বাস্থ্যের জন্য একশভাগ ঝুঁকিপূর্ণ। কয়েক কোম্পানী সরাসরি তাদের তৈরী মিনারেল ওয়াটার পরীক্ষার জন্য আইসিডিডিআরবির পরীক্ষাগারে নিজেরাই নিয়ে আসে। ঐ পানি পরীক্ষায় কোন ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়নি। অথচ ঐ সকল কোম্পানীর বাজার জাত মিনারেল ওয়াটার দোকান থেকে ক্রয় করে এনে একই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পর প্রতিটি মিনারেলের বোতলে ২০ থেকে শতাধিক এবং কোন কোন বোতলে অগণিত ব্যাকটেরিয়া থাকার প্রমাণ পান বিজ্ঞানীরা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট লিভার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ মবিন খান ও আইসিডিডিআরবি'র বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই ধরনের মিনারেল ওয়াটার পান করার পর হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই', ডায়রিয়া, কলেরাসহ সকল ধরনের পেটের পীড়া হওয়ার

আশঙ্কা ৯৯ ভাগ। ১ কোটি ২৫ লাখ নগরবাসীর নিরাপদ পানি পরীক্ষা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি এই কর্পোরেশনের অর্ডিন্যান্সেও পানি পরীক্ষা করার বিধান নেই বলে কর্মকর্তারা জানান।

বিশেষজ্ঞরা মিনারেল ওয়াটারের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাজারজাত মিনারেল ওয়াটারের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সরকারের পদক্ষেপ কঠোরভাবে গ্রহণ করা উচিত। সরকার ও আইসিডিডিআরবি'র সমন্বয়ে একটি ইউনিট গঠন করে মিনারেল ওয়াটার বাজার থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা এবং পান করার অযোগ্য মিনারেল ওয়াটার প্রস্তুতকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলে মিনারেল ওয়াটার মোটামুটি মান নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা যাবে।

স্কুল-কলেজের সামনে নিত্য বিক্রি হচ্ছে পচা বাসি খাবার

রাজধানীর স্কুল-কলেজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের পচা-বাসি আচার এবং বিভিন্ন ধরনের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী। এমনকি রাজধানীর বাইরেও বিভিন্ন জেলা- উপজেলা কিংবা গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজের সামনে বিক্রি হচ্ছে অনুরূপ পচা-বাসি রং বেরংয়ের খাদ্যসামগ্রী। এসব খাদ্যসামগ্রী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে কী ভয়ংকর তাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও চিন্তিত। এসব খাদ্যসামগ্রী খাওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পেটের পীড়া নয়, যে কোন ধরনের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান। জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এ সকল খাদ্যসামগ্রী প্রতিরোধ সরকারের কোন প্রশাসন এগিয়ে আসে না। তাদের চোখের সামনে এ সকল খাবার বিক্রি হচ্ছে নিত্যদিন। রাজধানীতে ২৪টি সরকারী হাইস্কুলসহ অসংখ্য সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ রয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিরতির সময় কিংবা ছুটির পর স্কুল-কলেজের সামনে আচার, ঝালমুড়িসহ নানা খাবার ক্রয় করে খেয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণীর অভিভাবকও কিনে দিচ্ছেন খাবারের অযোগ্য এ সকল খাদ্যসামগ্রী এবং মাঝে মাঝে নিজেরাও খাচ্ছেন। শিক্ষিত অভিভাবকরা জানেন না তাদের সন্তানদের তারা কি বিষাক্ত খাবার খাওয়াচ্ছেন।

গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডি,পুরাতন ঢাকা ও গুলশান এলাকার ১৫টি স্কুল-কলেজে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ভ্রাম্যমাণ দোকানে তেঁতুল, বরই, চালতাসহ বিভিন্ন ধরনের আচার ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর ওপর মশামাছি ও ধুলাবালি, পাখির মল পড়ছে। বিক্রেতা হাত না ধুয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই সকল খাবার বিক্রি করে যাচ্ছে। প্রতিদিন ২০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী এ সকল খাবার খাচ্ছে বলে কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন।

বিক্রেতা হাত না ধুয়েই জামসহ অন্যান্য ফলও বিক্রি করছে। মহাখালী আইসিডিডিআরবি'র বিজ্ঞানীরা বলেছেন, স্কুল কলেজের সামনে ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে পচা-বাসি, নিম্নমানের ভেজাল খাবার খেলে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেরা, ডায়রিয়াসহ যেকোন ধরনের পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একশ'ভাগ। পাশাপাশি হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' ও টাইফয়েডসহ যেকোন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা ও একশ ভাগ। এ ছাড়া বায়ুবাহিত রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বিক্রেতা নখের মাধ্যমে কৃমিসহ অন্যান্য রোগব্যাধি ছড়াচ্ছে বলে আইসিডিডিআরবি'র বিশেষজ্ঞরা জানান।

শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, এসব খাবার খেলে কিডনী ও লিভারের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সিটি কর্পোরেশনের পচা-বাসি নিম্নমানের ভেজাল খাদ্যসামগ্রী বিক্রি রোধে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একটি ভ্রাম্যমাণ দল ছিল। গত কয়েক মাস যাবৎ এই দলের কার্যক্রম বন্ধ। এ ব্যাপারে সিটি কর্পোরেশনের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলেছেন, পচা-বাসি নিম্নমানের ভেজাল খাবার প্রতিরোধকারী দলটিকে আবার সক্রিয় করার প্রস্তুতি চলছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে নিয়ন্ত্রণকারীদের অবস্থা আরো করুণ, তারা শুধু মাস শেষে উৎকোচ আদায়ের প্রতিযোগিতায় সময় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

লোভনীয় দই মিষ্টি আইসক্রিমে মেশানো হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিক

দুগ্ধ জাতীয় খাবার কার না পছন্দ। দুধের তৈরী নানা মিষ্টি ও রং-বেরংয়ের আইসক্রিম এবং দই শিশু থেকে বয়স্ক সকলের প্রিয়। কিন্তু আমরা কেউ জানি না আমাদের এই প্রিয় খাদ্য সামগ্রীতে প্রস্তুতকারীরা কি সব বিষাক্ত দ্রব্য মেশাচ্ছেন।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য অধিদফতরের আওতাধীন মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষাগারে গরুর দুধ, মিষ্টি, আইসক্রিম ও দইসহ বিভিন্ন দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য পরীক্ষা করা হয়। রাজধানীর শতাধিক মিষ্টির দোকান এবং দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রীর দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এই দুইটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, দুধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রীতে দুধের পরিমাণ নগণ্য। বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন এ সকল দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রীতে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার্য ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান। মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের খাদ্য পরীক্ষাগারের কর্মকর্তা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় একদল বিশেষজ্ঞ রাজধানীর অভিজাত এলাকার নামী-দামী মিষ্টির দোকানসহ বিভিন্ন এলাকার ৭০টি দোকান থেকে নানা ধরনের মিষ্টি দইয়ের নমুনা সংগ্রহ করেন। একইভাবে আইসক্রিমের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা শুরু করেন। গত মে মাসে সিটি করপোরেশনের পরীক্ষাগার কর্মকর্তারা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বেশকিছু সংখ্যক দোকান থেকে সংগৃহীত গরুর দুধ, রসগোল্লা, কালোজাম, ছানা, আইসক্রীম ও দই পরীক্ষা করে একই ধরনের রেজাল্ট পান। বিশেষজ্ঞদের মতে এই মিষ্টি ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রী মানব দেহের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এই সকল মিষ্টি ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রী তৈরী করার কারখানার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর, ময়লা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত। মান নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে খাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্ত রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়,অধিদফতর ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কেউ আর এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে ৯৪ ভাগ দোকানের মিষ্টি এবং দুগ্ধ জাতীয় খাবার ভেজাল ও নিম্নমানের। দই ও মিষ্টি রং এবং সুগন্ধযুক্ত করার জন্য বিষাক্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলে বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষায় প্রমাণ পেয়েছেন।

টেক্সটাইলের বিষাক্ত ডাই মেশানো দই ও দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য সামগ্রী খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষক্রিয়া হবে না। এটা ধীরে ধীরে দেহে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ৪/৫ বছর পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে পড়বে। ৫ জন ক্যান্সার, কিডনী ও শিশু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই ধরনের দই ও দুগ্ধ জাতীয় খাবার খাওয়ার কয়েক বছর পরে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভারের জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৯৯ ভাগ। বর্তমানে শিশু থেকে বয়স্ক পর্যন্ত নারী-পুরুষ ব্যাপকহারে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পিছনে এ সকল বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানো ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী অন্যতম কারণ বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং পরীক্ষাগারের বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পেঁয়াজু ও বেগুনি তৈরীর সময় এই ধরনের বিষাক্ত ডাই ব্যবহার করা হয় বলেও বিশেষজ্ঞগণ জানান।

ফলমূল শাক-সবজিতে বিষাক্ত রাসায়নিক, বুদ্ধিমান মানুষের অভাব দেখা দেবে!

গর্ভাবস্থায় মায়েরা ফলমূল, টাটকা শাক-সবজি ও পুষ্টিকর খাদ্য খেলে সুস্থ থাকবেন। এতে পেটের বাচ্চা বৃদ্ধি পাবে ও সুস্থ সবল হয়ে জন্ম নেবে বলে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অথচ এই সকল ফলমূল ও শাক-সবজি এবং পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রীতে বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হচ্ছে। এটা সকলের অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। এমনকি বিশেষজ্ঞদেরও। বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো ফলমূল, শাক-সবজি ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী খেলে মায়ের পেটের বাচ্চা হাবাগোবা, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং কিডনী, ক্যান্সার ও লিভারের মত মরণব্যাধি নিয়ে জন্ম নেবে। গাইনী বিশেষজ্ঞ ও শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, বর্তমানে দেশে আশঙ্কাজনক হারে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিচ্ছে এবং কিডনী, ক্যান্সার, লিভার ও হৃদরোগসহ জটিল ব্যাধিতে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে। এ সকল বিষাক্ত দ্রবণ কিংবা ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশানো খাদ্য সামগ্রী খাওয়ার ফলেই এ ধরনের শিশুর জন্মের কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেছেন।

মহাখালী আন্তর্জাতিক উদারাময় কেন্দ্রে (আইসিডিডিআরবি), পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট খাদ্য পরীক্ষাগারে ও সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগারে এ সকল খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষাকালে বিজ্ঞানীরা বিষাক্ত দ্রবণ কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের আলামত পান। কাঁচা আম, কলা, অন্যান্য ফল ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো হয়। শাক-সবজিতে অর্গানো ফসফরাস অর্থাৎ পোকামাকড় মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে দেদার। মিষ্টি ও দইসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীতে টেক্সটাইলের ডাইং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাছে এখন বরফ ব্যবহার না করে ফরমালিন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ব্যবহার করা হয়। ফরমালিন দিয়ে একটি মরা দেহ দীর্ঘদিন রাখা যায়। মাছে ফরমালিন কিংবা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন দিয়ে ঐ মাছ সহজে নরম কিংবা পচন ধরে না। বিজ্ঞানীদের মতে একমাস রাখলেও বুঝা যাবে না মাছটি এক মাস পূর্বে ধরা পড়েছে। বিদেশী রুই মাছসহ অন্য মাছে এই সকল বিষাক্ত কেমিক্যাল দেয়া হয়ে থাকে বলে জানা যায়। প্রতিবেশী দেশের রুই মাছসহ অন্যান্য মাছ এখন বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বাজারজাত করা হচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন, উক্ত ফলমূল, শাক-সবজি, পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী ও মাছ সুস্থ নারী-পুরুষ খেলে কয়েক বছর পর তারা ক্যান্সার, কিডনী, লিভার ও হৃদরোগসহ নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু গর্ভবতী মায়েরা খেলে মা ও তার পেটের শিশুর জন্য ঝুঁকি একশতভাগ। পেটের বাচ্চা বিকলাঙ্গ, হাবাগোবা, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং তার কিডনী, লিভার, ক্যান্সার হৃদরোগসহ জটিল ব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে, জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ ভেজাল, নিম্নমান এবং বিষাক্ত দ্রবণ মেশানো খাদ্য সামগ্রীর বিরুদ্ধে সময় থাকতে সরকার দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী প্রজন্মের জন্য অন্ধকার নেমে আসবে। এ দেশে জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান লোকের অভাব দেখা দিবে। আগামী ২০ বছর পর প্রশাসন চালানো কিংবা দেশ পরিচালনার যোগ্য লোকের ঘাটতি দেখা দিবে। জ্ঞানীগুনী ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন লোকের অভাব পূরণ করা সম্ভব হবে না বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

গাইনী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপিকা ডাঃ লতিফা শামসুদ্দিন বলেন, বর্তমানে ডেলিভারীর পর মায়েদের বেশীরভাগ শিশুর হাত-পা ছোট, মাথা বড়, মাথার খুলি নেই ও নানা ধরনের অস্বাভাবিক গঠন দেখা যায়। বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হচ্ছে অনেক। ১০ বছর আগে এই ধরনের শিশুর জন্মের হার অনেকগুলো কম ছিল। কীটনাশক কিংবা কেমিক্যাল মেশানো ফলমূল, শাক-সবজি ও খাদ্য সামগ্রী গর্ভবতী মায়েরা খাওয়ার ফলে এই ধরনের শিশুর জন্মের অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসাপাতালের গাইনী বিভাগের অধ্যাপিকা ডাঃ মালিহা রশীদ একই মতামত দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু অনকোলজী বিভাগের প্রধান ও প্রোভিসি অধ্যাপক এমএ মান্নান বলেন, যেকোন কেমিক্যাল জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই কেমিক্যাল মেশানো খাদ্য সামগ্রী খেলে ক্যান্সারসহ জটিল ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। মায়েদের বিষাক্ত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ এখন শিশুদের ক্যান্সারে ব্যাপক হারে আক্রান্ত হওয়ার একটি কারণ বলে তিনি জানান।

তেল ডালডা ঘি বাটার অয়েলে মেশানো হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পশুর উচ্ছিষ্ট

বাংলাদেশের মানুষ হরেক রকমের রান্না-বান্না এবং মজাদার খাবার তৈরিতে দক্ষ। তরিতরকারি, মাছ, মাংস, পোলাও, খিচুড়িসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরিতে নানা ধরনের তেল, ঘি, সয়াবিন, ডালডা, বাটার অয়েল ও সরিষার তেল ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণ হোটেল কিংবা নামী-দামী হোটেল রান্নার কাজে এবং বাসাবাড়ি কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠান, চাইনিজ হোটেল অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত এই সকল তেল ও ঘি যে কল কারখানার কেমিক্যাল, রং এবং গরুর চর্বি ও নাড়ী দিয়ে তৈরি তা খাবার প্রস্তুতকারীরা জানেন না। এই সকল বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো খাবার আমরা নিয়মিত খেয়ে যাচ্ছি তাও আমাদের জানা নেই। শুধু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানেন, প্রতি ঘরে ঘরে কোন না কোন জটিল ব্যাধিতে লোকজন আক্রান্ত হচ্ছে। এটার অন্যতম কারণ রান্নার ব্যবহৃত এই তেল ও ঘি বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউটের খাদ্য পরীক্ষাগার ও সিটি কর্পোরেশন পরীক্ষাগারে বাজারজাত করা এই সকল তেল, ঘি ও বাটার অয়েল পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগারের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বাজারজাতকারী গাওয়া ঘি ৯৩ ভাগ ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী, বাটার অয়েল ৯২ ভাগ ভেজাল, ডালডা একশত ভাগ ভেজাল, সয়াবিন ও সরিষার তেল ৯২ ভাগ ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী। দশজন মেডিসিন, ক্যান্সার, লিভার, কিডনি, শিশু এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেছেন, এই সকল ভেজাল ও নিম্নমানের তেল, ডালডা, ঘি ও বাটার অয়েল দিয়ে তৈরি খাবার খেলে কিডনি, ক্যান্সার, লিভার রোগে আক্রান্ত ও গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা বেশী। নানা ধরনের পেটের পীড়া লেগে থাকবে। দীর্ঘদিন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকার পর কিডনি ও লিভার অকেজো হয়ে যাবে। আরো নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা শতকরা ৯৯ ভাগ। শিশুদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ জানান।

পরীক্ষাকালে বিজ্ঞানীরা ঘিতে পেয়েছেন বিষাক্ত কেমিক্যাল, ডালডায় গরুর চর্বি, নাড়ীভুঁড়ি ও কলকারখানার কেমিক্যাল, সয়াবিন তেলে সাবান তৈরির পাম অয়েল ও কেমিক্যাল, রং, বাটার অয়েলে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল, সরিষার তেলে কল-কারখানার কেমিক্যালের আলামত পান। ডালডা, ঘি ও বাটার অয়েলে কি পরিমাণ এসব মেশানো হচ্ছে তাও তারা জানা না। এই ধরনের তেল, ঘি, ডালডা ও বাটার অয়েলের তৈরি খাবার খেলে হজম হয় না বলে বিজ্ঞানীরা মতামত দিয়েছেন। এই সকল তেল, ঘি, ডালডা ও বাটার অয়েলের ভাজা সেমাই ও অন্য খাদ্যসামগ্রী জনস্বাস্থের জন্য মারাত্মক হুমকি।

সম্প্রতি মহানগর গোয়েন্দা ও সিআইডি পুলিশ পুরাতন ঢাকার বেগম বাজার, মৌলভীবাজার ও লালবাগ এলাকায় ভেজাল ঘি, ডালডা, বাটার অয়েল ও তেল তৈরির কারখানার সন্ধান পায়। এই সকল কারখানা থেকে পুলিশ ভেজাল ডালডা, ঘি, বাটার অয়েল এবং সয়াবিন ও সরিষার তেল উদ্ধার এবং মালিকসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। ভেজালের মধ্যেও এক নম্বর ও দুই নম্বর রয়েছে। এক নম্বর ঘি, ডালডা, বাটার অয়েল, সয়াবিন ও সরিষার তেলে ভেজালের পরিমাণ একটু কম এবং দুই নম্বর তেল, ঘি ও বাটার অয়েলে ভেজালের পরিমাণ বেশি বলে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশকে জানিয়েছিল।

বাজারে ৯৫ ভাগ কোম্পানীর লবণে আয়োডিন নেই

আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ ও মানসিক প্রতিবন্ধীসহ নানা জটিল রোগ-ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা চিকিৎসকদের মতে একশত ভাগ। এই আয়োডিনের অভাব মানব দেহে পূরণের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দেশে আয়োডিনের অভাবে বহুকাল আগে থেকেই সকল বয়সের নারী-পুরুষ-শিশু গলগণ্ড রোগসহ নানা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে প্রতি ঘরে ঘরে এই রোগ দেখা দেয়। আইসিডিডিআরবি, পুষ্টি ইনস্টিটিউট ও বিসিকসহ বিভিন্ন সংস্থা গবেষণা চালিয়ে এই সকল রোগের উৎপত্তি হিসেবে আয়োডিনের অভাবকে দায়ী করে। এর পর থেকে ইউনিসেফ ও সরকারের সমন্বয়ে দেশে আয়োডিন লবণ প্রস্তুত করার জন্য লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য করে। তাদেরকে প্রথমে আয়োডিন মেশানো যন্ত্র ও আয়োডিন বিনামূল্যে ইউনিসেফ থেকে দেয়া হয়। পরে লবণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নিজেরাই আয়োডিন ক্রয় করে আয়োডিনযুক্ত লবণ বাজারজাত করে আসছে। অথচ দেশবাসী জানে না যে, তারা কী লবণ খাচ্ছে। আসলে বেশীর ভাগ লবণে আয়োডিন নেই। আয়োডিনযুক্ত লবণের নামে ঐ সকল লবণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছে। এটা দেখার কেউ নেই। লবণ ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির তেমন বিধান নেই। শুধু ৫ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে বলে বিসিকের কয়েক কর্মকর্তা জানান।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার (বিসিক) হিসাব অনুযায়ী দেশে ২৭২ টি কোম্পানী আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন করছে। তার মধ্যে গ্লোব সল্ট, কনফিডেন্ট, এসিআই, রূপায়ন ও সুন্দরবন (খুলনা) সল্ট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব কারখানায় আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই ৫টি বড় ধরনের কোম্পানীর সব ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে বলে বিসিকের কয়েক কর্মকর্তা জানান। বাকি আয়োডিন লবণ বাজারজাতকারীদের মধ্যে বেশীরভাগ কারখানারই করুণ হাল। সম্প্রতি পুষ্টি ইনস্টিটিউট ও মহাখালী আইসিডিডিআরবি'র এক বিজ্ঞানীসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ দল বাজারজাতকারী কোম্পানীগুলোর মধ্যে ৫০ ভাগ কোম্পানীর আয়োডিনযুক্ত লবণ সংগ্রহ করে। বিশেষজ্ঞ দল পরীক্ষা করে দেখেন যে, সংগ্রহকৃত লবণে কোন ধরনের আয়োডিনের অস্তিত্ব নেই। এই বিশেষজ্ঞ দলের মতে বাজারজাতকারী কোম্পানীদের মধ্যে ৯৫ ভাগ লবণের মধ্যে আয়োডিন নেই। বিসিকের তালিকা বহির্ভূত বিপুলসংখ্যক আয়োডিন প্রস্তুতকারী কোম্পানী রয়েছে। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফসহ বিভিন্ন এলাকায় লবণ উৎপাদন করে। সেই সকল লবণ প্যাকেট করে আয়োডিনযুক্ত লবণ বলে দেদারসে বাজারজাত করা হচ্ছে। এই সকল লবণের শুধু প্যাকেটের গায়ে আয়োডিন লেখা রয়েছে এবং ভিতরে কোনদিন আয়োডিন মেশানো হয়নি।

সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হলো ভারত ও মায়ানমার থেকে আসা লবণ এদেশে ব্যাপক হারে বাজারজাত হচ্ছে। স্বল্পমূল্যের এই সকল লবণ উত্তরাঞ্চলের শহর ও হাটবাজার দখল করে রেখেছে দীর্ঘদিন। উত্তরাঞ্চলের ৪৭ ভাগ শিশু থেকে সকল বয়সের নারী-পুরুষ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ডসহ নানান জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং শিশুরা প্রতিবন্ধী ও হাবাগোবা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ

জানান। অন্যান্য অঞ্চলে আয়োডিনের অভাবে এই ধরনের রোগ-ব্যাধির প্রকোপ কম। কারণ হিসেবে রাজধানীসহ কিছু কিছু শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে আয়োডিন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আইসিডিডিআরবি'র বায়োকেমিস্ট্রি ও নিউট্রিশন বিভাগের প্রধান ডঃ এমএ ওয়াহেদ বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের একজন ফাঁসির আসামীকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ওষুধ ও খাদ্যে ভেজালকারীকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমা করার অধিকার সেই দেশের ফুড এন্ড ড্রাগ অর্ডিন্যান্সে দেয়া হয়নি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, একজন সন্ত্রাসী একজনকে হত্যা করে। আর এক ভেজালকারী শত শত লোকের এমনকি সমগ্র জাতিকে হত্যা করে। এই জন্য সেই দেশের আইনে ভেজালকারীর ক্ষমা নেই। অথচ এদেশে ভেজাল খাদ্যসামগ্রী খেয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ক্যান্সার, কিডনী, লিভারসহ জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে এবং গর্ভবতী মায়েদের হচ্ছে হাবাগোবা, বিকলাঙ্গ ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু। এদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গাইনী বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপিকা ডাঃ লতিফা শামসুদ্দিন ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল গাইনী বিভাগের অধ্যাপিকা ডাঃ কোহিনুর বেগম বলেন, আয়োডিনের অভাবে বেশীরভাগ গর্ভবতী মায়ের পেটের বাচ্চা বিকলাঙ্গ, হাবাগোবা, মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হবে। কোন কোন গর্ভবতী মায়ের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি স্বাভাবিক ডেলিভারীতে সমস্যা দেখা দেয়। দুই গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, লবণে আয়োডিন রয়েছে কিনা ঘরে বসে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করা যায়। প্যাকেট থেকে এক চিমটি লবণ হাতে নিয়ে একফোঁটা লেবুর রস দিয়ে যদি লবণ বেগুনী কালার হয় তাহলে সেই লবণে আয়োডিন রয়েছে এবং কালার না হলে আয়োডিন নেই বুঝতে হবে বলে তারা জানান।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারের পরিচালক ডাঃ শাহানা আফরোজ বলেন, আয়োডিনের অভাবে প্রতিদিন গলগণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের বিপুলসংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য এই সেন্টারে আসছে। শিশুদের সংখ্যা কম নয়। রাজধানীর বাইরে থেকে বেশী রোগী আসছে বলে তিনি জানান।

বিসিকের আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের ডেপুটি ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার হাসানুজ্জামান বলেন, সারাদেশে উৎপাদিত আয়োডিনযুক্ত লবণ তদারকি করার জন্য বিসিকের ৮টি জোনে ৮ জন ইন্সপেক্টর রয়েছেন। তারা উৎপাদিত লবণ তদারকি করে দেখছেন। সীমিত জনবল দিয়ে এই বিশাল কার্যক্রম দেখা সমস্যা হওয়ারই কথা। তারপরও বিসিক লবণের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিষাক্ত রং মেশানো জুসে বাজার সয়লাব ॥ ছড়াচ্ছে প্রাণঘাতী রোগ

বিভিন্ন ফলের জুস কার না পছন্দ! শিশু থেকে তরুণ এমনকি বয়স্কদেরও প্রিয় হলো জুস। অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে পানি না নিয়ে জুস নিয়ে থাকে। রাজধানীর কয়েকটি নামীদামী স্কুলে গেলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আবার অনেক পরিবারে রোগীদের সুস্থ হওয়ার জন্য নিয়মিত জুস খেতে দেয়া হয়। সরকারী অনুষ্ঠানে কিংবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জুসের ছড়াছড়ি। অথচ জুসপ্রিয়রা জানেন না, তারা কি ধরণের জুস খাচ্ছেন। বাজারজাতকৃত ৯৭ ভাগ জুসের মধ্যে ফলের রস বলতে কিছুই থাকে না। মহাখালী আইসিডিডিআরবি'র এক ল্যাবরেটরিতে ও সিটি কর্পোরেশন জনস্বাস্থ্য খাদ্য পরীক্ষাগারে বাজারজাত করা জুস পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এতে ফলের রসতো নেই, পাওয়া যায় এক ধরনের রং। ৫ জন কিডনী ক্যান্সার লিভার ও শিশু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বিদেশে খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে যে কোন রং মেশানো নিষেধ। সেসব দেশে কোন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে রং মেশানো হলে সেই কোম্পানীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের মত। বিদেশে খাদ্যসামগ্রীতে রং মেশানোর কোন সুযোগ নেই। রং মেশানো খাদ্যসামগ্রী খেলে ক্যান্সার কিডনী, লিভার ও পেটের পীড়াসহ যে কোন জটিল ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা একশ ভাগ বলে উক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মতামত দিয়েছেন।

ম্যাংগো জুসসহ বিভিন্ন ফলের জুস পরীক্ষাকালে বিজ্ঞানীরা জুসে আমের কিংবা কোন ধরনের ফলের রসের পরিবর্তে ফলের সুগন্ধি ও এক ধরনের রংয়ের প্রমাণ পান। কিন্তু জুসের প্যাকেট তাজা ফলের রস লেখা রয়েছে।

বিএসটিআইয়ের তথ্যানুযায়ী দেশে জুস তৈরির প্রতিষ্ঠান আড়াই শতাধিক। এসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে অবৈধভাবে জুস তৈরির কারখানার সংখ্যা দ্বিগুণ বলে জানা যায়। বিএসটিআইয়ের অনুমতি নিয়ে পরবর্তীতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ভেজাল ও নিম্নমানের জুস তৈরি করে বাজারজাত করে আসছে। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ হিসেবে কয়েক কর্মকর্তা বলেছেন, জুস প্রস্তুতকারীরা অনেকে সমাজের নামী-দামী ব্যক্তি এবং সরকারের উচ্চ মহলের সঙ্গে যুক্ত।

অপরদিকে রাজধানীর অলি-গলিতে কিংবা বস্তিতে বিভিন্ন ধরনের 'জুস' তৈরি করে দেদারসে বাজারজাত করা হচ্ছে। নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি কুমড়ার সঙ্গে রং মিশিয়ে বিষাক্ত জুস তৈরী করা হচ্ছে। ফলের রসের নামে জুস ব্যবসা দেখার কেউ নেই। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, ভেজালের ভীড়ে তারাও অসহায়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন দেশে আজ কিডনী, ক্যান্সার লিভারসহ প্রাণঘাতী রোগ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলছে। ব্যাপক হারে বাড়ছে এসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও। এক যুগ আগেও এদেশে এই ধরনের রোগের তেমন কোন প্রকোপ ছিল না। ঐ সময় বাজারে এই ধরনের নিম্নমানের ভেজাল জুস বাজারজাত তেমন হতো না বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ বিদেশী জুসেও বাজার সয়লাব। এই ধরনের জুসও জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান। গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে গর্ভবতী মায়েরা এই জুস খেলে তারা ও তাদের পেটের বাচ্চারা কিডনী, ক্যান্সারসহ জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বাজারের ৯৬ ভাগ গুঁড়া মশলা ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী

মাছ, মাংস তরিতরকারিসহ বেশিরভাগ খাদ্যসামগ্রী রান্না করতে মশলা নিত্যদিনই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মশলা ছাড়া রান্না-বান্না কিংবা মজাদার খাবার তৈরি কল্পনাই করা যায় না। বাঙালী পরিবারে মশলার ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় শীর্ষে। প্রতিদিন রান্নার সময় খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে কি ধরনের মশলা মেশানো হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা অনেক কিছুই জানেন না। মহাখালী পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট ও সিটি কর্পোরেশনের পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা বাজারজাতকৃত হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, জিরার গুঁড়াসহ অন্যান্য গুঁড়া মশলা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছেন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাকালে দেখেন যে, হলুদের গুঁড়ার মধ্যে হলুদের পরিমাণ নগণ্য এবং কোন কোন প্যাকেটের হলুদ কিংবা বস্তার হলুদের গুঁড়ার হলুদ বলতে কিছুই নেই। আছে শুধু ইটের গুঁড়া, বুটের ডাল, খেসারীর ডালসহ বিভিন্ন ধরনের পাউডারের সঙ্গে বিষাক্ত রং মেশানো কৃত্রিম হলুদ। শুকনা মরিচের গুঁড়ার মধ্যে প্রকৃত মরিচের পরিমাণ নগণ্য। এতে পাউডারের সঙ্গে বিষাক্ত রং মিশিয়ে হিসেবে বাজারে বিক্রি করা হয়। ধনে গুঁড়ায় চাউলের কুড়ার সঙ্গে এক ধরনের বিষাক্ত রং মিশিয়ে তৈরি করার প্রমাণ পরীক্ষায় পাওয়া যায়। জিরার গুঁড়ায় এক ধরনের বিষাক্ত রংয়ের সঙ্গে পাউডার কিংবা ইটের গুঁড়া মেশানো প্রমাণ পেয়েছেন পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা গোল মরিচের সঙ্গে পেঁপের দানা মিশিয়ে দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া গুঁড়া মশলায় আরো বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রং কিংবা পাউডার মেশানো হয়ে থাকে কিন্তু পরীক্ষায় ঐ সকল বিষাক্ত রং ধরা পড়ে না বলে বিজ্ঞানীরা জানান। তাদের মতে বাজারজাতকৃত মশলার মধ্যে কয়েকটি নামিদামী কোম্পানী তৈরী মশলা ছাড়া ৯৬ ভাগ মশলা ভেজাল ও খাবারের অনুপযোগী।

পরীক্ষাগারে থেকে এসব জীবনহানিকর মশলার ফলাফল সংশ্লিষ্ট অফিসে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রায়ই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। ভেজালকারীদের কাছ থেকে উৎকোচ আদায়ের প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকায় ভেজাল মশলায় এখন বাজার সয়লাব।

পুরাতন ঢাকার পাড়া-মহল্লায় ও বস্তিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি হচ্ছে এসব ভেজাল মশলা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, এই ধরনের ভেজাল মশলা দিয়ে তৈরি খাবার খেলে কিডনী ও লিভার নষ্ট, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ যেকোন ধরনের জটিল ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ। শিশু ও গর্ভবতী মায়ের জন্য এগুলো সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে চিকিৎসকরা জানান।

শুঁটকিতে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত কীটনাশক ও ডিডিটি ॥ কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ

এদেশের বিপুলসংখ্যক লোকের কাছেই শুঁটকি মাছ প্রিয়। অনেক এলাকায় দৈনন্দিন খাবারের তালিকায় শুঁটকি মাছের ভর্তা বা তরকারি থাকা চা-ই। তবে গ্রামাঞ্চলেই এর ব্যবহার ব্যাপক। আজকাল শহরাঞ্চলের সাধারণ কিংবা নামীদামী হোটেলেও শুঁটকি মাছের ভর্তা দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু তারা কেউ জানেন না, সুস্বাদু শুঁটকি মাছের মধ্যে প্রস্তুতকারী কিংবা বিক্রেতারা কি মেশাচ্ছে। শুঁটকি মাছে বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার ও আরো এক ধরনের কীটনাশক মেশানো হয় পোকামাকড় মারার জন্য ডিডিটি এবং শুঁটকিতে ফাংগাস যাতে না পড়ে ও স্যাঁতস্যাতে না হয়, সেজন্য মেশানো হয় এক ধরনের কীটনাশক। যারা শুঁটকি খান তাদের অনেকেই জানেন না, এই বিষাক্ত পাউডার ও কীটনাশকের ক্ষতিকারক দিকে সম্পর্কে। রাজধানীর ৫টি বড় কাঁচাবাজারে গিয়ে শুঁটকি মাছের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে আলাপকালে তারা ডিডিটি পাউডার ও আরেক ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করেন বলে জানান। তবে এই পাউডার বা কীটনাশকে মানুষের কোন ক্ষতি হয়-এমন কথা তারা জানেন না। তারা জানান, বছরের পর বছর বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার ও কীটনাশক মেশানো শুঁটকি তারা বিক্রি করে আসছেন। এ ছাড়া শুঁটকি মাছ পোকামাকড় থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না বলে ব্যবসায়ীরা জানান।

সম্প্রতি সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং সরকারের অন্যান্য পরীক্ষাগারে শুঁটকি মাছ পরীক্ষা করে বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার ও কীটনাশক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মানবদেহ ধ্বংসকারী ডিডিটি পাউডার শুঁটকি মাছে ব্যবহার বন্ধ এবং যেকোন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জোর দাবি জানান। বিজ্ঞানীরা বলেন, ডিডিটি ও কীটনাশক জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। ডিডিটি মেশানো শুঁটকি মাছ ভক্ষণকারীরা মরে গেলে তাদের কবরের মাটি পরীক্ষা করলেও ডিডিটি পাউডারের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। জীবিত মানুষের হাড়ের মধ্যে ডিডিটি পাউডারের তেজস্ক্রিয়া ঢুকে যায় বলে বিজ্ঞানীরা জানান। কয়েকজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও একই মতামত দিয়েছেন।

কিডনী, লিভার, ক্যান্সার ও গাইনী বিষয়ে ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইত্তেফাককে জানান, ডিডিটি পাউডার মেশানো শুঁটকি মাছ খেলে কিডনী, ক্যান্সার, লিভার অকেজো ও গর্ভবতী মায়ের পেটের বাচ্চা একই রোগে আক্রান্তসহ বিকলাঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা একশতভাগ। হার্টের রোগসহ অন্যান্য জটিল ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বর্তমানে শিশু থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে - মেয়েদের হৃদরোগ, কিডনী ও ক্যান্সার ব্যাপকহারে হওয়ার অন্যতম কারণ ডিডিটি পাউডার মেশানো শুঁটকি খাওয়া। ডিডিটি মেশানো শুটকি ভক্ষণকারীদের ওষুধে কাজ হয় না বলে কোন কোন চিকিৎসক জানান।

কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ ও লালমনিরহাটসহ শুঁটকি মাছ গুদামজাতকারীরা প্রাকাশ্যে ডিডিটি পাউডার ব্যবহার করে যাচ্ছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ডিডিটি পাউডার মেশানো শুঁটকি মাছ বস্তায় বস্তায় এদেশে আসছে এবং বাজারজাত করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা এ মানব বিধ্বংসী ডিডিটির ক্ষতিকারক বিষয়টি জেনেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আবার কোন কোন কর্মকর্তা নিয়মিত শুঁটকি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে উৎকোচ পাচ্ছেন বলে জানা যায়।

বস্ত্রকলের ডাই মিশানো খাবার সামগ্রী ॥ ১০ বছরে ডায়বেটিস মহামারী আকার ধারণ করবে

নুডুলস, রকমারী বিস্কুট, পাউরুটি মোটামুটি সব পরিবারের সদস্যদের প্রিয় খাদ্য। নুডুলস শিশুদের পছন্দ বেশী। অনেক মা ছেলের স্কুলের টিফিন হিসেবে নুডুলস দিয়ে থাকেন। বিকেলের নাস্তা কিংবা অতিথি আপ্যায়নে নুডুলস রান্না করে পরিবেশন করা হয়। এই সকল নুডুলস, নানান বিস্কুট, পাউরুটি তৈরীতে আটা, ময়দা ও তেলসহ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী প্রয়োজন হয়। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও ময়লা-আবর্জনার মধ্যে নুডুলস, বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরী হচ্ছে। অপরদিকে নিম্নমানের ও খাবারের অনুপযোগী আটা-ময়দা দিয়ে তৈরী হচ্ছে এগুলো। ফলে ঐ সকল খাদ্য মানবদেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে খাদ্য পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা জানান। এই সকল খাদ্য তৈরীর সময় বস্ত্রকলের ডাই ও এক ধরনের রং ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ডাই ব্যবহার করার ফলে নুডুলস ও বিস্কুট মচমচে থাকে এবং স্যাঁতস্যাঁতে হয় না। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (সায়েন্স ল্যাবরেটরি) খাদ্য পরীক্ষাগারের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ কে এম ফরমুজুল হক কলেছেন, কলকারখানার বিষাক্ত ডাই জনস্বাস্থ্যের জন্য একশত ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ। ডাই কিংবা রং মেশানো খাদ্যসামগ্রী খেলে হজম হয় না এবং তা স্টমাকে থেকে যায়। এতে ডায়াবেটিস রোগ হওয়ার আশঙ্কা একশত ভাগ। দেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস, কিডনী, ক্যান্সার ও লিভারসহ অন্যান্য জটিল রোগ আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি অন্যতম কারণ বিষাক্ত ডাই ও রং মেশানো ভেজাল এবং নিম্নমানের খাদ্যমাসগ্রী। বিশেষজ্ঞদের আশংকা, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এদেশে ডায়াবেটিস রোগ মহামারী আকার ধারণ করবে। ভেজাল ও বিষাক্ত খাদ্য তৈরী এবং বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে এখনই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে উক্ত বিজ্ঞানী অভিমত ব্যক্ত করেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরি চেয়ারম্যান গোলাম মওলা মজুমদার বলেছেন, বাজার থেকে সরাসরি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে এই ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করতে পারে না। বিভিন্ন সংস্থা বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের নিকট প্রেরণ করে। ভেজাল নির্ণয়ের পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

রাজধানীর অলিগলি, পাড়া-মহল্লা কিংবা বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রয়েছে নুডুলস, বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরির কারখানা। এসব কারখানার ৯৫ ভাগ শ্রমিক চর্মরোগ ও সিফিলিসে আক্রান্ত বলে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানান। এসব শ্রমিকের হাতে তৈরি খাদ্যসামগ্রী খাবারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে তারা জানান। এ সকল কারখানার ৯৭ ভাগের লাইসেন্স নেই। নুডুলস, বিস্কুট ও পাউরুটি, আটা, ময়দা ৯৫ ভাগ ভেজাল, নিম্নমান ও খাবার অনুপযোগী বলে পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ সকল নুডুলস, বিস্কুট ও পাউরুটি এবং আটা, ময়দা প্যাকেটে তৈরীর তারিখ ও ব্যবহারের শেষ সময় উল্লেখ থাকে না।

ফলে এগুলো বছরের পর বছর বাজারে বিক্রয়ের জন্য দোকানে পড়ে থাকে। সম্প্রতি ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলার নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট নুডুলস, বিস্কুট, পাউরুটি, আটা, ময়দা তৈরীর ১৩টি প্রতিষ্ঠানের জেল-জরিমানা করেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ নকল ও ভেজাল নুডুলস ও বিস্কুট এবং নিম্নমানের আটা-ময়দা সীজ করা হয়।

মোবাইল কোর্ট

নিউ সুপার মার্কেটে (নিউ মার্কেট) ভেজাল ও নকল নুডুলস বিক্রির দায়ে এক দোকানদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড, কাকরাইলে নিম্নমানের ও ব্যবহারে সময়বিহীন আটা ময়দা বিক্রির দায়ে এক দোকানদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক বছর জেল, তেজগাঁও এলাকার একটি কারখানায় ভেজাল ও নিম্নমানের এবং উৎপাদিত বিস্কুট আটা ময়দার প্যাকেটে মেয়াদ উল্লেখ না করায় প্রতিষ্ঠানের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ২ বছরের জেল, একই এলাকার বিস্কুট তৈরির অপর একটি কারখানার মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে দুই বছরের জেল, সুত্রাপুর ডিষ্টিলারী রোডে আটা ময়দা তৈরি কারখানার মালিককে ভেজাল ও নিম্নমানের আটা ময়দা বাজারজাত করায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক বছরের জেল, শ্যামপুর থানার দনিয়া-রসুলবাগ এলাকায় ভেজাল ও নিম্নমানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের নুডুলস তৈরি কারখানার মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৪ বছরের জেল, নয়াপল্টন এলাকার এক আমদানীকারককে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছর জেল, বিজয়নগরে নামী-দামী আটা-ময়দা তৈরীর কারখানায় মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা-ময়দা বাজারজাত করায় মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছর জেল, যাত্রাবাড়ী এলাকায় নিম্নমানের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পাউরুটি বাজারজাত করায় কারখানার মালিককে ৭ হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ মাস জেল, শ্যামপুর থানার দনিয়ার নকল ও ভেজাল নুডুলস তৈরী কারখানার মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ২ বছর জেল, গুলশান-১ নম্বরে নামী-দামী দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা-ময়দা বিক্রির দায়ে দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা ও ১ বছরের জেল, বনানী এলাকায় নিম্নমানের বিস্কুট, পাউরুটি ও অন্যান্য খাদ্য তৈরীর কারখানার মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছর জেল প্রদান করে।

তরিতরকারি টাটকা রাখা ও ডাবলি দিয়ে মটরশুটি, করমচা দিয়ে চেরিফল তৈরীর জন্য বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো হচ্ছে

তরিতরকারি, ফলমূল আমাদের নিত্যদিনের খাবার। চিকিৎসকরাও রোগী কিংবা সুস্থ লোকদের তরিতরকারি, শাক-সবজি খাবার পরামর্শ দেন। গাইনী বিশেষজ্ঞরা গর্ভবতী মায়েদের সুস্থ ও সবল থাকার জন্য শাক-সবজি কিংবা ফলমূল খাবার পরামর্শ দেন। অথচ জানি না তরিতরকারি তরতাজা রাখা ও পচন থেকে রক্ষার জন্য বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিষাক্ত কেমিক্যালের মধ্যে রেখে রঙিন ফল ও ডাবলিকে মটরশুঁটি বানানোর বিষয়টি আমরা কেউ জানি না। দেহে ভিটামিন "এ" এর অভাব পূরণের জন্য চিকিৎসকরা রোগীদের সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অথচ প্রতিকেজি ২০ টাকা মূল্যের ডাবলিতে কেমিক্যাল মিশিয়ে ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরের মটরশুঁটি তৈরি করা হয়। প্রতিকেজি ১৫ টাকা কেজি মূল্যের করমচা বিষাক্ত কেমিক্যালে রেখে ২০০ টাকা কেজি দরের মূল্যের চেরি ফল তৈরী করা হয়। বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশানো তরিতরকারিতে বাজার এখন সয়লাব। ক্রেতারা প্রতিদিন ক্রয় করছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এ সকল তরিতরকারি, শাক-সবজি ও ফলমূল। ৯৯ ভাগ ক্রেতা টাটকা শাক-সবজি, তরিতরকারি ও রঙিন ফলমূল ক্রয়ে বেশি আগ্রহী হওয়ায় অসৎ উৎপাদনকারী ও বিক্রেতারা এ সুযোগ গ্রহণ করে। এ বিষয়টি দেখার কেউ নেই।

বিএসটিআইয়ের অর্থায়নে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারের (সায়েন্স ল্যাবরেটরি) খাদ্য ল্যাবরেটরিতে বাজারের ফলমূল ও তরিতরকারি, শাক-সবজি নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। এসব পরীক্ষায় বিষাক্ত কেমিক্যাল মানবদেহে কি পরিমাণ এবং কি ধরনের ক্ষতি করছে তা নির্ণয় করা হচ্ছে। এই পরীক্ষাগারের প্রধান বিজ্ঞানী ড. কে এম ফরমুজুল হক বাজারের পটল, তরিতরকারি, শাক-সবজি ও ফল পরীক্ষা করেন। তিনি পটলে ও মটরশুঁটিতে বস্ত্র কলের বিষাক্ত কেমিক্যাল, বেগুনে কীটনাশক, টমেটোতে ক্যালশিয়াম কার্বাইড মেশানোর প্রমাণ পেয়েছেন। তরিতরকারি টাটকা রাখার জন্য বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানোর প্রমাণও পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। উক্ত বিজ্ঞানী বলেছেন, যেকোন বয়সের লোক এ সকল তরিতরকারি, শাক-সবজি ফলমূল খেলে কিডনী ও লিভার নষ্ট হতে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ছাড়াও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা একশ ভাগ। গাইনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলেছেন, গর্ভবতী মায়েরা এসব খেলে পেটে বাচ্চাও একই ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে। দেশে এখন ব্যাপকহারে চোখের জটিল রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিষাক্ত শাক-সবজি, তরিতরকারি ও ফলমূল খাওয়া। শিশুদের চোখের রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান।

মাছে মেশানো হয় ডিডিটি পাউডার ও ফরমালিন ॥ এতে মানবদেহের যে ক্ষতি হয় তার চিকিৎসা নেই

ভাতে মাছে বাঙালী। কিন্তু এ মাছ কিভাবে একশ্রেণীর অর্থলোভী মানুষ টাটকা ও চকচকে রাখার জন্য প্রাণঘাতি কেমিক্যাল মিশিয়ে বিক্রি করছে তা ক্রেতারা জানে না। মাছের মধ্যে বিষাক্ত কেমিক্যাল, ডিডিটি পাউডার ও ফরমালিন মিশিয়ে বাজারে বেচাকেনা চলছে। কয়েকজন মাছ বিক্রেতা বলেন, আগে মাছের সঙ্গে বরফ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ রাখা হতো। এখন বরফের প্রয়োজন তেমন হয় না। ডিডিটি পাউডার মেশানো পানিতে ছোট কিংবা বড় মাছ একটু রেখে তুলে নিলে চকচক করে এবং সহজে নরম হয় না, পচনও ধরে না। রূপালী রংয়ের অথবা তাজা মাছ ক্রেতাদের পছন্দ। ডিডিটি পাউডার কিংবা কেমিক্যাল মেশানো পানিতে মাছ রেখে কিছুক্ষণ পর উঠালে ঐ মাছ রূপালী রং ধারণ করে এবং চকচক করে বলে বিক্রেতারা জানান। পাইকারী রুই, কাতল ও ছোট ছোট মাছ বিক্রেতারা বরফের পরিবর্তে এখন ডিডিটি পাউডার, কেমিক্যাল ও ফলমালিন দিয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করে। অপরদিকে ভারত ও বার্মা থেকে বস্তায় বস্তায় আসা রুই, কাতলে বিষাক্ত কেমিক্যালও ডিডিটি পাউডার অথবা ফরমালিন দেয়া হয়। খাদ্য পরীক্ষাগারে এসব মাছ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মাছের মধ্যে এসব বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ, রুই, কাতল, মৃগেলে সাধারণত এই ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্তমানে ইলিশ মাছে এ ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল প্রয়োগ হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা জানান। ফরমালিন লাশের মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে যেভাবে পুশ করা হয়, সেভাবে বড় বড় মাছে পুশ করা হয়। এতে এক মাসেও মাছে পচন ধরে না এবং রং রূপালী দেখা যায়। রুই ও কাতল মাছের বুকের অংশ লালচে করার জন্যও এক ধরনের কেমিক্যাল মেশানো পানি ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, ডিডিটি পাউডার কিংবা কেমিক্যাল মেশানো পানি অথবা ফরমালিন সরাসরি মাছের ভেতরে চলে যায়। এই মাছ খাওয়ার পর ঐ বিষ মানবদেহে প্রবেশ করে। রান্নার আগুনে এই বিষের কিছুই হয় না। ঐ মাছ খাওয়ার পর লোকটি মারা গেলে ৪/৫ মাস পরও তার হাড় পরীক্ষা করলে সেই বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার, কেমিক্যাল ও ফরমালিনের চিহ্ন পাওয়া যাবে। রাজধানীর ৮টি কাঁচাবাজরে গিয়ে বিষ মেশানো মাছ দেখা যায়। বিক্রেতা হাতের কাছেই এসব কেমিক্যাল মিশানো পানি রাখেন।

বিশেষজ্ঞ চিকৎসকগণ বলেছেন, বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার কেমিক্যাল ও ফরমালিন প্রয়োগ করা মাছ জনস্বাস্থ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি করে তা নিরাময়ের ব্যবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রে নেই।

চাইনিজ রেস্তোরাঁয় পচা মাংস, খাবারে বিষাক্ত উপকরণ, টয়লেটে বাসনকোসন

সুস্বাদু চাইনিজ খাবার প্রায় সকলেরই প্রিয়। রাজধানীর অভিজাত ও বাণিজ্যিক এলাকা ছাড়াও আজ কাল পাড়া মহল্লায় গড়ে উঠেছে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। জেলা শহর এবং উপজেলা শহরেও গড়ে উঠছে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট । কিন্তু কেমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপকরণ মিলিয়ে এই প্রিয় চাইনিজ খাবার তৈরী করা হয় তা আমরা কেউ জানি না। কোন কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে পচা গরু, খাসি ও মুরগীর মাংস নানা পদে রান্না করে অতিথিদের সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। গতকাল সোমবার রাজধানীর চারটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সরেজমিনে গিয়ে রান্নাঘরে ময়লা আবর্জনা এবং নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়। কোনটিতে থালাবাসন টয়লেটের মধ্যে পরিস্কার করতে দেখা গেছে। তৈরী করা খাবার রাখা হয়েছে টয়লেটের নিকট। গতকাল সোমবার ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলাহ্‌র নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত এসব চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তল্লাশী চালিয়ে বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল মেশানো সস, জেলি, পচা মাংস , নিম্নমান ও ভেজাল উপকরণ সীজ করে। এই চারটি রেস্টুরেন্ট মালিককে জেল-জরিমানা করা হয়।

খাদ্য পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা চাইনীজ রেস্টুরেন্টের লোভনীয় খাদ্য পরীক্ষা করে ভেজাল, নিম্নমান ও খাবারের অনুপযোগী মন্তব্য করেছেন। অনেক খাদ্যের সঙ্গে কাপড়ের রং মেশানো হয় বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পান। তাদের মতে, ৯৬ ভাগ চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খাবার ভেজাল ও নিম্নমানের এবং খাবারের অযোগ্য। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, পচা মাংস বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল মেশানো খাবার খেলে সরাসরি কিডনী ও লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশী। এছাড়া ক্যান্সার, পেটের পীড়া ও টাইফয়েড, ভাইরাল হেপাটাইটিস-এ ও অন্যান্য মরণ ব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা একশ ভাগ। গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের জন্য এই সকল খাবার সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত করেন।

বেলা ২টা থেকে ম্যাজিট্রেট রোকন-উদ-দৌলাহ ও সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ফখরুদ্দিন মোবারকের নেতৃত্বে পুলিশ-বিডিআর বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৪টি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তল্লাশী চালায়। আসাদগেটে চাইনীজ রেস্টুরেন্ট মিডনাইট সান-১ এ কিচেনে প্রথমে অভিযান চালানো হয়। এই কিচেনে ময়লা আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। মনে হয়েছে এ যেন গোয়ালঘর। রেস্টুরেন্টের অতিথিদের খাবার কক্ষ সুসজ্জিত। কিন্তু কিচেনের এই পরিবেশে বেশীর ভাগ চাইনীজ রেস্টুরেন্ট কিচেনের একই হাল। উক্ত চাইনীজ রেস্টুরেন্টের কিচেন থেকে বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল দিয়ে নিজেদের তৈরী সস ও জেলি এবং বিদেশী মেয়াদ উত্তীর্ণ ও তারিখবিহীন সস ও জেলি ম্যাজিস্ট্রেট সীজ করেন। বাসি কিছুসংখ্যক সেঁকা মুরগি মোবাইল কোর্ট কর্মকর্তারা দেখতে পান। এছাড়া নিম্নমানের ও ভেজাল তেলের সন্ধান পান। ময়লা-আবর্জনার স্তূপের উপর খাদ্য রাখার দৃশ্য কর্মকর্তারা দেখতে পেয়েছেন। মোবাইল কোর্ট মিডনাইট সান-১ এর ম্যানেজার গৌরাঙ্গ চন্দ্র হালদারকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও ২ বছরের জেল প্রদান করে।

শ্যামলীতে 'সিটি গার্ডেন' চাইনীজ রেস্টুরেন্টের কিচেনে মোবাইল কোর্ট নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং টয়লেটের মধ্যে থালাবাসন ও জিনিসপত্র পরিষ্কার করার দৃশ্য দেখতে পায়। পচা গরু ও খাসির মাংস, বিষাক্ত রং ও কেমিক্যালের তৈরী সস এবং এক পাত্র তরল রং ও বেশ কয়েক দিন ধরে ব্যবহার খাওয়ার অনুপযোগী ভোজ্য তেল মোবাইল কোর্ট সীজ করে। কোর্ট এই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের মালিক মিজানুর রহমানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও ২ বছরের জেল প্রদান করে এবং ম্যানেজার শাহআলমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ম্যানেজারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ৪০ দিনের জেল প্রদান করা হয়। মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

মিরপুর দারুস সালাম রোডের 'ইয়াং চি চাইনীজ রেস্টুরেন্টে' মোবাইল কোর্ট কিচেনে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পচা গরুর মাংস, বিষাক্ত রং, স্পিরিট ও কেমিক্যাল দিয়ে তৈরী সস সীজ করে। মালিক আবদুল কাদের মোল্লাকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা ও দেড় বছর কারাদণ্ড প্রদান করে। একই এলাকায় চাইনীজ রেস্টুরেন্ট 'জিওয়াং' এ মোবাইল কোর্ট কিচেনে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ এবং পচা মাংস, বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল মেশানো সস ও জেলি সীজ করে। এই চাইনীজ রেস্টুরেন্টের মালিক মির আকবর আলীকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও ২ বছরের জেল প্রদান করে। মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় ।

কলা ও আনারস পাকানো হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে

ফল আমাদের সবার প্রিয়। ফলের মধ্যে কলা ও আনারস পছন্দ করে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দুটো ফল বেশীরভাগ শিশুর প্রিয়। অফিস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফলের মধ্যে কলা প্রায়ই রাখা হয়। কোন কোন অনুষ্ঠানে আনারস রাখা হয়। আনারস জুস হিসেবে ফাস্টফুডের দোকানে কিংবা বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত হয় বেশী। অথচ আমরা কেউ জানি না এই দু'টি প্রিয় ফল পাকানো হয় বিষাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে। একইভাবে আমও এই বিষাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে বেশীরভাগ পাকানো হয়। কিডনী, লিভার, গাইনী ও শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, বিষাক্ত ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো ফল খেলে কিডনী, ক্যান্সার, লিভারসহ যেকোন মরণব্যাধি হওয়ার আশঙ্কা ৯৯ ভাগ। গর্ভবতী মায়েরা খেলে মা ও তার পেটের বাচ্চাও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশী।

গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা গর্ভবতী মায়েদের প্রথমে রঙিন ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন এবং পরে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন। সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মহাখালী পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট ও সিটি কর্পোরেশন এবং মহাখালী আইসিডিডিআরবি'র পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরা ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে পাকানো ফল সম্পর্কে একই মতামত দেন।

কয়েকজন বিজ্ঞানী বলেন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে কলা, আনারসসহ বিভিন্ন ফল পাকানোর রহস্য পরীক্ষা করে তা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হবার পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় কতিপয় ফল ব্যবসায়ী এ অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একশ্রেণীর কর্মকর্তা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে নির্ধারিত মাসোহারা আদায় করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এভাবে পাকানো ফল খেয়ে জটিল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রতি মাসে অনেক নারী-পুরুষ ও শিশু মারা যাচ্ছে বলে চিকিৎসকরা জানান। এক পোটলা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ফলের বড় ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিলে কয়েক ঘন্টা পর ফলের পাকা রং হয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাকে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদন "আমরা কী খাচ্ছি" শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারের শীর্ষ মহল থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিদিন মোবাইল কোর্ট ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী প্রতিরোধ অভিযান চালাচ্ছে।

প্রতিদিন বিচারক, আইনজীবি, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের থেকে সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ সারাদেশে থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দৈনিক ইত্তেফাকে ফোন করে ভেজাল ও নিম্নমানের

খাদ্য তৈরী ও বাজারজাতকারী তরিতরকারি, মাছ ও ফলে বিষাক্ত কেমিক্যাল এবং রংসহ খাবারের অযোগ্য নানান বিষাক্ত উপকরণ ব্যবহারকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ সংশোধন করে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত ও তৈরী এবং বিষাক্ত রং ও কেমিক্যাল ব্যবহারকারীদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও সর্বনিম্ন ৫ লাখ টাকা থেকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করার দাবি জানান।

ম্যাজিস্ট্রেট রোকন-উদ-দৌলার নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট গতকাল মঙ্গলবার কাওরানবাজার ডিম ও ফলের আড়তে অভিযান চালায়। সাদা ডিম বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে লালচে করার কারণে মোবাইল কোর্ট দুইটি ডিমের আড়তের মালিকের বিরুদ্ধে ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে কলা পাকানোর ঘটনায় একজন ফল আড়ত মালিককে জেল-জরিমানা করে। মোবাইল কোর্ট ফার্মগেট কলমিলতা মার্কেটে অভিযান চালিয়ে একই কারণে এক ফল আড়ত মালিককে জেল-জরিমানা করে। ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল ফাত্তাহ এর নেতৃত্বে পরিচালিত অপর মোবাইল কোর্ট গতকাল সদরঘাট এলাকায় ৭টি খাবারের হোটেল ও তিনটি মিষ্টির দোকানে অভিযান চালায়। খাবার হোটেলে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খাদ্যে বিষাক্ত রং মেশানোর প্রমাণ পায় মোবাইল কোর্ট। তিনটি মিষ্টির দোকানে বিষাক্ত রং এবং নিম্নমান ও ভেজাল উপকরণ দিয়ে মিষ্টি তৈরীর প্রমাণ পায়। এছাড়া মিষ্টির দোকানের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর পেয়েছে মোবাইল কোর্ট। এই সকল কারণে ৭টি খাবারের হোটেল ও তিনটি মিষ্টির দোকানের মালিককে জেল-জরিমানা করা হয়।

বাজারে বিষাক্ত লাল রং মিশ্রিত চাল, আটা, আলু বাড়ছে কিডনি ও লিভার ব্যাধি, ক্যান্সার

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য । অনেকের তিন বেলাই ভাত পছন্দ। ঢেঁকিছাঁটা লালচে চালের ভাত নরম করে শিশু ও গর্ভবতীকে খাওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শ দেন। এ কারণে ঢেঁকিছাঁটা চাল কেনার জন্য ক্রেতাদের আগ্রহ বেশী। লাল আটার কদরও বেশী। এই আটা খেতে সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য বেশী উপকারী। লাল আটার জন্য ক্রেতাদের চাহিদা বেশী। লাল আলুর কদর কম নয়। এই আলুর ভর্তা কার না পছন্দ। রঙিন শাক-সবজিতে ভিটামিনের পরিমাণ বেশী। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রঙিন শাক-সবজি খাওয়ার জন্য গর্ভবতী মা'সহ সকলকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য লাল আলুর চাহিদা অনেক । কিন্তু আমরা কেউ জানি না ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা ও আলুর নামে কী খাচ্ছি। এগুলোর সঙ্গে জীবন ধ্বংসকারী বিষাক্ত রং মিশিয়ে লাল করা হচ্ছে। পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, চাল, আটা ও আলুর রং পাকা। সেই রং মেশানো খাবার খেলে চাল, আটা ও আলুর মধ্যে রং যেভাবে লেগে থাকে সেইভাবে এই রং পাকস্থলীতে অক্ষত থাকে। এই অবস্থায় এই রং ধীরে ধীরে ক্যান্সার এবং কিডনী ও লিভার ব্যাধি এবং অন্য জটিল ব্যাধি সৃষ্টি করছে। এই রং মিশ্রিত খাবার অথবা খাবারের অনুপযোগী উপকরণে তৈরী খাদ্য খেলে অঙ্গহানি হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। মরণব্যধি এইডস থেকেও বেশী ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে এ সকল খাবার।

আসল ঢেঁকিছাঁটা চালের গায়ে লালচে আবরণে ভিটামিনের পরিমাণ বেশী- যা রোগ প্রতিরোধে বেশী সহায়ক। এ কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা ও রঙিন শাক-সবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা ও রঙিন শাক-সবজির নামে মানুষ কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে বিষ কিনে পরিবারের সদস্যদের খাওয়াচ্ছেন দীর্ঘকাল ধরে। এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল মহল, সকল কর্তাব্যক্তিরা দেখেও না দেখার ভান করে চলছেন। রাজধানীর পাড়া-মহল্লা, কাঁচাবাজার আড়তে কিংবা ছোট চাল, আটা ও আলু-পেঁয়াজের দোকানে বিষাক্ত রং মেশানো চাল, আটা ও আলু দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। কয়েকজন বিক্রেতা ও আড়ত মালিক বলেছেন, ঢাকার বাইর থেকে রং মেশানো চাল, আটা ও আলু বস্তায় বস্তায় তাদের নিকট আসে। তারা সেগুলো মিথ্যা কথা বলে দীর্ঘদিন বিক্রি করে আসছেন। এগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলে বিক্রেতা ও আড়তদারগণও স্বীকার করেছেন। ইত্তেফাকের বগুড়া অফিস জানিয়েছে, বগুড়া ও রংপুরের বিখ্যাত লাল আলু, উত্তরাঞ্চলের লাল চাল, শবজি ও আটার মোকাম বগুড়ার মোকামতলা, চন্ডীহারা , শিবগঞ্জ, শেরপুরের নয় মাইল, মহাস্থান, আমতলী, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, রংপুরে মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, শুকুরের হাট, তারাগঞ্জ হাটে আসে। মহাজন ও বেপারীরা সেখানে ইরি ধানের চালসহ অন্যান্য চালে বিষাক্ত রং মিশিয়ে ঢেঁকিছাঁটা চাল হিসেবে বস্তাভর্তি করে। লাল আলুর দাম বেশী। সাদা আলুর সঙ্গে একই ধরনের বিষাক্ত রং মিশিয়ে লাল করে বস্তাভর্তি করে। সাদা আটা ভাঙিয়ে রং মিশিয়ে লাল আটা তৈরী করে বস্তাভর্তি করা হয়। আটার মিল বা কলের মালিকরা এসব কাজে লিপ্ত।

ঢাকা ভার্সিটি ও বুয়েটে ডাইনিং হল ও ক্যান্টিনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ॥ ভেজাল খাদ্য প্রস্তুতকারীরা চলমান অভিযানকে তোয়াক্কা করে না।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলের ডাইনিং হল ক্যান্টিনে ও রন্ধনশালায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ময়লা-আবর্জনা ও মলমুত্র ত্যাগের স্থানে থালাবাসন ধোয়ার কাজ চলছে। এই পরিবেশে নিত্যদিন আহার করে চলেছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। এইসব ডাইনিং ও ক্যান্টিন ভেজাল, নিম্নমানের এবং বিষাক্ত রং ও উপকরণের তৈরি খাদ্যসামগ্রী বছরের পর বছর আহার করছে শিক্ষার্থীরা দেখার কেউ নেই।

সম্প্রতি পানি পান ও খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্রের মৃত্যু ঘটে এবং পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়। প্রতিদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়। প্রতিদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নানান মরণব্যাধিতেও আক্রান্ত হচ্ছে বলে জানা যায়। এর জন্য দায়ী ক্যান্টিনের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী। গতকাল শনিবার ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে অভিযানে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে হতভম্ব হয়ে যান। ডাল আমিষ জাতীয় খাদ্য। আড়তে ডাল রাখার ও তৈরি করার পরিবেশ দেখলে কেউ খেতে আগ্রহী হবে না। বিদেশে গবাদিপশুকে যে ডাল খাওয়ানো নিষেধ, গতকাল মোবাইল কোর্ট রহমতগঞ্জ ডালপট্টিতে গিয়ে সেই ধরনের আমদানিকৃত বিষাক্ত ডাল আড়তে দেখতে পান। এছাড়া গতকাল সিটি কর্পোরেশনের ১০টি জোনে ভেজাল খাবার প্রতিরোধ মোবাইল কোর্ট ব্যাপক অভিযান চালায়। প্রতিদিন মোবাইল কোর্ট চাইনিজ রেস্তোরাঁ, খাবারের হোটেল, বেকারী, মিষ্টির দোকান ও কারখানায় এবং ফাস্টফুড তৈরির কারখানার অস্বাস্থ্য নোংরা পরিবেশ খুঁজে পাচ্ছে। এজন্য জেল জরিমানা ও সতর্কবাণী প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ৯৫ ভাগ হোটেল, মিষ্টির দোকান ও চাইনিজ, ফাস্টফুডের দোকানের মালিক কিংবা মিনারেল ওয়াটার ও জুস তৈরির কারখানার মালিক এগুলো তোয়াক্কা করছে না। তারা জরিমানা পরিশোধ করেই পুনরায় বিষাক্ত ও খাবারের অযোগ্য সামগ্রী তৈরি করে বাজারজাত করছে। হাতিরপুল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মুসলিম সুইটস মিষ্টির কারখানার অভিযান চালিয়ে মোবাইল কোর্ট বিষাক্ত রং সীজ করে। নোংরা ময়লা-আবর্জনায় মিষ্টি তৈরির কারণে ম্যানেজার মামুনকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। মাত্র একদিন পর মালিক কোন তোয়াক্কা না করে সেই আগের পরিবেশেই মিষ্টি তৈরি করে বাজারজাত অব্যাহত রেখেছে । নাজিম উদ্দিন রোডে মমিন সুইটস নামে মিষ্টির কারখানায় অভিযান চালিয়ে হাজার পাওয়ারের বিষাক্ত রং এবং এই রং ও খাবারের অযোগ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি মিষ্টি সীজ করে। ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, আইনী দুর্বলতা ভেজাল ও খাবারের অযোগ্য খাদ্য প্রস্তুতকারীদের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোর সুযোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ ইত্তেফাকে প্রতিদিন ফোন করে একটাই দাবি তুলে ধরেছেনঃ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের এই ভেজাল খাবার থেকে রক্ষা করতে কিছু একটা করুন। খাদ্যে ভেজালকারীরা খুনীদের চেয়েও বড় অপরাধী এবং তাদের কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে চরম শাস্তি প্রদানের দাবি জানাই। আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন জরুরি বলে তারা দাবি করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট গতকাল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হলে অভিযান চালায়। ঐ সময় ছাত্র-ছাত্রীরা আমরা কী খাচ্ছি সংবাদের শিরোনাম উল্লেখ করে মোবাইল কোর্টকে হাততালি দেয় স্বাগতম স্বাগতম বলে অভিনন্দন জানায়। ভেজাল প্রতিরোধে এই অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি জানায়। মোবাইল কোর্ট এই ডাইনিং হলের রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর, ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশের রান্না করার দৃশ্য দেখতে পায়। পানি রাখার জগ ও পান করার প্লাস্টিকের গ্লাসগুলো দেখে মোবাইল কোর্ট বলে উঠেঃ হায় আল্লাহ! এই পরিবেশে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা খাচ্ছে! কোর্টের কর্মকর্তারা বলে উঠেনঃ এই পরিবেশের কথা ভাবতেও অবাক লাগে ডাইনিং হল ম্যানেজারকে ৮শ' টাকা জরিমানা করা হয়।

ডায়াগনস্টিক সেবার নামে প্রতারণা

প্রতিবেদন
ডায়াগনস্টিক সেবার নামে প্রতারণা

প্রতিবেদক
সুখদেব সানা

প্রকাশের তারিখ
৭ এপ্রিল ২০০৬

সংবাদপত্র
সাপ্তাহিক বিচিত্রা

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক আজকের প্রত্যাশা
যুগ্ম বার্তা সম্পাদক, ঢাকা।

ডায়াগনস্টিক সেবার নামে প্রতারণা

রোগ নির্ণয়ই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাজ। সঙ্গত কারণেই এই পেশায় জড়িতদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হয়। রোগীদের সেবায় হতে হয় নিবেদিত। কিন্তু বাংলাদেশে সেবা নয় বাণিজ্যই মূল লক্ষ্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর। রাজধানীসহ দেশের সর্বত্রই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা প্রতারণার অভিযোগ। মাত্রাতিরিক্ত ফি, ভুল রিপোর্ট, অনভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দিয়ে পরীক্ষা ও রিপোর্ট লেখা, রোগীর অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে চিকিৎসকদের প্রলুব্ধ করাসহ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চরম স্বেচ্ছাচারিতার কাছে রোগীরা আজ অসহায়। মাত্র এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করে এক দশক সময়ে আজ কয়েকশ' কোটি টাকার অ্যাসেটসমৃদ্ধ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কোন কোনও প্রতিষ্ঠান। আসলে কী করছে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো? অনুসন্ধান করে প্রচ্ছদ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে এই রিপোর্টে।

দেশজুড়ে যেসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশই অবৈধ। ২৭ এপ্রিল ২০০৫ দ্য ইনডিপেনডেন্ট রিপোর্ট করেছে বরিশাল শহরে ৩৯টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের মাত্র আটটির বৈধ লাইসেন্স আছে। বাকি ৩১টির ১৫টি লাইসেন্সের আবেদন করেছে ও ১৬টির কোনও কাগজপত্র নেই। এসব ল্যাবে দক্ষ চিকিৎসক যোগ্য টেকনিশিয়ান এমনকি ভাল মানের যন্ত্রপাতিও নেই। দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ১২ মার্চ ২০০৬ তারিখে রিপোর্ট করেছে খুলনা ও যশোরে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে যোগ্য ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান নেই। অথচ সেবার নামে হাতিয়ে নিচ্ছে টাকা-পয়সা। অধিকাংশ ল্যাবের বৈধ কাগজপত্রও নেই। ১৯ অক্টোবর ২০০৪ সালের একটি দৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছিল সিলেটে ক্লিনিক রয়েছে ৩৩টি, এর মধ্যে ১৭টির অনুমোদন নেই। অপরদিকে ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে শতাধিক। এরও অর্ধেকের অনুমোদন নেই। সংবাদে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কয়েকজন মালিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বা নবায়ন ছাড়া ব্যবসা চালানো সম্ভব হওয়ায় তারা রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা করেন না। অতীতে কিছু মানুষ সেবার উদ্দেশ্যে শহরে বা শহরের বাইরে ক্লিনিক, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তার দায়িত্বে থাকতেন সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্ত মানুষের সেবা।

বর্তমানে সেবা নয় লাভই বড়। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার। উপজেলা পর্যায়েও ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এগুলোর রেজিস্ট্রেশন এবং নবায়ন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিএনপি-জামাত জোট সরকার উদাসীন। বেসরকারি ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করতে লাগে যোগ্য চিকিৎসক, মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ও দক্ষ টেকনিশিয়ান। কিন্তু অধিকাংশ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যোগ্য চিকিৎসক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর দক্ষ টেকনিশিয়ান নেই। বিধি অনুসারে দশ বেডের ক্লিনিকে কমপক্ষে একজন স্পেশালিস্ট, তিনজন মেডিকেল অফিসার, ছয়জন নার্স এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লিনার থাকতে হবে।

দেখা যায় ক্লিনিকের মালিক ডাক্তারদের নামধাম সর্বস্ব সাইন বোর্ড লাগিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। নাম ব্যবহারের জন্য ডাক্তারদের হাতে গুঁজে দেন কিছু টাকা। আবার একই ডাক্তার বিভিন্ন ক্লিনিকে নাম রেজিস্ট্রার করেছেন। প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যোগ্য প্যাথলজিস্ট/ডাক্তার নেই। অধিকাংশই চলছে টেকনিশিয়ানদের দ্বারা। তাদেরও যোগ্যতা নিয়ে রয়েছে সংশয়। এগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিক হয় না। ফলে অর্থ ব্যয় করেও ভাল চিকিৎসা পাওয়া যায় না। দেশে বিধিবিধান লঙ্ঘন করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্তি অর্থ আদায় করছে। অবশ্য বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত বেশকিছু হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইতোমধ্যে মান উন্নয়নে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের ফি অতিরিক্ত হওয়ায় সাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ চিকিৎসা সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন চিকিৎসা ও পরীক্ষা ফি সরকার নির্ধারণ করে না দেয়ায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রীতিমতো রোগীদের গলা কাটছে।

কোটি টাকা বাণিজ্যের নেপথ্য কথা

ব্লাড সুগার টেস্ট করতে খরচ হয় পাঁচ টাকারও কম। কিন্তু ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ফি নিয়ে থাকে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। এ থেকেই বোঝা যায় তাদের লাভের পরিমাণ কত। তারপরও পরীক্ষার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ফি নেই। একেক জায়গায় একেক রকম ফি। পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার যে টেস্টে ৫০০ টাকা নেয়, একই টেস্টে মেডিনোভা ৭০০ টাকা নেবে। আবার ওই টেস্টই অ্যাপোলো হাসপাতালে করতে গেলে নেবে ১০০০ বা তারও বেশি। আর ইবনে সিনা ২৫% কম নেয় টেস্ট ফি অন্যান্যদের চেয়ে বাড়তি রেখে। সাধারণ কোনও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্টটি হয়তো ৪০০টাকা বা তার কম-বেশি নেবে। ফি'র এই হেরফের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ দাবি করে উন্নতমানের কথা। কিন্তু কোথায় কেমন মানের টেস্টের মানের কোনও গ্যারান্টি নেই কোথাও।

একই টেস্ট একই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দেড়-দু'মাসের ব্যবধানে দ্বিগুণের বেশি দামে করাতে হয় এমনটিও ঘটছে অহরহ। এনআইসিভিডি'র ডাক্তার মল্লিকের সুপারিশের ভিত্তিতে ৪০% কমিশনে মূল ফি ৩০০ টাকা থেকে কমিয়ে করা হয় ১৮৭ টাকা। একই টেস্ট করতে ৫ অক্টোবর ২০০৫ মেডিনোভা মূল ফি ৬০০ টাকা থেকে ৪০% কমে নেয় ৩৭৪ টাকা। মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে একটি টেস্টের মূল্য দ্বিগুণ কেন, এই প্রশ্ন করায় কর্তৃপক্ষ উত্তর দেয় দাম বেড়ে গেছে। প্রায় সব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মূল্যের হেরফের হয়নি। অথচ মেডিনোভা কর্তৃপক্ষ দ্বিগুণ মূল্য নির্ধারণ করে রোগীদের কাছ থেকে তা আদায় করছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা প্রদান করেন রেফারি ডাক্তারকে। অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কমিশনভিত্তিক টাকা প্রদান করেন। অর্থাৎ একটি টেস্টের মূল্য কতটা কমে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো করাতে পারে তা কল্পনাতীত। ইবনে সিনায় একটি ইইজি করাতে ১২০০ টাকা লাগে। ২৫% ডিসকাউন্ট বাদে তার ফি আসে ৯০০ টাকা। পরিচিত কোনও ডাক্তার যদি সেখানে ৪০% কমিশনে রোগী পাঠায় তাহলে তার মূল্য হয় ৬০০ টাকা। ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো রোগীদের কাছ থেকে টাকা লুট করে টাকার পাহাড় গড়ছে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ প্রত্যেকটা টেস্টের ক্ষেত্রে ২০%-৮০% টাকা বেশি নেয়া হয় রোগীদের কাছ থেকে। লাভের একটা অংশ ডাক্তারদের কমিশনে ব্যয় হয়।

রিপোর্ট প্রদান ও ফি আদায়েও চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। বছরের পর বছর সেবার নামে চিকিৎসা বাণিজ্য চললেও এ নিয়ে প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের কোনও মাথাব্যথা নেই। অধিকাংশ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকই ডাক্তার। এ কারণে সরকারি হাসপাতাল ও প্রাইভেট চেম্বারের সঙ্গে তাদের রয়েছে সুসম্পর্ক। আকর্ষণীয় চেম্বার ও কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে তারা ডাক্তারদেরকে যুক্ত করছে তাদের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে। আর ডাক্তাররাও এই সুযোগে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় টেস্ট করাতে বাধ্য করছেন রোগীদের। এতে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ও ডাক্তাররা লাভবান হলেও বাড়তি চিকিৎসা খরচ যোগাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন রোগীরা। আর বেশি লাভের আশায় অপ্রতুল জনবল দিয়ে পরীক্ষা করানো হয় বলে রোগীরা অহরহ ভুল ডায়াগনসিসের শিকার হচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সালান জানান, কনসালটেন্টের কাজ হলো ফ্লেবোটমিস্ট (রক্ত সংগ্রহকারী) টেকনোলজিস্ট ও রেডিওগ্রাফারের কাজ তদারকি করে রিপোর্ট দেয়া। কেবল দস্তখত করে রিপোর্ট দেয়া নয়। তবে সঠিকভাবে তদারকি ও নির্ভুল রির্পোটের জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্যাথলজি বিভাগে একজন এবং রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগে একজনসহ মোট দু'জন সার্বক্ষণিক কনসালটেন্ট থাকা উচিত। রোগীর চাপ বেশি এমন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খণ্ডকালীন একজন কনসালটেন্টের পক্ষে নির্ভুল রিপোর্ট দেয়া অত্যন্ত কঠিন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

যত্রতত্র ডায়াগনস্টিক সেন্টার

ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামের দোকান গড়ে উঠেছে যত্রতত্র। তবে রাজধানীর কিছু কিছু এলাকায় এ সেন্টারগুলোর আধিক্য এত বেশি যে, সে এলাকাগুলোকে অনেকেই ডায়াগনস্টিক মহল্লা বলে মন্তব্য করেন। এমনই একটা এলাকা মোহাম্মদপুরের কলেজ গেইটের হুমায়ূন, বাবর ও খিলজী রোড। এই তিনটি রোডসহ পাশের শ্যামলী এলাকায় গড়ে উঠেছে শতাধিক প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত কয়েকটি নামকরা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সরাসরি মালিক কিংবা অংশীদার। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল, জাতীয় কিডনী হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, ক্রিসেন্ট হাসপাতালসহ বেশ কয়েকটি নামকরা হাসপাতাল রয়েছে শেরেবাংলা নগরে। এসব হাসপাতালের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রোগীর আধিক্য সবসময়ই বেশি। এ কারণে এ এলাকায় প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যাও বেড়েছে। তবে দুঃখজনক সত্য হলো, এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বেশিরভাগই নামমাত্র যন্ত্রপাতি দিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

টাইফয়েড, ডেঙ্গুসহ জ্বরের রিপোর্ট, অনেক নরমাল রোগীর ইসিজিসহ এ ধরনের ডায়াগনস্টিকগুলো ল্যাব এসিসট্যান্টরা করে থাকে বলে জানা গেছে। বুকে ব্যথা নিয়ে হৃদরোগ হাসপাতালে গেলে ওয়ার্ড বয়রা প্রাথমিকভাবে ইসিজি করে। এরপর রোগীকে নিয়ে শুরু হয় বাণিজ্য। কোনও সমস্যা না থাকলেও বলে আপনার বুকের সমস্যা, সরকারি হাসপাতালের ইসিজি মেশিনে বোঝা যাচ্ছে না। বোঝেন না, সরকারি যন্ত্রপাতি আর কত সময় ভাল থাকে? সামনে ওমুক ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে। ওখানকার মেশিন নতুন। ওখানে যেতে পারেন। আমরা লিখে দিচ্ছি। ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারবেন। সেখানে নিয়ে ইসিজি করায়। ৬৬ টাকার ইসিজির চার্জ নেয় ৫০০ টাকা। ক্লিনিকে ভর্তির জন্য এক রাতে দিতে হয় আরও ৬০০ টাকা। ডাক্তার আসে রাতে। দেখে রোগী। ইসিজি নরমাল। ডাক্তার কয়েকটি গ্যাসের

ট্যাবলেট দিয়ে বলেন, আপনার তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই এক রাতের চিকিৎসায় রোগীর প্রায় ২/৩ হাজার টাকা খরচ। টাকার ভাগ চলে যায় সরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, বয় বা নার্স ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চুক্তিবদ্ধ দালালদের পকেটে। অনেক সময় টেকনিশিয়ানরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সই জাল করে রিপোর্ট দেয়। এতে সঠিক ডায়াগনসিস তো হয়ই না, বরং অনেক ভুল ডায়াগনসিসের ঘটনা ঘটে এবং সে মোতাবেক ভুল ওষুধ খেয়ে রোগী জটিল অবস্থায় উপনীত হয়।

পপুলার, ইবনে সিনা ও মেডিনোভা সমাচার

রাজধানীসহ দেশব্যাপী পরিচিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার পপুলার। এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে ভুল ডায়াগনসিস ও বিভিন্ন টেস্টের জন্য বেশি ফি আদায়ের। তাছাড়া সময়মতো রিপোর্ট দেয়াও ভোগান্তিতে পড়েন রোগীরা। অধিক মুনাফার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে কম জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এখানে। ৫টি সেন্টারে অপ্রতুল জনবল দিয়েই বিভিন্ন রোগের অসংখ্য পরীক্ষা করা হয়। এ কারণে ভুল ডায়াগনসিসের ঘটনা ঘটে বলে ভুক্তভোগীরা জানান। ডাক্তারদের কমিশন দেয়ার কারণে এখানকার বিভিন্ন টেস্টের ফি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। পপুলারে ব্রেইনের সিটি স্ক্যান ফি ৩৫৮০ টাকা। এই টেস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ২০০০ টাকা এবং বারডেমে ৩০০০ টাকা। এখানে ইইজি টেস্ট ১২০০ টাকা। বিএসএমএমইউ-তে ইইজি ৬০০ টাকা। পপুলারে হরমোনের টি-৩ পরীক্ষার ফি ৬০০ ও ইটিটি ১৮০০ টাকা। বিএসএমএমইউ-তে টি-৩ টেস্ট ৩০০ টাকা ও ইটিটি ১২০০ টাকা। পপুলারে অন্যান্য পরীক্ষার ফি'ও এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিদিন এখানে কমপক্ষে হাজার রোগী পরীক্ষা করাতে আসেন। এদের প্রায় সবাইকে পাঠান কমিশনভোগী ডাক্তাররা। চিকিৎসকদেরকে ৩৫% থেকে ৫০% পর্যন্ত কমিশন দেয় পপুলার- এটা ওপেন সিক্রেট। প্যাথলজি বিভাগে আছেন ৬ জন ফ্লেবোটমিস্ট। প্রতিদিন প্যাথলজিতে আসা ৫০০-৬০০ রোগীর রক্ত সংগ্রহ করেন তারা। এসব রোগীর রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার জন্য টেকনোলজিস্ট মাত্র ১০ জন। জানা গেছে, সন্ধ্যার পর প্যাথলজি ও রেডিওলজি ইমেজিং পরীক্ষার রিপোর্ট দেন খণ্ডকালীন কনসালটেন্টরা। খণ্ডকালীন হওয়ায় এবং টেস্টের পরিমাণ বেশি হওয়ায় সব পরীক্ষা তদারকি করে তাদের পক্ষে রিপোর্ট দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে ঘটে ভুল ডায়াগনসিসের ঘটনা।

কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জের আসমা হাই নামে এক রোগী পপুলার, মেডিনোভা ও আনোয়ারা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ভুল রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। আলসারকে ক্যান্সার হিসেবে রিপোর্ট দেয়া এবং শমরিতা হাসপাতালের ভুল চিকিৎসার জন্য ২৫ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন তিনি। অভিযোগটি যথাযথ তদন্তের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর সে তদন্ত কাজ বেশিদূর এগোতে পারেনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তদবিরের কারণে। পপুলারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, কিছু কিছু রক্ত বা বায়োপসি সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা লাগে। এসব পরীক্ষার রিপোর্ট তাৎক্ষণিক দেয়া সম্ভব হয় না। অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেশের দক্ষ টেকনোলজিস্ট এবং সেরা বিশেষজ্ঞ প্যাথলজিস্ট ও রেডিওলজিস্ট দিয়ে দ্রুত নির্ভুল রিপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে রোগীদের । হয়রানি বা দেরিতে রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগ সত্যি নয়। অন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তুলনায় পপুলারের টেস্টের ফি ও অনেক কম বলে তিনি দাবি করেন। অথচ অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের অন্যান্য ডায়াগনস্টিকের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ফি নেয়া হয় পপুলারে।

‘স্বাস্থ্য সেবায় পথ প্রদর্শক’ এই অঙ্গীকার নিয়ে ইসলামি আদলে প্রতিষ্ঠিত হয় ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কিন্তু সেবার নামে এই প্রতিষ্ঠানটিতেও চলছে বাণিজ্য। সব পরীক্ষায় ২৫% ছাড় টিভিতে এই বিজ্ঞাপন দেখে দেশের বিপুলসংখ্যক রোগী ইবনে সিনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অল্প খরচের আশায় অনেকেই আসেন ইবনে সিনায় বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে। প্রতিদিনই এ ধরণের রোগীর ভিড় দেখা যায়। ইবনে সিনার কিছু চুক্তিবদ্ধ ডাক্তার আছেন, যাদের কাছে চিকিৎসা নিলে অনেক রোগীকে তারা ৪০% পর্যন্ত কমিশনে টেস্ট করার সুপারিশ করেন। অবশ্য এ সুযোগ পরিচয় ও সুসম্পর্ক সূত্রে বলে জানা গেছে। বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠনের মাধ্যমে একটি বিশেষ ইসলামি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা পরিচালনা করেন ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো। ২৫% কম খরচ তাদের বিজ্ঞাপনে থাকলেও আসলে এটার কোনও সত্যতা নেই। যেখানে ব্রেইনের একটা ইইজি করাতে বিএসএমএমইউ ও বারডেমে লাগে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা, সেখানে ইবনে সিনা তার ফি নির্ধারণ করেছে ১২৫০ টাকা। তা থেকে ২৫% কমিশন বাদে ফি আসে ৯৩৭ টাকা। আবার ওই একই পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেলে লাগে ৪৫০ টাকা। অর্থাৎ রীতিমতো পুকুর চুরি।

স্বল্প পরিমাণ মূলধন নিয়ে ধানমণ্ডির শংকর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে ইবনে সিনা। এক দশকের মধ্যে তাদের অ্যাসেট হয়েছে কয়েকশ’ কোটি টাকা। ইবনে সিনার রয়েছে ৭টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, একটি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ, ফার্মাসিউটিক্যালস ব্যবসা। অন্যান্য ইসলামি প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে অর্থ বিনিয়োগ। ল্যাব ইনচার্জ নূরে আলমসহ ইবনে সিনার কয়েকজন কর্মচারী জানান, অন্যান্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চেয়ে ইবনে সিনায় কম ফিতে টেস্ট করা হয় এটাই সত্যি। এখানে কোনও দু’নম্বরি নেই। আরও বলেন, ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ট্রাস্ট হলেও এটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং ফি ছাড়া টেস্ট ইবনে সিনা করবে কেন ? এখানে টেস্ট করানো ময়মনসিংহের আতাউর রহমানের কাছে জানতে চাইলে বলেন, বেশ কিছুদনি আগে তার এক আত্মীয়ের একটি সিটি স্ক্যান করানো হয়েছিল ইবনে সিনা থেকে। ডাক্তার সেটি আবার পিজিতে করাতে বলেন। দু’টি স্ক্যানে দু’রকম রেজাল্ট আসে। তবে পিজির রিপোর্ট অনুযায়ী চিকিৎসা করে রোগী সুস্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে সিনার একজন কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করলে বলেন, রিপোর্টে সামান্য হেরফের থাকতেই পারে। এতে রিপোর্ট ভুল হয়েছে এমনটি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও বলতে পারেন না।

রোগীদের থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে রাজধানীর অন্যান্য সেন্টারের মতো ধানমণ্ডি এলাকার মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেডও। বাড়তি ফি নেয়ার পাশাপাশি মেডিনোভার বিরুদ্ধে রয়েছে ভুল ডায়াগনসিস, দেরিতে রিপোর্ট দেয়া, রোগীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মতো নানা অভিযোগ। মেডিনোভার স্বত্বাধিকারী মোকাদ্দেস হোসেন পেশায় একজন চিকিৎসক। এ কারণেই বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকের সঙ্গে রয়েছে তার ভাল যোগাযোগ। তার ওপর অন্যান্য সুবিধা দিয়ে মেডিনোভায় রোগী আনা সম্ভব হচ্ছে। অন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর তুলনায় এখানে সব পরীক্ষায় বেশি ফি নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ শোনা যায় রোগীদের কাছ থেকে। জানা গেছে, মেডিনোভায় হরমোনের ‘টি-৩’ টেস্ট করাতে নেয়া হয় ৬১৪ টাকা। একই ফি বিএসএমএমইউতে মাত্র ৩০০টাকা। বিএসএমএমইউতে ব্রেইনের এমআরআই পরীক্ষা ৫ হাজার টাকা। এই টেস্টের জন্য মেডিনোভায় নেয়া হয় ৬ হাজার ১৩৫ টাকা। ওষুধসহ পড়ে ৮ হাজার ৬১৫ টাকা। বিএসএমএমইউতে ইটিটি ১২শ’ টাকা এবং ব্রেইনের সিটিস্ক্যান ২ হাজার টাকা। মেডিনোভায় ইটিটি ২ হাজার ৫০ টাকা এবং ব্রেইনের সিটিস্ক্যান ৩ হাজার

৬শ’ টাকা। অন্যান্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ইটিটি ১৮শ’ টাকা এবং ব্রেইনের সিটিস্ক্যান ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ফি ছাড়াও মেডিনোভার বিরুদ্ধে রয়েছে ভুল রিপোর্ট দেয়ার অভিযোগও।

মেডিনোভার কাউন্টারে দেখা গেছে রোগীদের উপচেপড়া ভিড়। এসব রোগীর অধিকাংশই কমিশনভোগী চিকিৎসকদের পাঠানো। রোগীদের চাপ সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় কম জনবল দিয়ে শত শত পরীক্ষা করানোর ফলে রিপোর্ট নিতে এসে প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রোগীরা। জানা যায়, রোগীর চাপ এত বেশি যে, এমআরআই ও সিটিস্ক্যান পরীক্ষা করতে ২/৩ দিন আগে নাম নিবন্ধন করতে হয়। বাড়তি ফি কেন নেয়া হচ্ছে জানতে চাইলে মেডিনোভার ম্যানেজার (প্রশাসন) জানান, অন্যান্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তুলনায় এখানকার ফি বেশি নয়। রাজধানীর অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, এসব সেন্টারগুলো মিডিয়ার জোরে এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতির দোহাই দিয়ে ভাল ব্যবসা করলেও এখানকার ডায়াগনসিস গড়ে ৫০-৭০% সঠিক। এসব সেন্টারে বর্তমানে অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট ছাড়াই টেকনিশিয়ান দিয়ে রিপোর্ট লেখানো হচ্ছে বলে এমনটি ঘটছে। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যও অনেক সময় ভুল রিপোর্ট হতে পারে বলে অনেক চিকিৎসক জানান।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর বিভিন্ন অপকৌশল

বেশি মুনাফার জন্য নিত্য নতুন কৌশল নিচ্ছে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো। রোগীর সংখ্যা বাড়াতে দালাল, এজেন্ট ও নার্স নিয়োজিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকদেরকে বেছে বিভিন্ন টেস্টের তালিকা সংবলিত শিট পাঠাচ্ছে তারা। এর আগে কমিশনভোগী চিকিৎসকরা হাসপাতালের মুদ্রিত প্যাডে কিংবা আলাদা কাগজে পরীক্ষার নাম লিখে রোগীদের নির্ধারিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে পাঠাতেন। এখন ওই শিট পাঠানোর ফলে আগের তুলনায় কমিশন লেনদেন ও পরীক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিটি পরীক্ষার জন্য হিসাব কষে মাস শেষে চিকিৎসকরা কামিয়ে নিচ্ছেন ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ কমিশন। সরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এ ধরনের পরীক্ষার শিট বেশি পাঠানো হয়। এখানকার ওয়ার্ডগুলোতে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের টেবিলে নজর রাখলেই যে কারও চোখে পড়বে নানা রঙের শিটগুলো। দেখতে প্যাডের মতো এ শিটগুলোতে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয় ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীদের। অথচ হাসপাতালের ভেতরেই রয়েছে নামমাত্র অথবা বিনামূল্যে সব ধরনের পরীক্ষার সুবিধা। চিকিৎসক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে এখানে আসা গরিব রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খরচ করতে হয় বাড়তি টাকা। অতিরিক্ত এ অর্থের যোগান দিতে গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন তাদের স্বজনরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দি প্যাথলজি সেন্টারের পাঠানো ওই শিটে বিভিন্ন টেস্টের তালিকার নিচে বড় আকারে লেখা রয়েছে ২০/১ নবাব কাটারা, নিমতলী ঢাকা। প্রায় একই ধরনের একটি শিট দেখা গেছে ২৬ নং ওয়ার্ডে দায়িত্বরত চিকিৎসকদের টেবিলে। এ শিটটি পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের। নামী-দামি সেন্টারের পাশাপাশি নামসর্বস্ব সেন্টারগুলো থেকেও এ ধরনের শিট পাঠানো হয় হাসপাতালগুলোতে। এ ধরনের শিট ছাড়াও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঢুকে রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা এবং এমআরআই, সিটিস্ক্যানসহ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগীদের নিয়ে যেতে দেখা গেছে নিয়োজিত এজেন্টদের। এ কাজে সহায়তা করছেন চিকিৎসক, নার্স ও ওয়ার্ডবয়রা। এ ব্যাপারে কথা হয় ঢাকা মেডিকেলের উপ-পরিচালক ডা. কাজী কামালউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তিনি বলেন, রোগীদের বাইরে পরীক্ষা করাতে না পাঠানোর জন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নোটিশ দেয়া হয়েছে। তারপরও বাইরে গেলে আমাদের কিছুই করার নেই।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনেক সেন্টারে অতিরিক্ত পরীক্ষা করাতে প্রলুব্ধ করা হয় রোগীদের। শুধু তাই নয়, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ম্যানেজমেন্ট থেকে অনেক চিকিৎসককে বেশি বেশি টেস্ট দিতেও বলা হয়। অনেক ডাক্তার এই অশুভ তৎপরতাকে সাদরে গ্রহণ করে রোগীদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বিভিন্ন টেস্ট করার পরামর্শ দেন।

শুধু এফএনএসি (যক্ষ্মা ও ক্যান্সারসহ জটিল রোগ শনাক্তকরণের জন্য টিস্যু পরীক্ষা) করালেই চলবে না। এক্স-রে, হরমোনসহ কিছু রক্তের পরীক্ষাও করানো প্রয়োজন, এগুলোর কোনটাই তো আপনি করাননি। করাবেন? পান্থপথের আনোয়ারা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের রিসিপশনিস্ট এভাবেই প্রলুব্ধ করছিলেন একজন রোগীকে। বাগেরহাটের আজাদ নামের ওই রোগী গলার এফএনএসি (ফাইন নিডিল এসপিরিসন সাইটোলজি) পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন। রিসিপশনিস্টের এ ধরনের প্রস্তাব শুনে অবাক হন তিনি। বললেন, ডাক্তার তো শুধু এফএনএসি করাতে বলেছেন। অন্য কোনও পরীক্ষার কথা বলেননি। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও এখানে পরীক্ষা করানো যায়? রিসিপশনিস্ট বললেন, হ্যাঁ। হরমোন টেস্টের ফি কত টাকা জানতে চাইলে ২২শ টাকা জানানো হয় আমির হোসেনকে। অথচ চিকিৎসক তাকে সাড়ে ছয়'শ টাকার এফএনএসি পরীক্ষার পরামর্শ দেন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া প্রতিদিন কতজন রোগীর পরীক্ষা হয় এখানে? রিসিপশনিস্টকে প্রশ্ন করলে জবার এড়িয়ে যান তিনি। শুধু আজাদই নয়, এরকম অসংখ্য রোগীকে প্রতিদিনই অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে হাজার হাজার টাকা। এদের পাতা ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছেন শত শত রোগী। জানা গেছে, ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানটির তেমন সুনাম নেই। ফলে রোগীদের তেমন একটা সমাগম থাকে না। রোগী কম থাকার কারণেই সেবার নামে চলানো হয় এ ধরনের চিকিৎসা বাণিজ্য। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে রোগীদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে কেন জানতে চাইলে আনোয়ারা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্যাথলজিস্ট ডা. মোঃ গোলাম মোস্তফা জানান, এফএনএসি পরীক্ষার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন। চিকিৎসকরা এসব পরীক্ষা ছাড়াই অনেক সময় রোগী পাঠান। সে পরীক্ষাগুলো এখানে করার পরামর্শ দেয়া হয়। যাতে দ্বিতীয়বার এসব পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে না হয় রোগীদের। তাদের ল্যাবে হরমোন টেস্ট করা হয় না বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এ টেস্টটি হয়তো অন্য কোথাও করানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।

সরকারি হাসপাতালে বসে রক্ত সংগ্রহ ও টেস্টের দাম আদায় করছে অনেক ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এ চিত্র রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এখন প্রায়ই দেখা যায়। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩১ নম্বর ক্যাজুয়েলটি ওয়ার্ডে ৯ বছরের মেয়ে রিনাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে আসেন দিনমজুর আলম মিয়া। পেটে টেঁটাবিদ্ধ রিনাকে দেখে ক্যাজুয়েলটি বিভাগের ২নং ইউনিটের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. বিভাস বরণ বিশ্বাস রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন। তিনি ওয়ার্ডে অবস্থানরত ধানমণ্ডি এলাকার হেলথ প্লাস মেডিকেল সার্ভিসের ২জন এজেন্টকে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন। নির্দেশ পেয়ে হেলথ প্লাসের এজেন্টদের একজন তার শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করেন এবং অন্যজন রক্ত পরীক্ষার ফি বাবদ নেন ৫৮০ টাকা। ঘটনাটি দেখার পর হাসপাতালের ভেতরে বিনামূল্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকার পরও রোগীর রক্ত পরীক্ষা বাইরে করানো হচ্ছে কেন জানতে চাইলে ডা. বিভাস বলেন, হাসপাতালে রিপোর্ট পেতে দেরি হয়। রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি দরকার। হাসপাতালে সরকারি নার্স থাকার পরও বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এজেন্টদের রোগীর শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করার নিয়ম

আছে কিনা জানতে চাইলে এড়িয়ে যান। অনুসন্ধানে জানা যায়, পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ করা এবং হাসপাতালে বসেই ফি নেয়ার ঘটনা শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই নয়, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে অন্যান্য সরকারি হাসপাতালেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরেও দেখা গেছে একই চিত্র। এ হাসপাতালে মোহাম্মদপুর-শ্যামলী এলাকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নিয়োগকৃত এজেন্ট ও কমিশনভিত্তিক দালালদের পাঁয়তারা চলতেই থাকে।

ভিসা দেয়ার আগে স্বাস্থ্য রিপোর্ট চায় অনেক দূতাবাস। বিশেষ করে চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য যাবেন যারা তাদের জন্য স্বাস্থ্য রিপোর্ট করাতে হয়। এ কাজে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ব্যবসা করে মূলত দুইভাবে। এক. অনেক ফিট মানুষকেও আনফিট রিপোর্ট দিয়ে তাকে ঘাবড়ে দিয়ে পরে উৎকোচের বিনিময়ে সঠিক রিপোর্ট দেয়। দুই. যাদের ফিটনেস রিপোর্ট সত্যিই খারাপ থাকে, তাদের কাছে মোটা অংকের উৎকোচ দাবি করা হয় রিপোর্ট ভাল করে দেয়ার জন্য। আর এ কাজে পারঙ্গম রাজধানীর বনানী এলাকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ও সেখানকার কিছু অভিজ্ঞ দালাল। এখানকার সেন্টারগুলোতে মেডিকেল টেষ্ট করাতে এসে প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোনভাবে প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন বিদেশগামী যাত্রীরা। দালাল ও মেডিকেল সেন্টার মালিকদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তারা। এদের অধিকাংশই গ্রামের সহজ-সরল দরিদ্র মানুষ। অতিরিক্ত টাকা আদায়ের জন্য এসব সেন্টারে কোন সময় একই পরীক্ষা একাধিকবার করানো হচ্ছে। কোনও সময় প্যাথলজিক্যাল টেস্টের ভাল রিপোর্ট দেয়ার কথা বলে পরীক্ষার আগেই আদায় করা হচ্ছে মোটা অংকের উৎকোচ।

জানা যায়, একজন যাত্রীর কাছ থেকে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট বাবদ ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেয়া হচ্ছে এসব মেডিকেল সেন্টারে। চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত চার্জ ও উৎকোচ দিতে না পারলে অনেকেই নানা ভোগান্তির শিকার হন। এখানে কুয়েত, সৌদিআরব, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যগামী যাত্রীদের মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। এসব মেডিকেল সেন্টারে ঘুষ লেনদেনের কাজে মালিক ও বিদেশগামী যাত্রীদের সঙ্গে লিয়াজোঁ করছে এক শ্রেণীর দালাল। নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে এ গ্রুপে। এদের অবস্থান মেডিকেল সেন্টারের আশেপাশের ফোন-ফ্যাক্স ও চায়ের দোকানগুলোতে। নারী দালালদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নূরজাহান আক্তার। যাকে সবাই পুষ্প নামে চেনে। দেড় যুগ ধরে বনানী এলাকায় দালালি করছেন তিনি। ১১নং রোডের আলজাজিরা মেডিকেল সেন্টারের পাশের রেজাউলের ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকেই বিদেশগামী যাত্রীদের ভাগান তিনি। কিন্তু দোকানে সবসময় বসেন না। দোকানদারই মোবাইল ফোনে পুষ্পকে ডেকে আনেন। উৎকোচের লেনদেনও হয় রেজাউলের মাধ্যমেই। প্যাথলজিক্যাল টেস্টে আনফিটকে ফিট করাতে কত টাকা লাগবে জানতে চাইলে পুষ্প জানান, পরীক্ষার আগে ও পরে আনফিট সিল না মারা পর্যন্ত ৫ হাজার এবং আনফিট হলে ১৬ হাজার টাকা।

সরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যোগসাজশ

শেরেবাংলা নগরের সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, হৃদরোগ হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল ও পঙ্গু হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলেও এসব হাসপাতালের রোগীরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রায়ই। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকার প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতির জন্য বরাদ্দ

দিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনেক যন্ত্রপাতি বিকল করে রেখেছে। তা মেরামতের টাকা পেলেও মেরামত করেনি। যেমন, হৃদরোগ হাসপাতালের ইটিটি বিভাগটি তিন বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। বন্ধ এ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। এ সুযোগে দালালরা নিজেদের পছন্দমতো ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রোগীদের। নামমাত্র মূল্যের ওই পরীক্ষার জন্য হাতিয়ে নিচ্ছে ২০০০ টাকা। এমনকি এ বিভাগ চালু থাকাকালেও ভাগিয়ে নিয়ে যাবার অভিযোগে অভিযান চলেছিল। ইসিজি পরীক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ রোগী তা থেকে বঞ্চিত হন। এ হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোগীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে প্রায়ই। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, একজন রোগীর সব পরীক্ষার ব্যবস্থা এই হাসপাতাল আছে। এ সংক্রান্ত একটি নোটিশ বোর্ডও টাঙানো আছে বহির্বিভাগের সামনে। লেখা রয়েছে, 'হাসপাতালে ইসিজি করতে ৬৬টাকা, ইকো সাদা-কালো করতে ২০০টাকা, ইকো কালার করতে ৬০০ টাকা। এ হাসপাতালে সব ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাইরে কোন পরীক্ষা করাবেন না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা যা অত্র হাসপাতালে নেই, তা করাতে আবাসিক সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।' অথচ এই নিয়ম মানছেন না হাসপাতালের সংশ্লিষ্টরা। এমনকি অনেক ডাক্তারও বাইরে পরীক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন রোগীদের। অধিকাংশ রোগীই অভিযোগ করেছেন, রোগী হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরা একগাদা পরীক্ষা করানোর জন্য রোগীদের পাঠিয়ে দেন হাসপাতালের পশ্চিমে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ল্যাবরেটরিগুলোতে। বিশেষ করে হুমায়ুন রোডের ঢাকা ল্যাব এখানকার সরকারি হাসপাতালগুলোর চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় ও দালালদেরকে কমিশনে চুক্তি করে রেখেছে তাদের কাছে রোগীদের টেস্ট করাতে পাঠাবার জন্য। তাছাড়া অন্যান্য ল্যাবরেটরি তো আছেই। এসব ল্যাবে ২০০ টাকার সাদা-কালো ইকো ফি নেয় ৫০০ টাকা এবং ৬০০ টাকার কালার ইকো ফি নেয় ২০০০টাকা। এভাবে সব টেস্ট ফি ইচ্ছামতো আদায় করে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো। নিজেদের পছন্দমতো ল্যাবে পরীক্ষা করানো না হলে ডাক্তাররা সে রিপোর্ট গ্রহণ করেন না। তখন রোগীকে আবার নতুন করে টেস্ট করাতে হয়। এ ঘটনা এখানকার ৪/৫টি সরকারি হাসপাতালের প্রত্যেকটিতেই ঘটছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা প্রসঙ্গে কথা হয় হৃদরোগ হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. সুফিয়া রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, এখানে চিকিৎসা হয় এমন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রায় সব ব্যবস্থা এখানেই রয়েছে। তবে নির্ধারিত মূল্যের বেশি যদি কেউ নেয় তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমার কাছে কোন রোগী এলে আমি বিনা পয়সায় করার কথা লিখে দেই। এনজিওগ্রাম করার জন্য সরকার নির্ধারিত কোন ফি নেই অথচ এখানে তা কেন নেয়া হয় জানতে চাইলে বলেন, সংশ্লিষ্ট একটি কমিটি এর জন্য ১০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে।

এদিকে পরীক্ষার জন্য রোগীদের বাইরে না পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ। ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর দেয়া আকর্ষণীয় কমিশনের লোভ সংবরণ করতে পারছেন না বিএসএমএমইউ হাসপাতালের কিছু ডাক্তার ও নার্স। এখানে কম মূল্যে সব পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও কমিশনভোগী কয়েকজন চিকিৎসক ও নার্স রোগীদের পাঠিয়ে দেন রাজধানীর বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। বিনিময়ে তারা কামিয়ে নিচ্ছেন মোটা অঙ্কের কমিশন। কোনও কোনও চিকিৎসক কমিশনের পাশপাশি পাচ্ছেন নানা রকম উপঢৌকন ও ফ্রি চেম্বার।

সবচেয়ে বেশি দালালদের দৌরাত্ম্যে দিশেহারা হচ্ছেন মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা। হাসপাতালের বহির্বিভাগে ঘটছে রোগী নিয়ে দালালদের টানাহেঁচড়ার মতো ঘটনা। একটি সংঘবদ্ধ বহিরাগত দালালচক্র ও অপতৎপরতা চালালেও কারও মাথা ব্যথা নেই। বরং হাসপাতালের কোন কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক ও নার্স এসব বহিরাগত দালালদের সহায়তা করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। দালালদের পাতা ফাঁদে পড়ে সবচেয়ে বেশি আর্থিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বাইরে থেকে আসা গরিব রোগীরা। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগের সামনে এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অবস্থান করছেন বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালের দালালরা। এসব দালাল রোগী আসা মাত্রই ঘিরে ধরছেন তাদেরকে এবং ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাইরে। স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে খারাপ ব্যবহারও করা হয় রোগীদের সাথে। দালালদের মধ্যে কেউ কেউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রোগীদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করে তাদের পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় আশপাশের বেসরকারী ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালের ল্যাবে। মিটফোর্ড হাসপাতালে এসব পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা থাকলেও রিপোর্ট পেতে দেরি হবে এরকম মন্তব্যের কারণে রোগী ও তাদের স্বজনরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাইরের ল্যাবে পরীক্ষা করাতে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ হাসপাতাল রোগ শনাক্তকরণের সব ধরনের পরীক্ষা ও মানসম্পন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার পরও নামসর্বস্ব এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালে পরীক্ষা করাতে গিয়ে রোগীরা প্রায় শিকার হচ্ছেন ভুল পরীক্ষা ও চিকিৎসার। দালালদের এ অপতৎপরতায় শুধু রোগী ও তাদের স্বজনরাই অতিষ্ট নন, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন মিটফোর্ড হাসপাতালের চিকিৎসক-কর্মচারীরাও। অন্যান্য দাবির পাশাপাশি দালালদের রোধ করা ও সব পরীক্ষা হাসপাতালের ল্যাবে করানোর জন্য ভবনের দেয়ালে কয়েকটি পোস্টার টাঙানো হয়েছে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে মিটফোর্ড হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো: ফজলুল হক বলেন, হাসপাতালের আশপাশে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালের মালিক ও তাদের নিয়োজিত দালালরা খুবই প্রভাবশালী।

অনভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের দেয়া ভুল রিপোর্ট

অনুসন্ধানে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর অনেক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে টেকনিশিয়ান দিয়ে রিপোর্ট লেখানোর বিষয়টিই বেরিয়ে এসেছে। টেকনিশিয়ানরা রিপোর্ট লিখছে এখন অনেক ল্যাবে। তবে কিছু কিছু সেন্টারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দিয়ে একেবারেই রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে না এরকম সেন্টারও রয়েছে খোদ রাজধানীতে। এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, এনডোসকপি, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রামসহ ৯৯% প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার কথা বলা হলেও রাজধানীর চানখারপুলের ডক্টরস ল্যাব-এ এসব পরীক্ষা করার মতো সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা নেই। ইসিজি দেখার জন্য কোনও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নেই। নেই প্রয়োজনীয় লোকবলও। কম্পিউটারের মাধ্যমে একজন মহিলা টেকনিশিয়ান ইসিজি পরীক্ষা করেন। কম্পিউটারের ম্যানুয়েল দেখে তিনিই তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট লিখে দেন। অথচ নিয়ম অনুযায়ী একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎকই ইসিজি রিপোর্ট দিতে পারেন। এই ল্যাবের দোতলায় প্যাথলজি বিভাগ গিয়ে দেখা গেছে, ক্যাশ কাউন্টারে একজন পরীক্ষা ফি নিচ্ছেন এবং কম্পিউটারের পাশে এক কোণে বসে অন্য একজন পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করছেন। কোনও প্যাথলজিস্ট তখন সেখানে ছিলেন না। রক্ত সংগ্রহকারীর কোনও ডিগ্রি আছে কিনা জানতে চাইলে একজন বলেন, এ কাজে ডিগ্রি লাগে না।

জানা গেছে, ঢাকা মেডিকেলে দু'জন টেকনিশিয়ান মাত্র দু'ঘন্টার চুক্তিতে নমুনাগুলো পরীক্ষা করেন। পরে বিকেল ৪টার পর বক্ষব্যাধি হাসপাতালের একজন প্যাথলজিস্ট এসে রিপোর্ট লিখে দেন। টেকনিশিয়ানদের করা কাজ তদারকি করার প্রয়োজন মনে করেন না এ প্যাথলজিস্ট। কিন্তু সঠিক তদারকি ছাড়া শুধু টেকনোলজিস্ট দিয়ে পরীক্ষা ফলাফল দেখে রিপোর্ট দেয়া উচিৎ নয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞ প্যাথলজিস্ট ও ডাক্তার জানিয়েছেন। বাবর রোডের উত্তরা হার্ট ফাউন্ডেশনে পার্ট টাইম দায়িত্ব পালনকারী পিজি'র ডা. এস এম মোস্তফা জামান জানান, কিছু পরীক্ষার ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের মাত্রা একজন প্যাথলজিস্ট ভালভাবেই দেখে রিপোর্ট করবেন। শুধু রিপোর্ট শিটে দস্তখত করাই প্যাথলজিস্টের কাজ নয়। জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. অমল চৌধুরী বলেন, প্রকৃত হৃদরোগ চিকিৎসক বা কার্ডিওলজিস্টের দেয়া রিপোর্ট ছাড়া কম্পিউটারের দেয়া ইসিজি রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়।

এসব ব্যাপারে কথা হয় ডক্টরস ল্যাব-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল মোবারকের সঙ্গে। তিনি বলেন,সব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ইসিজি করেন একজন টেকনিশিয়ান। রোগীর ইসিজিতে সমস্যা ধরা পড়লে কার্ডিওলজিস্টের পরামর্শ নেয়া হয়। তাছাড়া ছোটখাটো প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট টেকনিশিয়ানরাই করে থাকেন সব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। এ নিয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এখানে অভিজ্ঞতাই বিবেচ্য বিষয়।

ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে ভুল ডায়াগনসিস, ভুল চিকিৎসা ও অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন রোগী ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভুল ডায়াগনসিস ও ভুল চিকিৎসার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে আমার পা হারাতে বসেছিলাম। গত ১২ জানুয়ারি ডান পায়ে আঘাত পেয়ে তিনি ২৪/বি আউটার সার্কুলার রোডে ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান। সেখানকার জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক হাসপাতালের ভেতরেই তার ডান পায়ের একটি এক্সরে করান। এক্স-রে দেখে তার পা ভাল আছে এবং ওষুধ খেলে সেরে যাবে বলে জানান। বাসায় ফিরে পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন এবং পঙ্গু হাসপাতালে যান। সেখানকার চিকিৎসক একই এক্স-রে দেখে পা ভেঙে গেছে জানান। পঙ্গু থেকে পায়ে প্লাস্টার করে দেয়া হয়। তার চিকিৎসক পঙ্গু হাসপাতালের রেজিস্ট্রার হাড়, জোড়া ও বাত রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, পায়ের বেশ কয়েকটি হাড় ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। তাই প্লাস্টার করা হয়েছে। ৪ সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে। নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের চিকিৎসকের তার পা ভাঙার চিকিৎসা না দেয়াটা ঠিক হয়নি বলেও তিনি জানান। এ ব্যাপারে ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যোগাযোগ করা হলে ডা. উসরাত জানান, রুটিন অনুযায়ী ১২ জানুয়ারি ডিউটিতে ডা. দিপুর থাকার কথা। ডা. দিপুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সেদিন ডিউটিতে ছিলেন না বলে জানান। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও ইসলামি ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপতাল ঘুরে দেখা গেছে, ভুল চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান দু'টির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ করছেন অনেক রোগী। কম খরচে সুস্বাস্থ্য ও উন্নত চিকিৎসা এবং সর্ব সাধারণে সেবায় নিয়োজিত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান- এর কথা বলে রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে হাসপাতালগুলো। ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালের মুদ্রিত কার্ডে বলা হয়েছে, ব্রেইনের সিটিস্ক্যান পরীক্ষা ফি ২ হাজার ৫শ' টাকার স্থলে অন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেয়া হচ্ছে ৩ হাজার ৫শ' টাকা। অথচ পিজিতে সিটিস্ক্যান ২ হাজার টাকা এবং বারডেমে ৩ হাজার। ইসলামি ব্যাংক হাসপাতালে হরমোন 'টি-৩' পরীক্ষা ফি ৪৬০ টাকা। একই পরীক্ষা

পিজিতে ২শ'টাকা। ইসলামি ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশন ১৪ হাজার টাকা বলা হলেও রোগীদের থেকে আদায় করা হয় ১৫ থেকে ১৬ হাজার। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মা হচ্ছেন এমন সিজারিয়ান অপারেশনের রোগীদের কারও কারও কাছ থেকে ২০ হাজার টাকাও নেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সিজারিয়ান অপারেশন অন্য হাসপাতালে সর্বোচ্চ ১২ হাজার টাকা। আরবান প্রাইমারি হেলথ প্রকল্পের পরিচালনায় মেরী স্টোপে তা মাত্র ২ হাজার টাকায় হচ্ছে। সিজারিয়ান অপারেশন ফি এত বেশি কেন- জানতে চাইলে ইসলামি ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাফিজুর রহমান বলেন, নির্ধারিত ফি অনুযায়ী তাদের হাসপাতালে সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়। তবে জটিলতা দেখা দিলে এবং বেশি ভাড়ার কেবিন নিলে সিজারিয়ান অপারেশন ২০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। আমাদের নিয়ম একই রকম আছে। কিন্তু সব রোগীর ক্ষেত্রে সব নিয়ম ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই সম্ভব হয় না।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী চিকিৎসক ও সরকার

বাংলাদেশের চিকিৎসকদের সিংহভাগই সেবার চেয়ে অর্থ কামানোর মানসিকতা নিয়েই এ পেশায় আসেন। পেশায় যুক্ত হবার পর সেবাকে উপেক্ষা করে বাণিজ্যই হয় তাদের একমাত্র লক্ষ্য। একজন চিকিৎসকের যে দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য থাকার কথা তা নিমিষেই বিসর্জন দেন এখনকার প্রায় সব চিকিৎসকই। নীতিবহির্ভূতভাবে রিপোর্ট দেখার নামেও টাকা নিচ্ছেন অনেক চিকিৎসক। প্রাইভেট চেম্বারগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র বা পরামর্শ দেয়া বাবদ রোগীর কাছে থেকে নির্ধারিত ফি নিলেও পরে রিপোর্ট দেখার নামেও তারা আদায় করছেন বাড়তি টাকা। অভিযোগ রয়েছে অনেক চিকিৎসক ৩০০ থেকে ১২০০ টাকা ভিজিট নেন রোগীদের থেকে। আবার রিপোর্ট দেখার জন্য টাকা নেন। ফলে একদিকে রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় যেমন বেড়ে যায়, অন্যদিকে গরিব বা মধ্যবিত্ত রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন এসব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা সেবা থেকে। অতিরিক্ত ফি বহন করতে না পারায় অনেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আসতে পারছেন না। রাজধানীর কয়েকটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বার ঘুরে দেখা গেছে, সিএমএইচ-এর মূত্র ও কিডনী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেজর জেনারেল আলী আকবর ব্যবস্থাপত্র দেয়ার জন্য ফি নেন ৪০০ টাকা। রিপোর্ট দেখার জন্য তাকে দিতে হয় বাড়তি আরও ২০০ টাকা। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা আমাদের সিস্টেম। আমি ভিজিট যেহেতু কম রাখি সে কারণে রিপোর্ট দেখতে টাকা নেই। তাছাড়া সবাই তো আর রিপোর্ট দেখায় না। যাদের প্রয়োজন হয় না তারা কেন রিপোর্ট দেখাবে টাকা দিয়ে? সে টাকাটা তো রোগীরই সাশ্রয়। রোগীদের সাশ্রয় দেখিয়ে অভিনব কৌশলে টাকা আদায়েই এসব ডাক্তারের মানসিকতা পরিষ্কার ফুটে ওঠে। রাজধানীর অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই এভাবে ভিজিটের পাশাপাশি রিপোর্ট দেখার জন্য অতিরিক্ত অর্থ কামাচ্ছেন রোগীদের কাছ থেকে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভিজিট নিচ্ছেন ৪ জন চিকিৎসক । যাদের ২জন ভারতীয় এবং ২ জন বাংলাদেশের। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রীরোগ প্রসূতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রাশিদা বেগম প্রথমবার ভিজিট নেন ১০০০ টাকা এবং দ্বিতীয়বার নেন ৩০০ টাকা। অ্যাপোলো হাসপাতালের স্নায়ুরোগ সার্জন সৈয়দ সাইয়িদ আহমেদ ভিজিট নেন ১০০০ টাকা এবং একই হাসপাতালের ভারতীয় চিফ কার্ডিওথেরাপিস্ট সার্জন আতোয়ার সন্দীপ নেন ১২০০ টাকা এবং বিশেষজ্ঞ সার্জন মেথেউ চন্ডী নেন ১০০০ টাকা। জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা না থাকায় চিকিৎসকরা যে যার মতো করে রোগীদের কাছ থেকে ভিজিট আদায় কছেন। এরশাদ সরকারের আমলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ৪০ এবং বিশেষজ্ঞ নন এমনদের ক্ষেত্রে ২০ টাকা ভিজিট নির্ধারণের আইন করলেও ডাক্তারদের আন্দোলনের মুখে তা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী কোন সরকার নতুন করে আর এ ধরনের নীতিমালা

প্রণয়ন করেনি। এ কারণেই চিকিৎসা জগতে চলছে এ ধরনের জীবনঘাতী কর্মকাণ্ড। দেশে দ্রুত প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে ওঠায় চিকিৎসা জগতের উন্নয়নই সবার প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণ তো নয়ই, বরং ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বাণিজ্যিক প্রতারণায় পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন রোগীরা। প্রাইভেট এসব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কারণে বর্তমান সরকারের আমলে ২০০২ সালের ২১ জুলাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশের বেআইনি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিলেও আজও তা কার্যকর হয়নি। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক কর্মকর্তা জানান, নির্দেশ পাওয়ার পর তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হলেও তা বাস্তবায়ন খুবই দুরূহ। কারণ, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম তাদের হাতে নেই এবং তা সংগ্রহ করতে অনেক সময় ও বেশকিছু নীতিমালা প্রণয়নের দরকার। এমনকি রেজিস্টার খাতায়ও চিকিৎসকদের নাম সংরক্ষণ করা হয় না। উল্লেখ্য, ২০০৩ এর জুন পর্যন্ত এক হিসাবে দেশে অনুমোদিত ক্লিনিক ছিল ৭৬৪টি। বর্তমানে রয়েছে ৮১২টি। এর মধ্যে ঢাকায় রয়েছে ৩৭৭টি। ডায়াগনস্টিক সেন্টার ছিল ৯৮২ টি। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১২২০টি। এর ঢাকায়ই রয়েছে ৭৩৭টি। এই পরিসংখ্যানই বলে দেয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তার কত দ্রুতহারে ঘটছে। অনুমোদিত এসব সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসা সেবার নামে চলছে চরম প্রতারণা আর বাণিজ্যের মহোৎসব। এছাড়া অনুমোদনহীন এমন কতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার হিসাব নেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরে।

খুলনা মহানগরীর স্বাস্থ্যসেবার হালচিত্র

প্রতিবেদন
খুলনা মহানগরীর স্বাস্থ্যসেবার হালচিত্র

প্রতিবেদক
এইচ এম আলাউদ্দিন

প্রকাশের তারিখ
২২ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬

সংবাদপত্র
দৈনিক পূর্বাচল

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক পূর্বাচল
সিনিয়র রিপোর্টার, খুলনা

সরকারী হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে শুরু হয় 'বাণিজ্য'

কর্মস্থলে এসেই যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি তাড়া দেয়, সেটি হচ্ছে নিজস্ব ব্যবসা। আর এ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট ক্লিনিক অথবা কোন ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিকে ভিজিট দেয়া। তাই রোগী যতই থাকুক দ্রুততার সাথে দেখে তাকে বিদায় দিয়ে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে সাক্ষাৎ ও পরে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে রোগী দেখা চাই। অনেক সময় সরকারী হাসপাতালকে রাখা হয় রোগী ধরার স্থান হিসেবে। সরকারী হাসপাতালে রোগী গেলে বলা হয়, বিকেলে চেম্বারে আসুন। ডাক্তারের নির্দেশ, তাই রোগীকে যেভাবেই হোক পয়সা জোগাড় করে যেতে হবে সেখানে। এর পরই শুরু হয় চিকিৎসা বাণিজ্য। প্রথমে ৩'শ টাকা ভিজিট, তারপর বিভিন্ন রকম পরীক্ষা।

এভাবেই চলছে খুলনা মহানগরীর চিকিৎসা সেবার কলা-কৌশল। আর প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে জনসাধারণ। নিজস্ব প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার থাকায় সরকারী হাসপাতালের অনেক ডাক্তারই যথা সময়ে অফিসে আসা-যাওয়া করেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছেন, ডাক্তারদের নিয়ন্ত্রণ কর্তা নাকি, লোকাল কর্তৃপক্ষ নন। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তবে কারা তাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, সেটিই এখন প্রশ্নের বিষয়। সরকারী হাসপাতালে ডিউটির ফাঁকে ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক এবং দ্রুত গতিতে রোগী দেখেই অনেক ডাক্তারকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে দেখা যায় কখনও। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও খুলনা জেনারেল হাসপাতালের অনেক ডাক্তারকে প্রতিনিয়তই দেখা যায় বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে হাসপাতাল ত্যাগ করতে। আর আসার নিয়ম ৯টায় থাকলেও অনেকে আসেন শুধুমাত্র স্বাক্ষর করার জন্য। এভাবে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিকের মালিক-ডাক্তারকে দেখা যায় ইচ্ছামাফিক হাসপাতালে ডিউটি করতে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলেও কোন প্রতিকার নেই। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলছে, খুলনার সরকারী হাসপাতাল থেকে কোন চিকিৎসককে অন্যত্র বদলী করা হলেও ক্লিনিক বা প্যাথলজীর মালিক হওয়া বা সেখানে প্র্যাকটিস করার কারণে ঐ বদলী আদেশ প্রত্যাহার করানো হয় বিভিন্নভাবে তদবির করে। যারা তদবির করে বদলী আদেশ প্রত্যাহার করাতে না পারেন তারা সপ্তাহে ২/১ দিন কর্মস্থলে গিয়ে হাজিরা দিয়েই চলে আসেন খুলনায়। এ রকম একজনের নাম ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি। বিগত সরকার আমলে তার বদলী হয় দিনাজপুরে। কিন্তু তিনি খুলনার একটি বৃহৎ প্রাইভেট ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করছেন এখনও। আবার খুলনা মেডিকেল কলেজের এনেসথেসিয়া বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ডাঃ আ ন ম ফজলুল হকের পোস্টিং থাকলেও তিনি প্রায়ই থাকেন ময়মনসিংহে। মাসে ৫ থেকে ৬ দিন তিনি খুমেকে ক্লাশ নেন বলেও কলেজের সূত্র থেকে জানা যায়। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে কর্মরত থেকে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল করছেন অনেকে। অন্যান্য সময় রাজনৈতিক চাপ থাকলেও বর্তমানে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার উত্তম সময় বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন। তারা বলছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইচ্ছা করলে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। ক্লিনিকের পাশাপাশি নির্দিষ্ট প্যাথলজী বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা না করালে ডাক্তারের মনঃপুত হয়না এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে অনেক। নির্দিষ্ট ডায়াগনষ্টিক

সেন্টার থেকে পরীক্ষা না করানোর কারণে খুলনায় প্রেসক্রিপশন ছুঁড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে অনেক। ব্যবসার বিষয়টি এখানেও বিদ্যমান। কেননা প্রতিটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজির সাথে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের রয়েছে অঘোষিত চুক্তি। যে চুক্তির আলোকে রোগী পাঠানোর পর নির্দিষ্ট অংশের অর্থ চলে যায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের নিকট। আর এ বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। খুমেক হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া জনৈক রোগীর ভিজিটর এ প্রতিবেদককে অকপটে বলে ফেললেন ডাক্তারের দেয়া নির্দেশ মতই আমরা সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করে এসেছি, কেননা ডাক্তারদের সাথে প্যাথলজীর যে চুক্তি রয়েছে তা আমাদের জানা আছে। অনেক সময় ডাক্তাররা রোগীর পরীক্ষার জন্য দু'টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম বলে দেন বলেও জানা যায়। অর্থাৎ ঐ দু'টির সাথেই রয়েছে তার চুক্তি। সুতরাং দু'টির যেখান থেকেই পরীক্ষা করানো হোক না কেন তাতে তার অংশ ঠিক থাকবে। আবার রোগীর মনেও সন্দেহ থাকল না।

মেডিকেল প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ডাক্তারদের আর একটি ব্যবসায়িক সাইড। অনেক সময় দেখা যায়, হাসপাতালের বেডে রোগী কাতরাচ্ছেন, নার্স ডেকেও পাওয়া যায় না আর তখন ডাক্তার তার কক্ষে বসে, আলাপ করছেন এম আরদের সাথে। এটি যেমন দেখা যায়, হাসপাতালের ওয়ার্ডে তেমনি বহির্বিভাগেও দেখা যায় এম আরদের ভিড়। তবে বেশ কিছুদিন আগে খুমেক ও জেনারেল হাসপাতালে এম আর প্রবেশের একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হলেও এখন তারা ধরন পাল্টে দিয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের আগে ব্যাগ/ব্রিফকেসবিহীন প্রবেশ করে ঠিকই অনধিকার চর্চা করছেন অনেকে। কিন্তু তাদের বেলায় কিছুই বলার নেই। এম আরদের সাথে ডাক্তারদের সম্পর্ক রাখার আর একটি অন্যতম কারণ হিসেবে একটি সূত্র বলছে, প্রতি বছর ওষুধ কোম্পানী থেকে তাদেরকে যে উপহার সামগ্রী দেয়া হয় সেটি বজায় রাখাই এর মূল লক্ষ্য। যদিও কয়েকজন চিকিৎসকের সাথে এ প্রতিবেদকের আলাপ হলে তারা বলেন, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রডাক্ট তৈরী হচ্ছে বলেই সেগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্যই এম আরদের ভিজিট দিতে হয়।

ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা শতাধিক রেজিস্ট্রেশন মাত্র ২০টির, রোগীরা হচ্ছে প্রতারিত

পনের লক্ষ অধিবাসীর খুলনা মহানগরীতে গড়ে উঠেছে শতাধিক ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজী। সরকারীভাবে কোন হিসাব না থাকলেও মালিক সমিতি নামে খ্যাত বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, খুলনা শাখার হিসাব মতে এর মধ্যে রেজিস্ট্রার্ড প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ২০টির মত। বাকীগুলোর নেই কোন রেজিস্ট্রেশন। অনেকে মানছে না সরকারী নিয়মনীতি। তারপরেও চলছে দেদারছে। বাইরের চাকচিক্য আর সাজগোজ দেখিয়ে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে ক্লিনিকগুলো রোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের অর্থ। রেজিস্ট্রেশনবিহীন এসব ক্লিনিকের বিরুদ্ধে অনেক সময় অভিযোগ উঠলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। আবার রেজিস্ট্রেশন না থাকায় সরকারও হারাচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে খুলনা মহানগরীর শতাধিক ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজীর অধিকাংশেরই কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। সরকারী তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যে নিয়মনীতির প্রয়োজন তার শতকরা ৯০ ভাগই পালন করা হয় না এসব ক্লিনিকে। ফলে তারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনও করতে পারে না। এ ধরনের কয়েকটি ক্লিনিকের নাম উল্লেখ করে খুলনার পরিচালক (স্বাস্থ্য) দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বললেন, তারা কোন কাগজপত্রই এখন পর্যন্ত জমা দেয়নি। এছাড়া অনেক ক্লিনিক নামে থাকলেও স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তরে তাদের প্রতিষ্ঠানের কোন কাগজপত্র জমা দেয়া হয়নি। ৩৪ নম্বর লোয়ার যশোর রোড এবং ৫৯/১ নম্বর শামসুর রহমান রোডের ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিকের কথা উল্লেখ করা হলে ঐ কর্মকর্তা বলেন, এ ধরনের কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা ক্লিনিক সেখানে আছে কি না তা জানি না। আবার ১০৪/১ নম্বর খানজাহান আলী রোডের ক্লিনিক সম্পর্কে ঐ কর্মকর্তা বলেন, সেখানের কিছুই ঠিক নেই, ভারত থেকে সার্টিফিকেট কিনে এনে ঐ নাম সর্বস্ব ক্লিনিকটি জনগণকে ধোকা দিচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ক্লিনিকের ৭৩২৩৪৬ নম্বর টেলিফোনে ফোন করা হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বলে জানানো হয়। অবশ্য ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের পর পরিচালক (স্বাস্থ্য) প্রতিনিধি দলের সেগুলো পরিদর্শন করে ঢাকাস্থ মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য)-এর দপ্তরে রিপোর্ট পেশ করার নিয়ম থাকলেও তা যথা সময়ে করা হয় না বলেও ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ গাজী মিজানুর রহমান বলেন, এজন্য স্বাস্থ্য বিভাগই দায়ী। তবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, তাদের লোকবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রটি বলছে, খুলনার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ল্যাব ও কনসালটেশন সেন্টার, সন্ধানী ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, নার্গিস মেমোরিয়াল ক্লিনিক, গরীব নেওয়াজ ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিকসহ হাতে গোনা কয়েকটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারই কেবল নিয়মিত রেজিঃ নবায়ন করে। অন্যান্য রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুলনা সার্জিক্যাল এন্ড মেডিকেল হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ,

কিওর হোম জেনারেল হাসপাতাল, বাদশা মিয়া মেমোরিয়াল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, খালিশপুর ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স, শাপলা ক্লিনিক, জেএমটিএফ সেবা ক্লিনিক, মনিষা নার্সিং হোম, কিভার ক্লিনিক, খুলনা মাতৃমঙ্গল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পদ্মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ডাঃ মিজানস চিলড্রেন হসপিটাল, মহানগর ডায়াগনষ্টিক এন্ড ইমেজিং সেন্টার এবং সিটি নার্সিং হোম রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়।

সূত্রটি বলছে, নগরীর মজিদ সরণি ও কেডিএ এভিনিউস্থ দু'টি নামকরা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন থাকলেও বিগত কয়েক বছর ধরে তার কোন নবায়ন হচ্ছে না।

ক্লিনিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের একটি সূত্র জানায়, নগরীর মধ্যে ক্লিনিক বা প্যাথলজী স্থাপন করতে হলেই তাদের এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হতে হবে। তা না হলে সিটি কর্পোরেশন ট্রেড লাইসেন্স দেয় না। আবার ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া রেজিস্ট্রেশনের জন্যও আবেদন করা যায় না বলেই আগে ক্লিনিক স্থাপনের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। কিন্তু একবার ক্লিনিক স্থাপনের পর দেখা যায় বছরের পর বছর রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। এছাড়া নগরীতে শতাধিক ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টার থাকলেও ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তালিকায় রয়েছে মাত্র ৮৫টি। এর মধ্যে কিছু রয়েছে ফাউন্ডেশন ভিত্তিক অথবা বিভিন্ন এনজিও'র ব্যবস্থাপনায়। বাকীগুলোর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স আছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে।

এদিকে ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সূত্রগুলো নিজেদের স্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করে বলছে, অনেক সময় রেজিঃ এর জন্য আবেদন করা হলেও তা দীর্ঘসূত্রিতায় আবদ্ধ হয়। যে কারণে ক্লিনিকগুলোর রেজিঃ হয় না বছরের পর বছর। ফলে অনায়াসেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলছে এগুলো। আর সরকার রাজস্ব হারাবার পাশাপাশি প্রতারিত হচ্ছে জনগণ।

সরকারী হাসপাতালের অনেক চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার

রোগীর সেবা নয়, ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়েই অধিকাংশ চিকিৎসক এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে। তাই খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালের কোন কোন চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে প্রাইভেট ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজী। আর এসব ক্লিনিকের অধিকাংশেই রোগীরা গিয়ে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে, হারাচ্ছে সর্বস্ব। কিন্তু অসহায় রোগীদের কিছুই করার নেই, সরকারী হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের নির্দেশ, নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক থেকেই তাকে পরীক্ষা করাতে হবে। এটি হচ্ছে মহানগরী খুলনার স্বাস্থ্য সেবার একটি বাস্তব চিত্র।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মহানগরীতে বর্তমানে শতাধিক প্রাইভেট ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কোন না কোন ডাক্তার। যারা আবার কোন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। এছাড়া সরকারি হাসপাতালের অনেক ডাক্তার রয়েছেন যারা বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করে থাকেন।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ ধরনের ডাক্তারদের মধ্যে রয়েছেন, জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিওলজী) সহ কয়েকজন। এছাড়া এ হাসপাতালের যাদের নিজস্ব ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে তাদের মধ্যে সিনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) পদের বিপরীতে কর্মরত জুনিয়র কনসালটেন্ট (চলতি দায়িত্ব), সিনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) পদের বিপরীতে কর্মরত অপর একজন জুনিয়র কনসালটেন্ট (চলতি দায়িত্ব), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চলতি দায়িত্ব) (গাইনি), প্রেষণে কর্মরত জুনিয়র কনসালটেন্ট (চলতি দায়িত্ব), এ্যানেসথেসিওলজী, জুনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি (সংযুক্ত) এবং প্যাথলজিস্ট হিসেবে কর্মরত একজন ডাক্তারের।

আবার খুলনা মেডিকেল কলেজের যেসব শিক্ষকের নিজস্ব ক্লিনিক রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন, সার্জারী বিভাগের একজন অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) এবং একজন সহকারী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব)। এগুলো যথাক্রমে নগরীর খানজাহান আলী রোড, কেডিএ এ্যাপ্রোচ রোড এবং সাতক্ষীরার কলারোয়ায় অবস্থিত। তবে চলতি দায়িত্বে কর্মরত একজন সহকারী অধ্যাপকের নিজস্ব ক্লিনিক না থাকলেও তিনি নগরীর বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করেন বলে জানা যায়। গাইনি বিভাগেও দু'জন সহযোগী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) নিজস্ব ক্লিনিক রয়েছে যথাক্রমে সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকা এবং আহসান আহমেদ রোডে। অর্থ-সার্জারী বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) নিজস্ব ক্লিনিক রয়েছে নগরীর খান-এ-সবুর রোডে এবং একজন সহকারী অধ্যাপক চেম্বার কাম ক্লিনিকে রোগী দেখছেন শান্তিধাম মোড় এলাকায়। রেডিওথেরাপী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকেরও নিজস্ব হাসপাতাল রয়েছে খান-এ-সবুর রোডে। সাইকিয়াট্রি বিভাগের তিনজন সহকারী অধ্যাপকেরই (চলতি দায়িত্ব) রয়েছে নিজস্ব ক্লিনিক ও প্যাথলজি। প্যাথলজি বিভাগের সদ্য পদোন্নতি পাওয়া একজন অধ্যাপকের সাউথ সেন্ট্রাল রোডে যেমন প্যাথলজি রয়েছে তেমনি একজন সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) ও একজন সহকারী অধ্যাপকের

(চলতি দায়িত্ব) যৌথ মালিকানায় রয়েছে শামসুর রহমান রোডে একটি প্যাথলজি। এ বিভাগের অপর একজন সহকারী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) রয়েছে একটি রিসার্চ সেন্টার। মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) শামসুর রহমান রোডে এবং সহকারী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) হাজী মহসীন রোডে রয়েছে একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। এ ছাড়া কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডে রয়েছে ক্লিনিক।

এদিকে খুলনা জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তারদের মধ্যে গাইনি বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট-এর ফারাজী পাড়ায় চেম্বার, আরএমও'র শের-এ-বাংলা রোডের ক্লিনিক ও অ্যানেসথেটিক্স-এর নিরালায় ক্লিনিক রয়েছে। অবশ্য ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক হিসেবে কাগজপত্রে উল্লিখিত অনেকেরই নাম নেই। কারও স্ত্রী বা কারও স্বামী অথবা অন্য কোন নামে করা হয়েছে এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। জবাবদিহিতার আওতায় না আসার জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসকদের নিজস্ব ক্লিনিক না থাকলেও কোন কোনটির সাথে রয়েছে অংশীদারত্ব। তবে সকল ডাক্তারেরই রয়েছে নিজস্ব চেম্বার। কোন কোন চেম্বারে গিয়ে রোগীরা প্রতারিত হলেও হাতে গোনা কয়েকজনই কেবল মানবিক বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে রোগী দেখেন বলে জানা যায়।

অপরদিকে সরকারী হাসপাতালে কর্মরত থাকার সুবাদে সেখান থেকে রোগী ভাগিয়ে নিজস্ব ক্লিনিকে নেয়া খুবই সহজ বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। অনেক সময় এজন্য নিয়োগ করা থাকে দালাল। এ কাজে ব্যবহৃত হয় সরকারী হাসপাতালের কর্মচারীরাও। বিনিময়ে তারাও পেয়ে থাকে অর্থ বা ভাগা। আর সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বাড়ী ফিরে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রোগীরা। যেসব গরীব ও অসহায় রোগীর ব্যয়বহুল ক্লিনিকে যাবার সামর্থ নেই তাদেরকে সরকারী হাসাপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মচারীদের অবহেলার পাত্র হয়েই চিকিৎসা নিতে হয়। যেমনটি দেখা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর খুমেক হাসাপাতালে ভর্তি হওয়া এক রোগীর বেলায়। নগরীর টিবি ক্রস রোডের ঐ রোগীর স্বামী একজন রিক্সা চালক আর ছেলে কাঠমিস্ত্রী। গলায় ব্যথার কারণে তাকে নেয়া হয় পাশ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে। সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষা ও চিকিৎসায় যখন দশ সহস্রাধিক টাকা খরচ হয়ে গেছে তখনই তাকে রেফার্ড করা হয় খুমেক হাসপাতালে। সেখানের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করে যখন চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল তখন তাদের হাত ছিল অর্থশূন্য। এ ধরনের নানা চিত্র দেখা গেছে নগরীর হাসপাতালগুলো ঘুরে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাক্ষর করেই প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চলে যান অনেক কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ নিরব ভূমিকায়

সকাল থেকে যখন সরকারি হাসপাতালে ডিউটি করার কথা তখন কর্মস্থলের পরিবর্তে ডাক্তারদের দেখা যায় বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে। কেউ ডিউটি খাতায় স্বাক্ষর করেই চা খাবার কথা বলে চলে যান বাইরের ক্লিনিকে। কারও আবার চা খাওয়া বা অন্য কোন অজুহাতের কথা বলারও প্রয়োজন হয় না, তাদের বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। কাউকে দেখা যায় মটর সাইকেলযোগে নগরীর এক ক্লিনিক থেকে অন্য ক্লিনিকে যাতায়াত করতে। নিন্দুকেরা তাই বলে থাকেন 'ওয়ান ইজ টু থ্রি বা ফোর'। এগুলো দেখার দায়িত্ব যাদের তারা একদিকে যেমন দেখেনই না, অপরদিকে সরকারি হাসপাতালের রি- এজেন্ট নিয়ে ক্লিনিকে ব্যবহার করা হলেও নেয়া হয় না কোন ব্যবস্থা। এ অবস্থা চলছে খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভাগের একমাত্র মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতাল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছেন ভিন্ন ক'জন ল্যাব টেকনিশিয়ান। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে কলেজ ও হাসপাতালে নিয়মিত ডিউটি করা । কিন্তু হাসপাতালের টেকনিশিয়ান সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে চলে যাবেন সামনের একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে। হাসপাতালের ডিউটি খাতায় স্বাক্ষর করেই যে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে চলে যান সে বিষয়টি অনেকের কাছে ওপেন সিক্রেট হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়াক জানেন না সেটি । তিনি কখনও ঐ টেকনিশিয়ানের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলা হয় চা খেতে গেছেন। পরে মোবাইলে খবর দিয়ে আনা হয় দ্রুত। এ ব্যাপারে হাসপাতালের একজন কর্মচারী এ প্রতিবেদককে বলেন, এখন মোবাইলের যুগ, কোন সমস্যা হয় না, আর আমরাইতো আমাদের দালাল। আমাদের মত কর্মচারীদের দালাল ফিট করে রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞেস করতেই ঝটপট উত্তর দেয়া হয়। সহজ কথা সামনে চা খেতে গেছেন।

খুমেক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হামে জামাল বলেন, ডিউটি শেষে কোথাও চাকরী করলে তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে কর্মকালীন সময়ে বাইরের ক্লিনিকে কাজ করার বিষয়টি তার নলেজের বাইরে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাইরের ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে কাজ করার কারণে সরকারি হাসপাতালে কোন রোগী পরীক্ষা করাতে গেলে ঐ টেকনিশয়ান বিরক্তবোধ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ করে জনৈক কর্মচারী বলেন, এক বয়স্ক লোক পরীক্ষার জন্য আসা মাত্রই ক্ষিপ্ত হয়ে বলা হয় 'যাও এখানে আসছ কেন, অন্য জায়গা চোখে দেখো না'।

অপর একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান খুলনা মেডিকেল কলেজের। তার সম্পর্কে অনেকের বক্তব্য খুলনার এই মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত মটরসাইকেলে ঘুরে বেড়ান তিনি। তার কর্মস্থল খুলনা মেডিকেল কলেজ হলেও তাকে দেখা যায় সোনাডাঙ্গা আল-ফারুক সোসাইটি পার্শ্ববর্তী একটি নতুন ক্লিনিক, দৌলতপুরস্থ একটি ক্লিনিক ও সেনাডাঙ্গা নিউ মার্কেট সংলগ্ন একটি হেলথ কেয়ার সেন্টারে। নগরীর হাজী মহসীন রোডে তার রয়েছে একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার। কলেজের অন্য একজন মেডিকেল টেকনিশিয়ান অপর একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক বলেও জানা যায়। এছাড়া

এ দু'জনেরই যৌথ মালিকানায় নগরীর দৌলতপুরে রয়েছে অপর একটি প্যাথলজী। উভয়ে সেখানে বেলা ১১ টার দিকে চলে যান বলেও অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল ও কলেজের অপর একটি সূত্র জানায়, সরকারি প্রতিষ্ঠানের রি-এজেন্টসহ বিভিন্ন মালামাল চলে যায় প্রাইভেট ক্লিনিকে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যেহেতু ঐসব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মালিক বা চাকুরীজীবী সেহেতু তাদের পক্ষে সরকারি হাসপাতালের এসব মালামাল নেয়া খুবই সহজ। এভাবে একদিকে যেমন সরকারি হাসপাতালের রোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে, অপরদিকে তা ভোগ করছে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের রোগীরা। তাও আবার টাকার বিনিময়ে। এতে লাভবান হচ্ছে প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকপক্ষ আর সরকারি হাসপাতালের এসব কর্মচারিরা। ভুক্তভোগী মহল ও সাধারণ জনগণের প্রশ্ন-এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

চাকরী সরকারি হাসপাতালে, কিন্তু মালিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের, অতঃপর দাম্ভিকতা

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' তাই যেতে হবে বিশ্বাসে। এ 'বিশ্বাস' ভিনদেশী সেই জগলুল পাগলের বহু পুরাতন প্রবাদ বাক্যের বিশ্বাস নয়, এটি হচ্ছে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম। খুলনা মেডিকেল কলেজের ঠিক উল্টো দিকেই এর অবস্থান। একজন সরকারী চাকুরীজীবীর প্রতিষ্ঠান এটি। কর্মস্থল জেলার তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। সেখানে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি) তিনি। কিন্তু অফিস করার দরকার হয় না। কেননা, তিনি যে পদের লোক সে পদের মেশিন অর্থাৎ এক্স-রে মেশিন থাকলেও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নেই শুরু থেকেই। তাইতো তৎকালীন সিভিল সার্জনকে ম্যানেজ করে প্রেষণ পরিবর্তন করে তিনি পুনরায় পোস্টিং নেন সেখানে। আর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মটর সাইকেলটিও ব্যবহার করেন তিনি। এভাবেই সরকারী বেতন নিয়ে তিনি হয়েছেন বিত্ত-বৈভবের মালিক। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর রয়েছে বেশ কিছু লোক। যারা 'দালাল' নামে পরিচিত। রোগী ভাগিয়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আনা তাদের কাজ। বিনিময়ে 'দালাল' নামের ঐসব লোকেরা পেয়ে থাকে একটি ভাগা। এ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অপরিপক্ক লোকেরা এমবিবিএস ডাক্তারের নামে পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ের একটি কলেজ ও হাসপাতালের সামনে এ ধরনের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না অজ্ঞাত হাতের ইশারায়। অনেক সময় হাসপাতালের রোগীদের ডাক্তাররা বলেও দেন সামনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করাবেন না। কিন্তু তারা এগুলো বন্ধে কার্যত কোন ব্যবস্থা নেন না।

হিরো হোন্ডা নামের ঐ মটরসাইকেলটির পেছনের নম্বর প্লেটে লেখা রয়েছে 'ON TEST তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'। গত ১৩ নভেম্বর'০৬ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে সিঁড়ির নিচে দেখা যায় সেটি। কিন্তু মাত্র আধা ঘন্টা পর যখন মোবাইলে তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ নাজিমুদ্দিনের সাথে এ প্রতিবেদকের কথা হয় তখন তিনি বলেন, মটর সাইকেলটি তার কাছেই আছে। অবশ্য মাত্র আধা ঘন্টা আগের কথা বলা হলে তিনি কোন সদুত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে দেন। এতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টের দুর্নীতির সাথে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেরখাদা এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি) মিলিত হয়ে চুক্তিভিত্তিক অপারেশন করে থাকেন। গত ১৯ আগস্ট মাত্র সাতশ' টাকার বিনিময় একটি টিউমার অপারেশন করার পর দুলাল বিশ্বাস নামের এক রোগীর বাম হাতটি নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে অনেক অপারেশনের ফলে কোন কোন রোগীর অঙ্গহানির ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উক্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি) ইতোপূর্বে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে তৎকালীন সিভিল সার্জনকে ম্যানেজ করে পুনঃ পোস্টিং নেন তেরখাদায়। সেখানে পোস্টিং নেয়ার ফলে অফিস করার দরকার হয় না। তাই নিজের ব্যবসায়িক কাজ-কর্ম পরিচালনা করা সহজ হয়। অফিস না করার বিষয়টি পুরোপুরি স্বীকার না করলেও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ নাজিমুদ্দিন বলেন, যেহেতু এক্স-রে মেশিনের যন্ত্রপাতি নেই সেহেতু প্রতিদিন অফিসে

আসার দরকার হয় না। অথচ বিগত দুই বছর আগে এক্স-রে মেশিন স্থাপন করা হলেও যন্ত্রপাতি সরবরাহে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

খুমেকের সামনে সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অভ্যন্তরে রয়েছে ফার্মেসী। যার কোন সরকারি অনুমোদন নেই বলে জানা যায়। আবার ঐ ফার্মেসীতে ইন্ডিয়ান ঔষধ বিক্রি হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। যা' ব্যবহারের ফলে কিডনি সমস্যা দেখা দিতে পারে বলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

খুলনার স্বাস্থ্য সেবার এসব চিত্র শুধু এ ডায়াগনস্টিক সেন্টারেই নয়, রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ নিজেদের কোন অনিয়ম দেখেন না। আবার কেউ কেউ কোন একটি সাইনবোর্ড ব্যবহার করে চলছেন দাপটের সাথে। যেমনটি ঘটেছে খুমেকের সামনের আলোচিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বেলায়। এ প্রতিবেদক সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক শহীদুল ইসলামের সাথে কথা বলার জন্য সেখানে গেলে দেখা মাত্রই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আমাকে দেখেন কেন, অন্য কাউকে চোখে দেখেন না?' কয়েকজন ডাক্তারের নাম উল্লেখ করে তাদের উদাহরণ দিতে তিনি নিজের অনিয়মকে ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি নিজেকে একজন 'সাংবাদিক' হিসেবে জাহির করে বলেন, আমিও তো সাংবাদিক, খুলনার একটি অখ্যাত পত্রিকার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি অমুক পত্রিকায় কাজ করি। আপনাদের পূর্বাঞ্চলে তো এর আগে আমার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নিউজ হয়েছে, আমার কিছু হয়েছে? এভাবে দাম্ভিকতার সাথেই তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য গঠিত হয়েছে বোর্ড, তবুও চলছে ব্যবসা, নেয়া হয় আড়াই থেকে ১০ হাজার টাকা

পরিচয়টি গোপন রেখেই এ প্রতিবেদকের কথা হচ্ছিল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসারের সাথে। গত ২১ নভেম্বর সোমবার তখন বেলা ২টা। কথা হচ্ছিল জনৈক রোগীর মেডিকেল সার্টিফিকেট সম্পর্কে। হঠাৎ করে ঢুকে পড়লেন দু' ব্রিফকেসওয়ালা। হাসপাতালে ব্যাগ-ব্রিফকেসওয়ালাদের বেশ কদর। তাই আর কথা নয়, কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়। তাছাড়া রয়েছে কন্ট্রাক্টের বিষয়। ডান হাতে বেল চেপেই একজন কর্মচারী ডেকে দেখিয়ে বললেন, 'ওর সাথে যান ও সব বুঝিয়ে দেবে।' কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এ প্রতিবেদকের পরিচয় জানায় সার্টিফিকেটের জন্য আর বেশীদূর যাওয়া যায়নি।

এভাবেই সার্টিফিকেটের জন্য কেউ গেলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়ে করা হয় কন্ট্রাক্ট। তারপর শুরু হয় সার্টিফিকেট 'বাণিজ্য'। কর্মচারী ছাড়াও অনেক সময় বাইরের দালালদের মাধ্যমে সার্টিফিকেট বিক্রির বিষয়টি বেশ জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু প্রচার করা হয়, টাকার মাধ্যমে নয় কমিটির মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয়ার কথা। বাইরের দালালদের মধ্যে কিছু কথিত সাংবাদিকও রয়েছে। তারা নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে একদিকে সার্টিফিকেট বের করা, অপরদিকে পত্রিকায় নিউজ করার কথা বলে হাতিয়ে নেয় মোটা অংকের অর্থ। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ জনগণ।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একটি সূত্র বলছে, মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে কমিটির প্রধান হলেন, হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও)। অপর দু' সদস্য হলেন, সিনিয়র ইমার্জেন্সী মেডিকেল অফিসার এবং ভর্তিকালীন চিকিৎসক। অনুরূপ কমিটি রয়েছে খুলনা জেনারেল হাসপাতালেও। নিয়ম অনুযায়ী কোন রোগীর মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রয়োজন হলে চাহিবা মাত্র তিন সদস্যের বোর্ড বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করার কথা। কিন্তু জনৈক ভুক্তভোগী এ প্রতিবেদককে বললেন, এখানে কোন নিয়ম-নীতির বালাই নেই। নামে বোর্ড থাকলেও বোর্ডের প্রধান কর্তাই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কর্তা। তাছাড়া হাসপাতালের কতিপয় কর্মচারী সার্টিফিকেটের জন্য চুক্তির মাধ্যমে বোর্ডের প্রধান কর্তাকে ম্যানেজ করে সার্টিফিকেট দেয়ার কথাও জনশ্রুতি রয়েছে। কতিপয় কর্মচারী সার্টিফিকেট ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি একজন ওয়ার্ড মাস্টারও এর সাথে জড়িত রয়েছেন বলে জানা যায়। শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্ড মাস্টার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা চুক্তি করে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে বোর্ডের সদস্যদের দিয়ে সার্টিফিকেট বের করে আদায়কৃত অর্থ সকলে ভাগাভাগি করে নেন। সার্টিফিকেটের ধরন অনুযায়ী আড়াই থেকে ১০ হাজার টাকা নেয়ার কথাও শোনা যায়। তবে বোর্ডের সদস্যদের কাছে গেলে তারা নিজেরা চুক্তি করে কর্মচারীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা ফ্রেস থাকার চেষ্টা করেন। ফলে কোন রোগী অর্থ গ্রহণের অভিযোগ আনলেও তা ধোপে টেকে না। আবার কর্তৃপক্ষের কাছে কেউ অভিযোগ করলে বলা হয়, বোর্ডের কাছে না গিয়ে অন্যদের কাছে গেলেন কেন? যার কোন জবাব থাকে না। খুমেক হাসপাতালে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে সার্টিফিকেট ব্যবসা চললেও কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় জনসাধারণ একদিকে যেমন অর্থ খোয়াচ্ছে, অপরদিকে মিথ্যা

সার্টিফিকেট নিয়ে কেউ কেউ মিথ্যা মামলার শিকার হচ্ছে। মেডিকেল সার্টিফিকেটের এসব অনিয়ম নিয়ে কথা হয় খুমেক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হামে জামালের সাথে। তিনি বললেন, সার্টিফিকেট ব্যবসা আগে থাকলেও এখন নেই। এখন বোর্ডের মাধ্যমেই স্বচ্ছতা রেখে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। একই কথা বললেন, হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মোঃ মঈন উদ্দিন মোল্লা। চুক্তির মাধ্যমে টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগের কথা বলা হলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, বাইরেতো কত কথাই শোনা যায়, সব কথাই কি সঠিক?

খুলনা জেনারেল হাসপাতালের সার্টিফিকেট কমিটির সূত্রটি বলছে, থানা বা কোর্ট থেকে রিকুইজিশন দেয়ার পরই কেবল সার্টিফিকেট দেয়া হয় নতুবা নয়। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক কথিত সাংবাদিক অকপটেই বললেন, জেনারেল হাসপাতালে ভাল মানুষ ভর্তি করে ব্লেড দিয়ে মাথা কেটে সার্টিফিকেট বের করে দেয়ার প্রবণতাও রয়েছে। এমনকি তিনি নিজেই ঐ ঘটনার মূল নায়ক বলেও উল্লেখ করেন ঐ কথিত সাংবাদিক।

হাসাপাতালের আরএমও ডাঃ শাহজাহান আলী ঢাকা অবস্থান করায় তার সাথে এ প্রতিবেদকের মোবাইলে কথা হয়। তিনি বলেন, থানা বা আদালতের মাধ্যম ছাড়া কোন সার্টিফিকেট দেয়া হয় না। তাছাড়া যিনি রোগী ভর্তি করেন তিনিই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। অনেক সময় বোর্ডের দরকার হয় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে ভাল মানুষ রোগী বানিয়ে মামলার সুযোগ করে দিয়ে সার্টিফিকেট দেয়ার প্রবণতার বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি কোন কথা না বলে মোবাইল কেটে দেন।

জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ভাগিয়ে আনা হয় রোগী, ব্যবহার হয় একাধিক মোটর সাইকেল

সকাল হলেই মোটর সাইকেলগুলো বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় যায় পালা করে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। আর এরই মধ্যে যোগাড় হয় অনেক রোগী। ঐ মোটর সাইকেলধারীরা জেলার উপজেলা শহরগুলো থেকে এভাবেই রোগী ধরে নিয়ে আসলেও 'ছেলে ধরার' মত তাদেরকে 'রোগী ধরা' বলে অসম্মান করা হয় না। বরং বিভাগীয় শহর থেকে যাওয়া এসব মোটর সাইকেলধারীদের কদরই থাকে আলাদা। এসব মোটর সাইকেলধারীরা নগরীর বিভিন্ন নামী দামী প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নিয়োগকৃত লোক। এদের কাজ হলো জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগী ভাগিয়ে আনা। অনেক সময় উপজেলা লেভেলের হাসপাতাল থেকে দেয়া বিভিন্ন পরীক্ষার জন্যও তাদেরকে আনা হয় নগরীর ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও প্যাথলজিগুলোতে। বিনিময়ে এসব 'রোগী ধরা' রা পেয়ে থাকেন নির্দিষ্ট অংশ। আর একটি অংশ চলে যায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের কাছে। এতে সরকারি ঐসব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর ডাক্তাররাও দিয়ে থাকেন অতিরিক্ত পরীক্ষা। ফলে শুধুমাত্র পরীক্ষা খাতেই রোগীদের ব্যয় হয় মোটা অংকের অর্থ। যা হাতিয়ে নেয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, রোগী ধরা নামের কিছু দালাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ। এছাড়া অনেক সময় কোন কোন রোগীকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে পরামর্শ দেয়া হয় খুলনার ক্লিনিকে গিয়ে ভাল চিকিৎসা নিতে। এজন্যও ঐসব ডাক্তারদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দেয়া হয় বলে জানা যায়। অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতালের কোন কোন ডাক্তার সরকারী বেতন নেয়ার পাশাপাশি করছেন চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা। এতে গুটিকতক লোক বেনিফিটেড হলেও সর্বস্বান্ত হচ্ছে গরীব ও মধ্যবিত্ত রোগীরা।

খুলনা মহানগরীর প্রাইভেট ক্লিনিক সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বললে বের হয়ে আসে এ ধরনের নানা চিত্র। ঐ সূত্র মতে, মফস্বল থেকে রোগী ভাগিয়ে শহরের চাকচিক্কময় ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে আনার জন্য কিছু মোটর সাইকেলধারীর পাশাপাশি সাধারণ লোকও রয়েছেন। যারা কমিশনের ভিত্তিতে মফঃস্বল থেকে রোগী নিয়ে আসেন শহরের ক্লিনিকগুলোতে। এভাবেই চলছে খুলনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আর একটি চিত্র। উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনেক যন্ত্রপাতিও পরিকল্পিতভাবে অকেজো করে রাখারও অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের এক্সরে মেশিন, ল্যাবরেটরী অকেজো রেখে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ রোগীরা। সূত্রটি জানায়, জেলার পাইকগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্স-রে মেশিনটি দীর্ঘদিন ধরে স্থাপন করা হচ্ছে না। তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্স-রে মেশিনটিও চালু হচ্ছে না যন্ত্রপাতির অভাবে। মেশিন চালু থাকলেও ফুলতলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ফিল্ম সংকট বিরাজ করছে। ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্স-রে মেশিন থাকলেও চলছে ঢিমেতালে। একই অবস্থা রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরও। তবে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন অব্যাহত থাকে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। আবার দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্স-রে মেশিনের যন্ত্রপাতি নেই দীর্ঘদিন ধরে। মোটর সাইকেল বা অন্য কোনভাবে উপজেলাগুলোতে গিয়ে রোগী ধরে আনার পাশপাশি

খুলনা থেকে বিভিন্ন মফস্বল শহরে গিয়ে বড় বড় চিকিৎসক সেজে প্রতারণা করছেন অনেকে। এ অভিযোগ স্বয়ং ডাক্তারদের। সম্প্রতি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে খুলনার স্যার ইকবাল রোডস্থ একটি ক্লিনিক মালিক আবুল হোসেন (৩৭) নামের জনৈক রোগীর কিডনীর পাথর অপারেশনের সময় কিডনী ফেলে দেন। ফলে ঐ রোগীটি মৃত্যুশয্যায় পতিত হন। পরে তাকে খুলনা সার্জিক্যাল অ্যান্ড মেডিকেল হাসপাতালে এনে চিকিৎসা দেয়া হয়। সার্জিক্যালের মালিক ডাঃ গাজী মিজানুর রহমান বলেন, স্যার ইকবাল রোডের উক্ত ক্লিনিক মালিক সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে গিয়ে এভাবে অবৈধ অপারেশন করায় রোগীরা প্রতারিত হচ্ছে। অথচ উক্ত ডাক্তার নিজেকে খুলনার বড় ডাক্তার বলে পরিচয় দেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণদের কারণে পাল্টে যাচ্ছে স্বাস্থ্যচিত্র, অর্থ না দিলে রেজিঃ, বদলী, পদোন্নতি হয় না।

শুধু মহানগরীই নয়, খুলনা বিভাগের ১০ জেলার স্বাস্থ্য চিত্রই পাল্টে যাচ্ছে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক দপ্তরের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর কারণে। স্বাস্থ্য সেবার পরিবর্তে অনেকে ব্যস্ত থাকেন বদলী বা অন্য কোন শাস্তিমূলক অফিস আদেশ ঠেকাতে। একদিকে যেমন অর্থ না পেয়ে পরিদর্শন না করায় বছরের পর বছর রেজিস্ট্রেশনবিহীন অবস্থায় নগরীর অধিকাংশ ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার অথবা প্যাথলজি চলছে, তেমনি জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও মাশোহারা দিয়ে চাকরী করতে হচ্ছে বছরের পর বছর। খুলনার পরিচালক (স্বাস্থ্য) দপ্তরের গুটি কয়েক কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে এসব অবৈধ কারবার চালিয়ে আসলেও তাদের ব্যাপারে নেয়া হয় না কোন ব্যবস্থা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পরিচালক (স্বাস্থ্য) দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন ঐ দপ্তরের দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের নানা ফিরিস্তি। যার সত্যতা পাওয়া যায় বিভাগের অন্যান্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়ে।

সূত্রটি জানায়, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তরের গুটিকতক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অর্থ না দিলে পদোন্নতি, পদ পরিবর্তন বা সুবিধাজনক বদলী হয় না। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশ উপেক্ষা করেও বিগত বেশ কিছুদিন ধরে চলে পদ পরিবর্তন, বদলী, পদোন্নতি প্রভৃতি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষে পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ ফজলুর রহমান স্বাক্ষরিত গত ১০ মে' ৯৪ তারিখের স্বাঃ অঃ/প্র-৩/পরিপত্র-৯৪/১০৪০৯ নম্বরের স্মারকে বলা হয়, স্থানীয় পর্যায়ের কোন কোন কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সহকারীদের (মাঠকর্মী) বিভিন্ন সময়ে অফিস কর্মচারীর (ক্যাশিয়ার, নিম্নমান সহকারী, স্টোর কিপার প্রভৃতি) শূন্য পদে নিজ বেতনে অথবা সরাসরি বদলী/বহাল করে থাকেন। এ ধরনের বদলী/বহাল প্রচলিত সরকারী নিয়ম/বিধি পরিপন্থী। কিন্তু এ আদেশ অমান্য করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বদলী বা পদোন্নতি বাণিজ্য।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য সহকারী থেকে অফিস সহকারী, অফিস সহকারী থেকে প্রধান সহকারী, স্বাস্থ্য সহকারী থেকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার অথবা হেলথ এডুকেটর, ওয়ার্ড বয় থেকে অফিস সহকারী, সুইপার/এমএলএসএস থেকে স্বাস্থ্য সহকারী/ অফিস সহকারী পদে পদোন্নতির রেওয়াজ চলছে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে। স্বাস্থ্য পরিচালক দপ্তরের ২/১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রায় দু'যুগ ধরে কর্মরত থেকে এ অবৈধ পদোন্নতি বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। ঐসব কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বাস্থ্য পরিচালককে পকেটস্থ করে এসব বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ায় জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সর্বদাই তটস্থ থাকে। এক কথায় বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে খুশি রাখতে না পারলে অনেককেই হয়রানির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া জেলাসমূহের হাসপাতালের ডাক্তারদের বদলীর ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকেও মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। বদলীর পর অর্থের বিনিময়ে যে টেবিলে বদলী আদেশ সে টেবিলেই প্রত্যাহারের ঘটনাও ইতোপূর্বে ঘটেছে খুলনার স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তরে। এছাড়া একই তারিখে বদলী আদেশ আর তা বাতিলের ঘটনাও ঘটছে অহরহ। যার প্রমাণ মিলবে পদোন্নতি বা বদলীর পত্র জারির ইস্যু রেজিস্ট্রার এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল দেখলে।

স্বাস্থ্য বিভাগের এহেন দুর্নীতি চালানোর জন্য পরিচালক (স্বাস্থ্য)-এর দু'জন কাছের লোক প্রায় দু'যুগ ধরে এখানে কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে একজন বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের লোক বলেই খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অফিসার কোয়ার্টারে থাকছেন সপরিবারে। অর্থাৎ যেখানে শুধুমাত্র হাসপাতালের কর্মকর্তাদের থাকার কথা সেখানে স্বাস্থ্য পরিচালকের বসবাসের ঘটনা অনেকের মধ্যেই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। এ ব্যাপারে খুমেক হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হামে জামালের সাথে কথা বলতে চাইলে তাকে পাওয়া যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী গতকালও সেখানে বসবাসের কথা স্বীকার করেছেন।

পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডাঃ মোঃ ফজলুল করিমের সাথে কথা বলতে চাইলেও তাকে পাওয়া যায়নি। গতকাল মঙ্গলবার অফিসে গিয়ে শোনা যায় তিনি কুষ্টিয়া গেছেন।

এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের বিগত দিনের অবৈধ কর্মকান্ডগুলো আইনসিদ্ধ করার জন্য বিভাগের ১০ জেলার পদোন্নতি ও বদলীপ্রাপ্তদের আবেদনপত্রগুলো নির্বাচনী বোর্ড বসানো হচ্ছে বলে একটি সূত্র জানায়। অর্থাৎ এসব অনিয়মকে বৈধতা দিয়ে পার পাওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

এছাড়া বছরের পর বছর নগরীর ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজীর রেজিস্ট্রেশন না হওয়ার পেছনে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের যেমন দুর্বলতা রয়েছে তেমনি স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তরের পরিদর্শন করে রিপোর্ট না দেয়াও অন্যতম কারণ। স্থানীয় প্রশাসনের খামখেয়ালীপনার কারণে অনেকে ঢাকায় গিয়ে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এসেছেন এ ধরনের ঘটনাও ঘটছে নগরীতে। নগরীর ৩৪ নম্বর খান-এ-সবুর রোডের একটি ক্লিনিক মালিক এ প্রতিবেদককে জানান, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তরের অসহযোগিতার কারণে ঢাকা থেকে তার ক্লিনিকের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। অথচ খুলনার পরিচালক (স্বাস্থ্য) দপ্তর থেকে পরিদর্শনের পর রিপোর্ট পাঠানোর পরই রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কথা।

বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সওকত আলী লস্কর বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের অর্থ না দেয়ার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। তিনি বলেন, খুলনায় ব্যাঙের ছাতার মত ক্লিনিক গজিয়ে ওঠার পেছনে স্বাস্থ্য বিভাগই দায়ী। কেননা বছরের পর বছর আবেদনপত্র পড়ে থাকলেও তা পরিদর্শন করে রিপোর্ট না দেয়ার কারণে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। ফলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার পরও অনেক প্রতিষ্ঠান চলছে। অথচ পরিদর্শনের পর বাতিলযোগ্য হলে বাতিল এবং রেজিস্ট্রেশনযোগ্য হলে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হলে অবৈধ ক্লিনিক স্থাপনের প্রবণতা বন্ধ হত।

বিএম এন্ড ডিসির অনুমোদনহীন ডিগ্রীর ছড়াছড়ি বিশেষজ্ঞ সেজে ভিজিট নেয়া হচ্ছে ৩শ' টাকা

নামের পাশে জুড়ে দেয়া হয় বড় বড় ডিগ্রী। তিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। নেয়া হয় ৩শ' টাকা ভিজিট। সাধারণ মানুষের ডাক্তারী ডিগ্রী সম্পর্কে বোঝার কথা নয়। তাই তারা অনেকের নামের পাশে বড় বড় ডিগ্রী দেখে মনে করেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছেই এসেছি। অথচ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বলছেন, যেসব বিদেশী ডিগ্রী ডাক্তারদের নামের পাশে ব্যবহার করা হয় সেগুলোর অধিকাংশই একাডেমিক ডিগ্রী নয়। কোন এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বা ডিপ্লোমা কোর্সের বিষয়টিও অনেকে বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী বলে চালিয়ে দেন। ফলে প্রতারণামূলক এসব ডিগ্রী ব্যবহার করে তিনশ' টাকা ভিজিট নেয়া হলেও ডাক্তারদের বৃহত্তম একটি সংগঠন বলছে, এসব ভুয়া ডিগ্রীধারীদের ১শ' টাকার বেশী ভিজিট নেয়ার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ চিকিৎসা ও দন্ত চিকিৎসা পরিষদের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত একপত্রে দেখা যায়, ডক্টর অব মেডিসিন/এমডি (প্রাক্তন USSR) এবং পিএইচডি ডিগ্রী চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতির জন্য বিবেচিত হয় এবং বিএম এন্ড ডিসি হতে স্বীকৃতি লাভের পরই কেউ ঐ ডিগ্রীসমূহ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু খুলনা মহানগরীতে দেখা যায়, কিছু কিছু চিকিৎসক নামের সাথে ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন প্রকার ডিগ্রী। এর মধ্যে রয়েছে এমবিবিএস (এএম), এলএমএএফপি (পল্লী চিকিৎসক), ডক্টর অব মেডিসিন (রাশিয়া), এফপিসিএস (সার্জারি), পিজিসিএস (প্লাস্টিক সার্জারী), এসটিসি (এন্ডোসকপি), পিএইচডি (সার্জারী), ডক্টর অব মেডিসিন (অনার্স) রাশিয়া, এমডি (মস্কো), পিজিএসি, পিএইচডি (কার্ডিওলজি), এসিপি (মস্কো), এফপিজিএস (পেডিয়াট্রিকস), এফপিজিএস (গ্রাস্ট্রো এন্টারোলজি), এফপিজিসিও (মস্কো), ডিপ্ অ্যাজমা (ইংল্যান্ড), সিপিসি (এডিন), এফডব্লিউএইচও (কলোম্বো), এফআরএসএইচ (লন্ডন), এমআরএসপিএইচ (ইউকে), এফআইওএল, এফএসআইসিএস (মাদ্রাজ), এফসিজিপি (ঢাকা), এমএএমএস (ভিয়েনা), এফসিপিএস (শেষপর্ব), এমডি (শিশু কিডনি থিসিস পর্ব), এফসিপিএস (প্রথম পর্ব), এমবিবিএস ডিগ্রীর সঙ্গে ডিআইহোম (লন্ডন) ও এমডি (এইচ), বিইউএমএস (ডিইউ), বিএইচএস (আপার), সিডিডি (পিজি হাসপাতাল) ও বিবিএস।

নগরীর মজিদ স্বরণির একটি বৃহৎ প্রাইভেট ক্লিনিকের মালিক কাম ডাক্তার সার্জারী বিষয়ে পড়াশুনা না করেই বিশেষজ্ঞের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে যেভাবে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছেন তাকে উদ্বেগজনক বলেও উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ। তার সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে, ডক্টর অব মেডিসিন (রাশিয়া), এফপিসিএস (সার্জারি), পিজিসিএস (প্লাস্টিক সার্জারী) ও এসটিসি (এন্ডোসকপি)।

নগরীর শামসুর রহমান রোডের একজন চিকিৎসক নিজেকে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন হিসেবে দাবি করে সাইনবোর্ডে লিখেছেন এমবিবিএস (রাজ), বিসিএস (স্বাস্থ্য) ও ডিওডিইউ এফডব্লিউএইচও (কলম্বো)। ডাক্তারী ডিগ্রী না হলেও বিসিএসকে দেখানো হয়েছে ডাক্তারী সাইনবোর্ডে। আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার(হু) উদ্যোগে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় যোগ দেয়াকেও তিনি ডিগ্রী হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন।

একই রোডের অপর একজন ডাক্তার এমবিবিএস, ডিসিও(সিইউ), এফআরএসএইচ (লন্ডন), এমআরএসপিএইচ (ইউকে), এফআইওএল, এফএসআইসিএস (মাদ্রাজ) সম্বলিত একাধিক ডিগ্রী জুড়ে দিয়ে সাইনবোর্ডের পাল্লা ভারী করেছেন। অথচ এগুলো দিয়ে স্রেফ প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন কেউ কেউ।

ডাক্তারদের বৃহত্তর সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সেখ আখতারুজ্জামান বলেন, এসব ডিগ্রী ব্যবহার করে কেউ ৩শ' টাকা ভিজিট নিতে পারেন না। এসব ডাক্তারদের ভিজিট ১শ' টাকার বেশী হতে পারে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে, এ ধরনের ডিগ্রীধারী ২/১ জন বলেন, সর্ট কোর্স আর লং কোর্স যাই হোক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পড়াশোনা করেই এসব ডিগ্রী যোগাড় করা হয়েছে। বিএমএন্ডডিসি হতে স্বীকৃতি লাভ না হলে একাডেমিক ডিগ্রী ধরা যাবে না বলে যেটি বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে ঐসব ডিগ্রীধারীরা বলছেন, বিদেশে আমাদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোন কোন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ক্লাশ নেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে খুলনার সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে এম আব্দুস সামাদ মিয়া বলেন, বিএম এন্ড ডিসি'র অনুমোদন ছাড়া কোন ডিগ্রীই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্যাথলজী ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে দেয়া হয় ভৌতিক রিপোর্ট, কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি

দেড় বছরের অরুন্ধুতির পায়খানা পরীক্ষার জন্য দেয়া হয়েছিল নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডের একটি প্যাথলজীতে। কিন্তু রিপোর্ট দেয়া হয় প্রস্রাব পরীক্ষার। রোগীর পিতা না বুঝে তড়িঘড়ি করে রিপোর্ট নিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে দেখানো মাত্রই স্পষ্ট হয়ে যায় প্যাথলজির দায়িত্বহীনতার বিষয়টি। অথচ খুলনা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজী বিভাগের সদ্য পদোন্নতি পাওয়া একজন অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠান এটি।

চিকিৎসা সেবার এ বাস্তব চিত্রটি শুধু ১নং সাউথ সেন্ট্রাল রোডের উক্ত প্যাথলজিতেই ঘটছে তা-ই নয়। বরং এভাবে অহরহ ভুল ও অসচেতনতার পরিচয় দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা প্যাথলজিতে। অনেক সময় ডাক্তারদের স্বাক্ষর করা প্যাড থাকে এসব প্যাথলজিতে। রোগী গেলে তড়িঘড়ি করে রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা বা অন্য কোন পরীক্ষার পর অপরিপক্ক লোকেরাই মনগড়া রিপোর্ট লিখে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের কয়েকটিসহ নগরীর বেশ কিছু ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি বিপুল পরিমান রি-এজেন্ট এবং ডাক্তারের স্বাক্ষর করা প্যাড উদ্ধার করেন একজন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট। ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে এসব ভৌতিক রিপোর্ট দেয়ার কারণে অনেক সময় রোগীদের জীবনের ওপর নেমে আসে ঝুঁকি। তাছাড়া মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে করানো এসব পরীক্ষা রোগীর জন্য কোন ফলতো বয়ে আনতে পারেই না বরং হিতে বিপরীতও দেখা দেয়।

এভাবে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার কারও নেই। আর তা নেই বলেই দরকার এর প্রতিকার। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য যাদের ব্যবস্থা নেয়ার কথা সেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এগিয়ে আসলেন একজন সাধারণ মানুষ। নগরীর টুটপাড়া তালতলা হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা মোঃ শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। খুলনা সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দায়েরকৃত ঐ মামলার নং- দেওয়ানী ২৬১/০৬। নগরীর ৩১নং শামসুর রহমান রোডস্থ ল্যাব এইড ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামক প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ নুরুল ইসলামকে প্রধান বিবাদী করে এ মামলা দায়ের করা হয়। মামলার অন্যান্য বিবাদীরা হলেন, খুলনার সিভিল সার্জন, পরিচালক (স্বাস্থ্য), মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য), বিএমএ খুলনার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, আয়কর বিভাগের কমিশনার, কাস্টম ও ভ্যাট কালেক্টর এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে খুলনার জেলা প্রশাসক।

মামলার আরজিতে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যাক্রমকে বেআইনী, অবৈধ, অন্যায় এবং জনস্বার্থ বিরোধী ও জনস্বার্থের জন্য হুমকি বলে ঘোষণা দিয়ে এর কার্যক্রম বন্ধের জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন জানানো হয়।

তবে সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মচারী টাকা আত্মসাৎ করে চলে যায়। যে কারণে তার বিরুদ্ধে তিনি প্রথম মামলা করেন। এর পর ঐ কর্মচারীর একজন আত্মীয়কে দিয়েই আদালতে হয়রানিমূলক মামলা করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স নম্বর ৩১৪৯। এছাড়াও নগরীর বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চলছে নানা অনিয়ম। নগরীর ২৬৮ নম্বর শেরে বাংলা রোডের একটি ক্লিনিক সংলগ্ন স্থানে একই নামে রয়েছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার। খুলনা জেনারেল হাসপাতালের এনেসথেসিয়া বিভাগের ডাক্তারের প্রতিষ্ঠান এটি। ক্লিনিকের নামে রেজিস্ট্রেশন আছে বলা হলেও তিনি কোন রেজিঃপত্র দেখাতে পারেননি। এছাড়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যাপারে বলা হয়, নিজেদের ক্লিনিকের কোন কোন রোগীর সামান্য কিছু টেস্ট এখানে করা হয়, অন্য কোন পরীক্ষা হয় না। কিন্তু ডায়াগনস্টিক সেন্টারের INVESTIGATION REQUEST ফরমে দেখা যায়, সেখানে ব্লাড, ইউরিন, স্টুল, মাইক্রোবায়োলজী, উইদাউট কন্ট্রাস্ট এক্স-রে, কন্ট্রাস্ট এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফী, হরমোন, ইসিজি এবং ইকো-কার্ডিওগ্রাফী পরীক্ষা করা হয়। আবার ঐ ফরমে দেয়া ০১৭১১-০০৯৯৬৭ নম্বর মোবাইলে রিং করা হলে রবিউল নামের ম্যানেজার জানান, এটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার নয়, ক্লিনিক। আবার ঐ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ঠিকানা দেয়া হয়েছে বাড়ী নং-৩৫৯, রোড নং-১৭, শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

খুলনা মহানগরীর অনেক ক্লিনিকে টর্চ লাইট ধরিয়ে অস্ত্রোপচারের সময় রোগী মৃত্যুর ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি ভুল রিপোর্টের কারণে রোগী বা রোগী পরিবারকে ভোগান্তিতে পড়ার অনেক ঘটনাই এখন কালের সাক্ষী হয়ে থাকছে। কিন্তু এসব ক্লিনিক বা প্যাথলজির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন নয়, খুলনায় ডাক্তারদের মধ্যে চলছে পেশাগত জেলাসী আর প্রতিহিংসার রাজনীতি

বিগত কয়েক বছর ধরে খুলনায় স্বাস্থ্য খাতে কোন উন্নয়ন না হলেও প্রতিপক্ষ চিকিৎসকদের হয়রানিমূলক বদলী ও পেশাগত জেলাসীর একাধিক ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক ভিন্নতার কারণে বিরোধী পক্ষকে করা হয়েছে হয়রানিমূলক বদলী। পক্ষান্তরে, সরকার দলীয় ডাক্তাররা রয়েছেন বহাল তবিয়তে। কিন্তু পেশাগত জেলাসী আর প্রতিহিংসার রাজনীতি চললেও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে যেমন ৫শ' বেডে উন্নীত করা হয়নি তেমনি নির্মাণাধীন আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল বন্ধ রেখে গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি গিলাতলাস্থ এসেন্সিয়াল ড্রাগ হাউজের বরাদ্দ কমিয়ে শুধুমাত্র কনডম কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে খুলনাবাসীকে।

রাজনৈতিক বদলীসহ স্বাস্থ্য খাতের অনিয়ম সংক্রান্ত এ অভিযোগ আওয়ামীপন্থী চিকিৎসকদের হলেও জাতীয়তাবাদী পন্থীদের রয়েছে ভিন্নমত। তাদের মতে চার দলীয় জোট সরকারই প্রকল্প খাত থেকে মেডিকেল কলেজকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, এসেন্সিয়াল ড্রাগ হাউজের প্রথম ইউনিট স্থাপন এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করতে পেরেছে। বিগত ১৯৯৬-২০০১ এর শাসনামলে তৎকালীন বিরোধী ডাক্তাররা বেশী হয়রানির শিকার হয় বলেও তারা দাবি করেন।

সব মিলিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি চললেও বিগত কয়েক বছর ধরে খুলনার স্বাস্থ্য খাতের যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন হয়নি তা অনেকটা স্পষ্ট।

রাজনৈতিক ভিন্নতা থাকায় বিগত পাঁচ বছরের শাসনামলে খুলনা থেকে যেসব ডাক্তারকে বদলী করা হয় তাদের অন্যতম হলেন, ডাঃ মোঃ মহসীন (রংপুর-দিনাজপুর), ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিস্ত্রি (দিনাজপুর), ডাঃ জালাল আহ্মেদ (দিনাজপুর), ডাঃ ধীরাজ মোহন বিশ্বাস (দিনাজপুর), ডাঃ ইয়াকুব-উল-আজাদ (বান্দরবন), ডাঃ এসকে বল্লভ (বগুড়া-বরিশাল), ডাঃ তোজাম্মেল হোসেন জোয়ার্দ্দার (খাগড়াছড়ি), ডাঃ মাহফুজুল হক (তেতুলিয়া), ডাঃ সুশান্ত শেখর বিশ্বাস (গাংনী-নড়াইল-বাগেরহাট) এবং ডাঃ মোস্তাক আহমেদ (নওগাঁ)। এ অভিযোগ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) খুলনার সভাপতি ডাঃ বাহারুল আলমের। তিনি বলেন, কোন সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে বদলী না করার একটি রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। কিন্তু বিগত সরকার আমলে স্বাচিপ এর সাধারণ সম্পাদককেও বদলী করা হয়।

বিগত চার দলীয় জোটের শাসনামলে আরও কিছু অনিয়মের কথা তুলে ধরে স্বাচিপ সভাপতি ডাঃ বাহারুল আলম বলেন, মেডিকেল কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে চাকরী পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে চলেছে দলীয়করণ, সিনিয়রদের ডিঙিয়ে করা হয়েছে পদোন্নতি এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে দলীয়করণের বহু চিত্র দেখা গেছে বিগত পাঁচ বছরে। তাছাড়া খুলনাবাসী স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্তি বঞ্চিত হলেও সরকার সমর্থিত ডাক্তারদের হাই কমান্ডের সাথে তারা কখনও বঞ্চণার ব্যাপারেও আলোচনা করেননি বলেও তিনি

অভিযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ক্ষমতায় যাবার সাথে সাথেই আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা, পাঁচ বছরেও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে পাঁচশ' বেডে উন্নীত না করা, বেডের অতিরিক্ত রোগীদের খাবার বন্ধ রাখা এবং এসেন্সিয়াল ড্রাগ হাউজের বরাদ্দ কমিয়ে দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

এছাড়াও বিগত পাঁচ বছরে খুমেক হাসপাতালে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি, শিক্ষা সেমিনারের অর্থ দিয়ে সরকার দলীয় ডাক্তারদের আমেরিকা, থাইল্যান্ডসহ বিদেশ ভ্রম হলেও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করা হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পক্ষান্তরে, ১৯৯৬-২০০১ এর শাসনামলে নিম্নমানের মালামাল ক্রয়ের ঘটনা জানার পর তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে (মরহুম) হাসপাতালে ঢুকতে দেয়া হয়নি বলে তিনি জানান।

এদিকে বিগত পাঁচ বছরের চেয়ে ১৯৯৬-২০০১ এর শাসনামলে সবচেয়ে বেশী রাজনৈতিক হয়রানির ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন-বিএমএ খুলনার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শেখ আখতারুজ্জামান। তিনি বলেন আ'লীগ শাসনামলে বিএমএ'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতি ডাঃ রফিকুল হক বাবলুকে সাত বার এবং তাকে (ডাঃ আখতারুজ্জামান) নয় বার বদলী করা হয়। ঐ সময় তিনি বিএমএ'র সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া ঐ সময় বিএমএর নির্বাচিত প্রতিনিধি ডাঃ মাহবুবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজনকে বদলী করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তৎকালীন উপ পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডাঃ রশিদ হাওলাদার স্বাচিপ পন্থীদের কথা না শোনার কারণে তাকেও হয়রানিমূলক বদলী করা হয়। আবার গত পাঁচ বছরে ডাঃ তোজাম্মেল হোসেনকে বদলী করা হলেও তিনি যথাস্থানে যোগদান করেননি বলে তিনি জানান। একইভাবে ডাঃ মোঃ মহসীন, ডাঃ রওশন আরা, ডাঃ কাজী হামিদ আসগর, ডাঃ আনোয়ারুল আজাদের বাড়ী খুলনায় হওয়ায় বিগত পাঁচ বছরে তাদেরকে বদলী করা হয়নি। কিন্তু বিএমএ'র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আ'লীগ আমলে বদলী করা হলেও জোটের আমলে আওয়ামীপন্থীরা ছিলেন বহাল তবিয়তে। এছাড়া জাতীয়তাবাদী ও আওয়ামীপন্থী ডাক্তারদের বিরোধের চেয়ে স্বাচিপ পন্থীদের বিরোধের জের ধরে নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতা দখলের রাজনীতি বেশী বলে উল্লেখ করেন বিএমএ সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলেন, সম্প্রতি রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ডাঃ রবিউল ইকবালকে সরিয়ে সেখানে এসেছেন ডাঃ মনোরঞ্জন ধর। অথচ ঐ দু'জনই আওয়ামীপন্থী ডাক্তার। কিন্তু খুমেক হাসপাতালে প্রেষণে কর্মরত ডাঃ রবিউল ইকবাল বলেন, সম্প্রতি হাসপাতালের এ্যানেস্থেসিয়া মেশিন গ্রহণ না করায় তাকে ষড়যন্ত্র করে বদলী করা হয়। অপর একটি সূত্র বলছে, খুমেক পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিক কাম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক হওয়ায় ডাঃ ইকবাল বদলী ঠেকাতে জোর তদবির শুরু করেছেন। অবশ্য তিনি এ বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, কম দামে এবং নিম্নমানের মেশিন গ্রহণ না করায় তাকে ঢাকায় বদলী করে নিম্নমানের এ মেশিন হাসপাতালে দেয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে।

এভাবে খুলনার স্বাস্থ্য বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এক অরাজক পরিস্থিতি। যার প্রতি কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ না হলে অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। সাধারণ লোকদের বক্তব্য-ব্যবসা আর রাজনৈতিক মনোবৃত্তি পরিহার করে সেবার মানসিকতা নিয়েই ডাক্তারদের এগিয়ে আসা উচিত।

।। সংশোধনী ।।

অপরদিকে গত ৩০ নভেম্বর দৈনিক পূর্বাঞ্চলে প্রকাশিত স্বাস্থ্য চিত্রের সংবাদে বিএমএ খুলনার সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সেখ মোঃ আখতারুজ্জামানের বক্তব্যে কিছুটা সংশোধনী দেয়া হয়েছে।

বিএমএ সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত সংশোধিত বক্তব্যে বলা হয়, খুলনা শহরে প্রচলিত রয়েছে এমবিবিএস এবং সমপর্যায়ের চিকিৎসকদের পরামর্শ ফি ১০০ টাকা এবং বিএমএন্ডডিসি কর্তৃক স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসদের ফি ৩০০ টাকা।

ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট চক্র এখনও সক্রিয়, ১টি এমসি'র সাথে ডাক্তারসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জড়িত

প্রথম ভর্তি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এরপর আরও ভাল চিকিৎসার জন্য নগরীর রায়পাড়া ক্রস রোডের মমতাজ ক্লিনিকে। এক্স-রে করা হয় কম্পাটু নামের একটি ভুয়া ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্সে। মিসেস রেহানা নামের একজন রোগীর এ রেকর্ড কাগজপত্রে থাকলেও বাস্তবে কোন মিল নেই। খুমেক হাসপাতালে ভর্তির কথা বলা হলেও সেখানে যেমন কোন রেকর্ড নেই, তেমনি নেই মমতাজ ক্লিনিকেও। অনুরূপভাবে এক্স-রে রিপোর্ট দেয়া ইএনটি ডাক্তার এ. কিউ জোয়ার্দ্দার বলেন, তিনি কম্পাটু ডায়াগনষ্টিক সেন্টার নামে কোন প্রতিষ্ঠান চেনেন না ঠিকই কিন্তু সংশ্লিষ্ট এক্স-রে রিপোর্টটি তার হাতেই লেখা।

খুলনা মহানগরীর এ বাস্তব চিত্রটি দেখেই প্রমাণ হয় যে, এখানে ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য একটি শক্ত নেটওয়ার্ক এখনও সক্রিয়। এক সময়ের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্টিফিকেট ডাক্তার হিসেবে পরিচিত একজন ডাক্তারেরই প্রতিষ্ঠান ৩৯/২ নম্বর রায়পাড়া ক্রস রোডের মমতাজ ক্লিনিকটি। ঐ ডাক্তারের পোস্টিং দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কিন্তু সার্টিফিকেট ব্যবসা করেন খুলনায়। যার চিত্র ফুটে উঠেছে সংশ্লিষ্ট রোগীর সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে। আর এর সাথে জড়িত রয়েছেন ক্লিনিক, ক্লিনিকের মালিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এবং সংশ্লিষ্ট ইএনটি (এক্স-রে রিপোর্ট প্রদানকারী) ডাক্তার।

গত ৯ নভেম্বরের ঘটনা এটি। রূপসার রামনগর এলাকার রেহানা খাতুন নামের একজন রোগী একটি মামলায় দেখান যে, তিনি ঐদিন সকালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। আরও ভাল চিকিৎসার জন্য তাকে নেয়া হয় নগরীর রায়পাড়া ক্রস রোডস্থ মমতাজ ক্লিনিকে। ক্লিনিকের মালিক ডাঃ খান ওমর ফারুক ১৪ নভেম্বর স্বাক্ষরিত একটি ইনজুরি সার্টিফিকেটও উল্লেখ করেন ভর্তি এবং চিকিৎসার কথা। কিন্তু শনিবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে যখন ক্লিনিকে গিয়ে রেজিস্ট্রার দেখতে চাওয়া হয় তখন তিনি বলেন, এই নামের কোন রোগী ৯ নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত সেখানে ভর্তি বা চিকিৎসা নেয়নি।

ঐ রোগীকে দেয়া এক্স-রে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, তার বুকের বাম পার্শ্বের হাড়ভাঙ্গা রয়েছে। COMPATU DIAGONESTIC COMPLEX নামের প্রতিষ্ঠানের প্যাডে এক্স-রে রিপোর্ট দেয়া হলেও ঐ নামের কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। উক্ত ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্সের ঠিকানা কেএমসিএইচ, ছোট বয়রা, খুলনা- দেয়া হলেও খুমেক হাসপাতালের সামনে দেখা যায় কম-প্যাথ ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স আছে, কিন্তু কম্পাটু নেই। কম-প্যাথের মালিক বিপ্লব দাস বলেন, কম্পাটু নামের কোন ডায়াগনষ্টিক সেন্টার খুলনায় আছে বলে তার জানা নেই। একই কথা বলেন মমতাজ হেলথ কেয়ারের মালিক ডাঃ খান ওমর ফারুকও। আবার কম্পাটু ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের প্যাডে যিনি এক্স-রে রিপোর্ট লিখে দিয়েছেন তিনিও জানেন না প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের কথা। ইএনটি ডাক্তার এ. কিউ জোয়ার্দ্দার বলেন, রিপোর্টটি আমি লিখেছি ঠিকই, কিন্তু ডায়াগনষ্টিক সেন্টার কোথায় তা জানি না।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন অনেক এক্স-রে রিপোর্টই লিখতে হয়। শুধুমাত্র এক্স-রে প্লেট দেখেই রিপোর্ট লেখেন বলেও তিনি জানান। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অস্তিত্ব আছে কি না তা তার দেখার বিষয় নয় বলেও তিনি এ প্রতিবেদককে জানান।

এভাবে খুলনা মহানগরীর আনাচে-কানাচে, নামে-বেনামে গজিয়ে উঠা নাম সর্বস্ব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসার নামে চলছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের এক নগ্নতা। শনিবার দুপুরে ৩৯/২ রায়পাড়া ক্রস রোডের ক্লিনিকটিতে গিয়ে দেখা যায় সেটি একটি আবাসিক বাড়ি। নিচ তলায় বাড়ির কয়েকটি কক্ষে রয়েছে রোগী ভর্তি। পাশের একটি অন্ধকার কক্ষের সামনে লেখা রয়েছে অপারেশন থিয়েটার। প্রবেশ মাত্রই ভেসে আসে সিগারেটের দুর্গন্ধ। ওটির কথা জিজ্ঞেস করতেই ডাক্তার বললেন, এখানে এখন অপারেশন হয় না। কিন্তু বের হওয়ার সময়ই দেখা যায়, মোঃ আব্দুল গফফার নামের এক রোগীর হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষার রিপোর্ট। ঐ রিপোর্টে দেখা যায়, মমতাজ হেলথ এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে সেটি করা হয়েছে। ইএনটি ডাক্তার হিসেবে নিচে স্বাক্ষর রয়েছে ডাঃ খান ওমর ফারুকের। পরীক্ষাটি পয়লা ডিসেম্বর করা হয় বলে দেখা যায়। অথচ প্যাডে দেয়া ০১৭১২-২৪৯৮৪৮ নম্বর মোবাইলে কথা হলে এস. এম আলী নামের মালিক পক্ষের জনৈক ব্যক্তি জানান, দু'দিন হল নিজস্ব রোগীদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু এর বৈধতা কতটুকু আছে তা' তিনি জানাতে পারেননি।

এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারদের এ্যাসোসিয়েশন গঠনের মধ্য দিয়ে রোগীদের জিম্মি করে নেয়া হচ্ছে অপারেশনের অর্থ

এবার এ্যাসোসিয়েশন গঠনের মধ্য দিয়ে রোগীদের জিম্মি করে অর্থ আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজিস্ট খুলনা শাখা গঠনের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় খুলনা মহানগরীর প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে অপারেশনের রেট বেড়ে গেছে। সেই সাথে একই অপারেশনের ক্ষেত্রে নেয়া হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক ভিন্ন অংকের অর্থ। অর্থাৎ কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই অপারেশনের বেলায়। চুক্তি করে যার কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব আদায় করা হচ্ছে টাকা। মহানগরীর চিকিৎসা ব্যবস্থায় এ নতুন সংযোজন হওয়ায় রোগীরা সেবার পরিবর্তে পাচ্ছে ডাক্তারদের চাপিয়ে দেয়া ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। নগরীর বেশ কিছু প্রাইভেট ক্লিনিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আগের তুলনায় যে কোন অপারেশনের রেট বেড়ে গেছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ বলছেন, এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারদের রেট বৃদ্ধি। সম্প্রতি এক সভা করে এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তাররা অপারেশনের ক্ষেত্রে যে রেট বেঁধে দিয়েছেন তাতে আগের তুলনায় প্রায় তিনগুনেরও বেশী । ফলে রোগীদের কাছ থেকেও নেয়া হচ্ছে বেশী টাকা। একইভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারারও অপারেশনের রেট বৃদ্ধি করে দেয়ায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত রোগীদের অনেকটা হতাশার মধ্যেই চলতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে যে স্থান থেকেই রেট বাড়ানো হোক না কেন তার প্রভাব পড়ে রোগীদের ওপর। কেননা ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ ঠিকই রোগীদের কাছ থেকে বর্ধিত টাকা আদায় করে নেন।

সূত্রটি জানায়, যে কোন অপারেশনের ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান করার জন্য দরকার হয় এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারের। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ ডাক্তারের পাশাপাশি সার্জারী এবং এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তার ছাড়া যেহেতু অপারেশন সাকসেস হয় না সেহেতু সার্জারী ও অজ্ঞান করা ডাক্তারদের চাহিদাও বেশি। ফলে তাদের চাহিদাকে কেউ খাটো করে দেখতে পারেন না। এসব দিক বিবেচনা করে হয়ত বা গত কয়েক মাস আগে সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজিস্ট-এর খুলনা শাখা গঠিত হয়েছে। ঐ কমিটি গঠনের সময় অনুষ্ঠিত এক সভায় সম্মানজনক এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সিদ্ধান্তের আলোকে Laparoscopic Surgery, TURP, Prostectomy, Jwiet Nail Total Thyroidectomy, Incisional Hernia (Major) সহ ১৯ প্রকার অপারেশনের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১২' টাকা। অনুরূপভাবে C/S. OverianTumar, Nasal Polyp, Thyroid Nodule S Paediatric Opthalmic Surgery 'র জন্য আগে ৫শ' থেকে ৮শ' টাকা নির্ধারণ থাকলেও বর্তমানে করা হয় এক হাজার টাকা, Hernia (Inguinal), Hydrocele সহ নয় প্রকার অপারেশনের জন্য আগে ৪শ'/৫শ' টাকা থাকলেও বর্তমানে করা হয় ৭শ' টাকা, MR, D&C, Circumcission সহ সাত প্রকার অপারেশনের জন্য আগে ৩শ' টাকা থাকলেও বর্তমানে করা হয় ৫শ' টাকা। এছাড়া আগে প্রতিটি অপারেশনের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করা না থাকলেও এ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিটি অপারেশনকে এক ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়। ঘণ্টা পার হওয়ার সাথে সাথেই প্রতি ঘণ্টার জন্য এ টাকার সাথে ৩০% যোগ হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়। ডাক্তারদের ঐ সিদ্ধান্তের কপি প্রতিটি ক্লিনিকে প্রেরণের পর ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজের ডাক্তারদের মধ্যস্থতায় কয়েক দফায় বৈঠকও হয়েছে এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারদের

সাথে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। শুধুমাত্র এক ঘণ্টা পর প্রতি ঘণ্টার জন্য ৩০% বর্ধিত করার বিষয়টি প্রত্যাহার করা হলেও মূল টাকা থেকে মোটেও কমানো হয়নি। তাছাড়া কোন অপারেশন এক ঘন্টার আগে শেষ হলেও নেয়া হয় এক ঘণ্টার টাকা। এ প্রসঙ্গে জনৈক ক্লিনিক মালিক বলেন, একটি রোগীকে ৭/৮ দিন ক্লিনিকে রেখে অপারেশনের পর ওষুধপত্র দিয়ে যদি এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারকেই ১২শ' টাকা দিতে হয় তাহলে তাদের কিছুই থাকে না। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই তাদেরকে রোগীদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দিতে হয়। তবে সব রোগীর ক্ষেত্রে তা দেয়া সম্ভব না হওয়ায় অনেক রোগীকে বিপাকেই পড়তে হয়। তবে এনজিওভিত্তিক ক্লিনিকগুলো এক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে বলেও তিনি জানান। ঐ ক্লিনিক মালিক বলেন, এনজিওভিত্তিক ক্লিনিকগুলো যেহেতু আলাদাভাবে ফান্ড পেয়ে থাকে সেহেতু তাদের লোকসান নেই। এছাড়া তিনি আরও বলেন, হঠাৎ করে ৪০% থেকে ৫০% বৃদ্ধি করায় রোগীদের জন্য একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হলে এমনটি হত না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া এ্যাসোসিয়েশন গঠন করে ক্লিনিক মালিকদের প্রতি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সদস্য ছাড়া কাউকে দিয়ে রোগী অজ্ঞান করা যাবে না। অবশ্য এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারদের এ হেন অপারেশনের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের খুলনা শাখার নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ গাজী মিজানুর রহমান মূল্য বৃদ্ধিতে সমর্থন জানিয়ে বলেন এতে ক্লিনিক মালিকদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। তবে সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। যাতে ১ ঘণ্টা পর ৩০% বৃদ্ধির বিষয়টি ছাড় দেওয়ার কথা হয়েছে।

অপরদিকে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সওকত আলী লস্কর বলেন, এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তারদের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্লিনিক মালিকদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। রোগীদের কাছ থেকে বেশী টাকা নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু একটি নির্দিষ্ট হারে টাকা নেয়া হচ্ছে সেহেতু এখন বেশি নেয়াও যাচ্ছে না। সুতরাং এতে ক্লিনিকগুলোর লোকসানের দিক যাওয়াটাই স্বাভাবিক বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে সোসাইটি অব এ্যানেসথেসিওলজিস্ট খুলনা শাখার সহ-সভাপতি ডাঃ শেখ ফরিদ উদ্দীন আহমেদ বলেন, এ্যাসোসিয়েশন গঠনের মধ্য দিয়ে খুলনার ক্রমউন্নয়নশীল চিকিৎসা সেবায় নিজেদেরকে সঠিকভাবে সম্পৃক্ত করা, এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশার অদক্ষ ও অবৈধ প্রাকটিস বন্ধ, পেশার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং এ্যানেসথেসিয়া সেবা দেয়ার নূন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

নগরীর দু'টি বৃহৎ সরকারী হাসপাতালের নার্সদের বদলী হয় না দীর্ঘ ৫ থেকে ১৫ বছর, ওষুধ পাচারের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ

ডাক্তার-কর্মকর্তাদের বদলী হয়, কিন্তু হয় না নার্সদের। কোন কোন নার্স একাধারে একই প্রতিষ্ঠানে চাকরী করছেন ৫ থেকে ১৫ বছর। আর সেই সুবাদে জুনিয়র নার্স এবং রোগীদের সাথেও হয় দুর্ব্যবহার। ওয়ার্ড, কেবিন আর ওটি থেকে ওষুধ পাচারের বিষয়টিতো আছেই। প্রতিদিন আট ঘণ্টা ডিউটির পর যখন বের হয় তখন ঐসব নার্সদের ব্যাগ তল্লাসী করলে যে হাসপাতালের ওষুধ বা অন্যান্য মালামাল পাওয়া যায় তার কয়েকটি প্রমাণ হাতে-নাতে ধরা পড়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার হয়নি। নার্সদের বদলীর বিষয়টি যেহেতু লোকাল কর্তৃপক্ষের হাতে নেই সেহেতু ঢাকায় যোগাযোগ করে তারা দীর্ঘদিন একই স্থানে বহাল তবিয়তে থাকছে দীর্ঘদিন।

খুলনার বৃহৎ দু'টি সরকারী হাসপাতালের একটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অপরটি খুলনা জেনারেল হাসপাতাল। এর মধ্যে খুমেক হাসপাতালে ৬ জন নার্সিং সুপারভাইজার, ১০৩ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং ৪৬ জন স্টাফ নার্স মিলে সর্বমোট ১৫৭ জন নার্স রয়েছে। আর খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা সর্বমোট ১০৫ জন। এ দু'টি হাসপাতালে দীর্ঘ ১০-১৫ বছর ধরে কর্মরত আছেন এমন নার্সের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক। একই স্থানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত থাকার সুবাদে হাসপাতাল অনেকটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তাদের কাছে। অনেক সময় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে একই স্থানে ডিউটি করার সুযোগ থাকে দীর্ঘদিন। বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটারে ডিউটির সুযোগ পেলে সেখান থেকে দামী ওষুধ পাচারেরও থাকে সুবর্ণ সুযোগ। আর ওয়ার্ডে ডিউটির ফাঁকেও চলে ওষুধ পাচারের কারবার।

খুমেক হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে গতকাল পরিদশনে গিয়ে দেখা যায়, জনৈক রোগীর ভিজিটর বিভিন্ন প্রকার ওষুধ এনে পার্শ্ববর্তী অন্যকে বলছেন, যেন একই সাথে সেগুলো বের করে না দেয়া হয়। কেননা নার্সদের কাছে ওষুধ চলে গেলে তা ফেরত না আসার সম্ভাবনাই বেশী বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

একই আশংকা রয়েছে অপারেশন থিয়েটারের রোগীদেরও। কোন রোগী ওটিতে প্রবেশের আগেই সমুদয় ওষুধ বুঝে নেয়া হয় আগে থেকেই। কিন্তু তারপরেও ওটি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভিতর থেকে আসতে থাকে একাধিক স্লিপ। রোগীর লোক তখন উপায়ন্তর না পেয়ে বাধ্য হয়েই সেগুলো কিনে দেন। কিন্তু ওটি থেকে ওষুধ ফেরত দেয়ার নজির নেই বললেই চলে। আবার হাসপাতালের স্টোর থেকে ওয়ার্ডে যেসব ওষুধ দেয়া হয় তারও যথাযথ ব্যবহার না করে সেগুলো বাইরে পাচার হয় নার্স বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে। বিগত ৪/৫ মাস আগে খুমেক হাসপাতাল থেকে সরকারী ওষুধ পাচারের সময় হাতে-নাতে এক নার্স ধরা পড়ার পর জনৈক কর্মচারী নেতা সেটি হ্যান্ডেল করেন। পরে কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেও তা সরকারী ওষুধের পরিবর্তে দেখানো হয় দোকানের কেনা ওষুধ। ফলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। শোনা যাচ্ছে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ঐ বিষয়টি তখন ধামাচাপা দেয়া হয়। এভাবে নার্স-কর্মচারীদের যোগসাজশে খুমেক ও জেনারেল হাসপাতালে চলছে ওষুধ পাচারের

এক মহোৎসব । কোন কোন নার্স-কর্মচারীর সাথে ওষুধের দোকানের রয়েছে চুক্তি। নগরীর হেরাজ মার্কেট, হাসপাতালের সামনের এবং রূপসাসহ নগরীর বিভিন্ন ওষুধের দোকানের সাথে তাদের চুক্তি মোতাবেক বিক্রি করা হয় ওষুধ। অনেকের সাথে কোন কোন ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারেরও যোগাযোগ রয়েছে। আর এভাবেই সরকারী হাসপাতালের পাচারকৃত এসব ওষুধ যায় ঐসব প্রাইভেট ক্লিনিক এবং ওষুধের দোকানে।

নার্সদের বদলী না হওয়ার কারণ সম্পর্কে খুমেক হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হামে জামাল বলেন, এ বিষয়টি নির্ভর করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (নার্স) এর ওপর। সম্প্রতি খুমেক হাসপাতালের দু'জন নার্স ও এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর পরিচালক (নার্স) দু'নার্সকে বদলী আদেশ দিলেও পরে আন্দোলনের মুখে তা বাতিল হয়। নার্স-কর্মচারীদের সম্মিলিত আন্দোলনের কারণকেও অনেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। অপরদিকে পরিচালক (নার্স) খাদিজা বেগমের পরিবর্তে গতকাল মঙ্গলবার যোগদান করেন আজিজুন নাহর। আজ বুধবার তিনি আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে ঢাকাস্থ ডিএনএস অফিস সূত্রে জানা গেছে। তবে নবাগত পরিচালক (নার্স) আজিজুন নাহারের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এভাবে নার্সদের বদলীর ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোন হাত না থাকায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে একই স্থানে দীর্ঘদিন ধরে থাকছেন অনেকেই। এছাড়া অনেক সময় দৃষ্টিকটুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তিন বছর পার হওয়ার পর খুমেক হাসপাতাল থেকে জেনারেল হাসপাতাল এবং জেনারেল হাসপাতাল থেকে খুমেক হাসপাতাল এভাবে বদলী করে নেয়ার অলিখিত নিয়মটিও চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু তা গুটি কয়েকের বেলায় হলেও অনেকেই রয়েছে একাধারে ১০/১২ বছর। খুমেক হাসপাতালের সেবা তত্ত্বাবধায়ক (মেট্রোন) রেনুকা বালা রায় বলেন, নার্সরা যেহেতু তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, সেহেতু তাদের বদলীর ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তাদের ওষুধ পাচারের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করেননি।

মেডিকেল প্রতিনিধি আর দালালদের হাতে জিম্মি থাকে খুমেক হাসপাতালের রোগীরা

আজ থেকে বছর দু'য়েক আগের কথা। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয়েছিল 'দালাল খেদাও' আন্দোলন। সেই সাথে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের হাসপাতালে প্রবেশেরও একটি সময় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সে নিয়ম আজ কাগজে নিয়মেই পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সকাল দশটা বাজার আগেই হাসপাতালের নব-নির্মিত ভবনের সামনে জড়ো হয় শতাধিক মোটর সাইকেল। বিভিন্ন কোম্পানীর মেডিকেল প্রতিনিধিরা ডাক্তারদের সাথে গিয়ে আলাপচারিতার মধ্যে সময় কাটান। রোগীরা বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এক পর্যায়ে মেডিকেল প্রতিনিধিদের ভিজিট দেয়া শেষ হলেই শুরু হয় ডাক্তারদের বাড়ি ফেরার তাড়া। দুপুর গড়িয়ে যাবার সাথে সাথেই তাদের দেখা যায় না হাসপতাল বাউন্ডারীতে। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন। কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। গতকাল বুধবার বেলা ১১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে নানান চিত্র। হাসপাতালের সামনের নাম সর্বস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানের জন্য নির্ধারিত 'দালাল' বাহিনীর হাতে রোগীরা কিভাবে জিম্মি থাকে তার বাস্তব চিত্রটিই ধরা পড়ে গতকাল। কিন্তু ভুক্তভোগীরা বলছেন, এ চিত্র নিত্যদিনের বর্হিবিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে নামার সাথে সাথেই যখন রোগী বা রোগীর লোক গন্তব্যের দিকে রওনা হয় তখনই 'তিন বাহিনী'র হাতে ধরা পড়তে হয় তাদেরকে। প্রথমে মেডিকেল প্রতিনিধিদের হাতে দিতে হবে স্লিপটি। কি কি ওষুধ কোন ডাক্তার লিখেছেন তা না দেখা পর্যন্ত স্লিপগুলো ছাড়া হয় না। এর পর রয়েছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানের 'দালাল'। স্লিপটি হাতে নিতেই ভাই বা বোন সম্বোধন করে পরীক্ষা জন্য নেয়া হয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। কখনও হাসপাতালের ডাক্তার একজন কর্মচারীকে ডেকে তার সাথে রোগীটি পাঠিয়ে দেন বাইরে। রোগীকে বলেন, ওর সাথে যান সামনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিয়ে আসুন। কর্মচারীটি রোগী নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষমান দালালের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যান। এরপর দিন বা সপ্তাহ শেষে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের কাছে চলে যায় পার্সেন্টেজের টাকা। আর 'দালাল' নামক ঐসব লোকদের জন্য রয়েছে আরও একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্টেস। এছাড়া সামনের ওষুধের দোকানগুলোর জন্যও নির্ধারিত থাকে আলাদা 'দালাল'। তাদেরও কাজ প্রায় একই। রোগীটি ডাক্তার দেখিয়ে নামার সাথে সাথেই স্লিপটি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয় নির্ধারিত ওষুধের দোকানের দিকে। এছাড়া খুমেক হাসপাতালে কোন নতুন রোগী ভর্তি হলে তার পেছনেও লাগানো থাকে দালাল শ্রেণীর লোকেরা।

খুমেক হাসপাতালের সামনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ওষুধের দোকানের দালালরা হাসপাতালের সকলের কাছেই পরিচিত। তাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাদের হাসপাতাল অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ হয় দু'বছর আগে থেকেই। যে কারণে তারা হাসপাতাল বাউন্ডারীতে থাকলেও অনেক সময় ভিতরে যেতে পারে না। ফলে ভিতর থেকে কর্মচারীরা রোগী নিয়ে এসেই হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। এভাবেই চলছে ডাক্তার, কর্মচারী, মেডিকেল প্রতিনিধি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানীদের যৌথ ব্যবসা। মেডিকেল প্রতিনিধিদের চুক্তি বাস্তবায়নে অনেক সময় যেমন ডাক্তারদের লিখতে হয়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ, তেমনি পার্সেন্টেইজ পেতে দিতে হয় বিভিন্ন পরীক্ষা। আবার ডাক্তার এবং দালালদের পার্সেন্টেজের পয়সা ওঠাতে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ওষুধের দোকানগুলো নিয়ে থাকে অতিরিক্ত পয়সা। এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে দ্রুত গতিতে দেয়া হয় বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট। দ্রুত রির্পোট দেয়ার জন্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সিলপ্যাড থাকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকদের কাছে। নিজেরাই রিপোর্ট লিখে তড়ি ঘড়ি করে রোগীকে বুঝ দিয়ে বিদায় করেন।

খুমেক হাসপাতালের সামনে রয়েছে বিশ্বাস, উদয়ন, কমপ্যাথ, সুরক্ষা, পপুলার, নাহীদ ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং মোমেনা ক্লিনিক নামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে মোমেনা ক্লিনিকটি এক সময় নাহার ক্লিনিক করার পর আবার তা মোমেনা করা হয়। এখানকার অধিকাংশই ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারেরই কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। কোনটির রেজিস্ট্রেশন থাকলেও তা নেই পূর্ণাঙ্গ । একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রেজিস্ট্রেশন থাকলেও নেই এক্স-রে করার অনুমতি। এ বক্তব্য খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের একটি সূত্রের। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা এ ব্যবসা চালিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্টদের কোন মাথাব্যথা নেই। সূত্রটি বলছে, যেহেতু ডাক্তারদের সাথে এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অলিখিত চুক্তি রয়েছে সেহেতু তারাও এগুলো বন্ধে কার্যত কোন ভূমিকা রাখেন না।

হাসপাতালে দালাল ও মেডিকেল প্রতিনিধি প্রবেশের ব্যাপারে কথা হয় তত্ত্বাবধায়ক ডা. হামে জামালের সাথে। তিনি বলেন, হাসপতাল থেকে সম্প্রতি পুলিশ প্রত্যাহার করায় দালালদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তাছাড়া বহির্বিভাগের সকাল নয়টার মধ্যে এবং অভ্যন্তরের ডাক্তারদের রাউন্ড হবার পর মেডিকেল প্রতিনিধিদের প্রবেশের নিয়ম রয়েছে বলেও তিনি জানান। অবশ্য ডাক্তারদের সহায়তায় এম,আর প্রবেশ করলে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

স্বাচিপ ও ড্যাব-এর ভিন্নমত

দৈনিক পূর্বাঞ্চলে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি প্রকাশিত ডক্টরস্ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব খুলনার সাধারণ সম্পাদক ডা. সেখ আখতারুজ্জামানের এক বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) খুলনা জেলা শাখার সভাপতি ডা. বাহারুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ডা. ময়েনউদ্দিন। এক প্রতিবাদলিপিতে তারা বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে স্বাচিপ এর সহ-সভাপতি ডা. তোজাম্মেল হোসেন জোয়ার্দ্দারকে খাগড়াছড়ি বদলী করা হয় এবং বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন। সুতরাং ড্যাব নেতার বক্তব্যের আলোকে গত ৩ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলের প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক নয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ডা. আখতারুজ্জামান বলেন, ডা. তোজাম্মেল বর্তমানে খুলনা শহরে ঘোরাফেরা করছেন। তার বদলীর অর্ডার হলেও তিনি যথাস্থলে যোগদান করেননি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল হোমিও প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতারণার ব্যবসা প্রতারিত হচ্ছে গ্রামের সহজ-সরল লোক

'মাত্র ৭দিনে ভাল হয় হাঁপানী ও যৌনসহ বিভিন্ন জটিল রোগ'। এভাবে আকর্ষণীয় বক্তব্য লিখে ছোট ছোট সাইন বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয় গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন গাছে বা বিদ্যুতের পোলে। গ্রামের সহজ-সরল লোক না বুঝে চলে আসেন শহরের সেই বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানে। রোগীর গোপন কথাগুলো বের করা হয়। এরপর তার আদ্যপান্ত শুনে দেয়া হয় কিছু উপদেশ। সাত দিনের পরিবর্তে দেয়া হয় তিন সপ্তাহের ওষুধ। হোমিওপ্যাথি নয়, ইন্টারন্যাশনাল হোমিওপ্যাথি। তাই ওষুধের মানও হবে আন্তর্জাতিক। যে কারণে প্রথমেই দেয়া হয় দুই হাজার টাকার ওষুধ। তাও আবার প্রথম দিনে নয়, অর্ডার দিয়ে রোগীকে ফিরে যেতে হবে। তার ১/২ দিন পর পুনরায় এসে নিয়ে যেতে হবে ওষুধ। অর্থাৎ ওষুধ তৈরির কারখানাও বলা যায় এ প্রতিষ্ঠানকে। পর্যায়ক্রমে ওষুধের মূল্য নেয়া হয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা এমনকি তারও বেশি। গ্রামের সহজ সরল লোকটির তখন আর কিছুই করার থাকে না। এভাবেই শুরু হয় 'হোমিও বাণিজ্য'। ভায়াগ্রা জাতীয় ওষুধ দিয়ে তিন সপ্তাহ শেষে যখন কিছুটা উন্নতির দিকে যায় তখনই ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন রোগীটি। তাই কোন তোয়াক্কা নয়, টাকার দিকে না তাকিয়ে দেয়া হয় চাহিদা মোতাবেক অর্থ। কয়েক মাস পর যখন অবস্থা আগের মতই হয়ে যায় তখন পুনরায় বলা হয় রোগের কথা। কিন্তু তখনই শেষ হয়ে যায় ঐ রোগীর দেশীয় চিকিৎসা। এবার বিদেশের পালা। সহায়-সম্বল যা আছে তা বিক্রি করে যেতে হবে ইন্ডিয়ায়। আর তখনই আন্তর্জাতিক মানের এ প্রতিষ্ঠানটির আসল চেহারা উম্মোচিত হয়।

খুলনা মহানগরীর ১১৫ নম্বর খানজাহান আলী রোডের একটি প্রতিষ্ঠান এটি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের সময় গিয়ে দেখা যায় এক ভিন্ন চিত্র। সামনের রিসিপশনে বসে টিভি দেখছিলেন জনৈক ব্যক্তি। দেখামাত্রই নতুন না পুরাতন জিজ্ঞেস করে নতুন শোনার পর চলে যান ভিতরে। ততক্ষণেই বোঝা গেল তিনি ডাক্তার। এরপর ১৫/১৬ বছরের এক যুবতী একটি স্লিপে লিখে নেন নাম ঠিকানা। স্লিপটিতে রয়েছে, নাম, ঠিকানা, বয়স, ফি এবং তারিখ। স্লিপটি নিয়ে ভিতরে যেতেই হুইল চেয়ারটিতে হেলে বসেন ঐ ডাক্তার।

এরপর জিজ্ঞেস করেন রোগের কথা, বলা হয় গোপন কিছু রোগের নাম। রোগী (এ প্রতিবেদক) একজন ব্যবসায়ী শোনার সাথে সাথেই দেয়া হয় কিছু উপদেশ । এরপর বলেন, ওষুধের কথা। তিন সপ্তাহের ওষুধ নিতে হবে একসাথে। দিতে হবে দু'হাজার একশ টাকা। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৭ দিনের মধ্যে ভাল হওয়ার কথা থাকলেও ২১ দিন কেন জানতে চাইলে বলা হয়, ৭ দিনের মধ্যে উপকার পাবে ঠিকই কিন্তু কোর্স ২১ দিনের। তবে ওষুধও দেয়া হবে না এখন। প্রথমে কিছু টাকা দিয়ে অর্ডার দিতে হবে, আর ওষুধ নিতে হবে ১/২ দিন পর।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এভাবে চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রামের লোকদের আকৃষ্ট করে শহরে আনার পর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যায়ক্রমে দিয়ে থাকে ওষুধ। ২১ দিনের কোর্স শেষ হলে দেয়া হয় আরও ২১ দিনের। পর্যায়ক্রমে কয়েক মাস ওষুধ খাবার পর দেখা দেয় পুরাতন রোগ। তারপর পরামর্শ দেয়া হয় বিদেশে যাবার। আর যে সব রোগী ইতোমধ্যেই হতাশ হয়ে যান তাদের কাছ থেকে ততক্ষণে আদায় করে নেয়া হয় কয়েক হাজার টাকা।

গতকাল অর্ডার কার্ডটি ধরিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার জানতে চান কবে আসা সম্ভব। শনিবারের কথা জানানোর সাথে সাথেই ডেলিভারী তারিখ দেয়া হয় ৯-১২-০৬। পিছনে ডাক্তারের নাম লেখা হয় ডা. আকতারুজ্জামান। মোবাইল নম্বর ০১৭১১-১৮১২২০। আপনার নাম কি এটি ? হ্যাঁ আকতারুজ্জামান বলেন তিনি। কিন্তু বিকেলে যখন ঐ মোবাইলে ফোন করা হয় তখন আকতারুজ্জামান নামের ডাক্তার বলেন, তিনি ঢাকায়, সকালের ঘটনা বলা হলে তিনি বলেন, সকালে সেখানে কামরুজ্জামান নামের ডাক্তার রোগী দেখেছেন। তার কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করা হয় ৭৩১৪৮৮ নম্বরে। কিন্তু কোন ফোন রিসিভ করা হয়নি।

হোমিওপ্যাথি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভায়াগ্রা জাতীয় ওষুধ এবং ট্যাবলেটে কিডনি ও লিভার সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার এ্যালকোহল জাতীয় ওষুধ দিয়েও রোগীর ভবিষ্যৎ কর্মস্পৃহা কমিয়ে দেয়া হয়। তবে উত্তেজক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রোগীদের আকৃষ্ট করে দীর্ঘদিন ধরে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান এ ব্যবসা চালিয়ে আসলেও বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করছে না। খুলনার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের একটি সূত্র বলছে, এসব প্রতিষ্ঠান হোমিওপ্যাথির নামে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। তারা হ্যানিম্যানের প্রকৃত সিস্টেমের পরিবর্তে এ্যালোপ্যাথি বা অন্য কোন ওষুধ দিয়ে মূলত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে ধ্বংস করছে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলেও তারা মন্তব্য করেন।

অপরদিকে, সকালে হোমিও কমপ্লেক্সটি পরিদর্শনের সময় দেখা যায় রিসিপশনিস্ট কাকলীর টেবিলের ওপর রয়েছে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্লিপ অর্থাৎ রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় সেখানে। বিনিময়ে তারা পেয়ে থাকেন পার্সেন্টেস। ৪৫, খানজাহান আলী রোডের (ফুল মার্কেটের পার্শ্বে) ঐ প্রতিষ্ঠানটির স্লিপ সম্পর্কে হোমিও কমপ্লেক্সের মালিক ডা. আকতারুজ্জামান বলেন, এ ধরনের বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্লিপ দিয়ে যায় সেখানকার লোকেরা। কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে রোগী পাঠাই না।

টাকার মালিকরাই ক্লিনিক মালিক
কোন প্রকার অভিজ্ঞতা বা পেশা সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন নেই

ডাক্তারী পেশার সাথে জড়িত থাকার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই কোন প্রকার পূর্ব অভিজ্ঞতারও। শুধুমাত্র টাকা থাকলেই হওয়া যাবে ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক। কি গৃহিনী, কি ব্যবসায়ী আবার কি ঠিকাদার কোন কিছুই দেখার প্রয়োজন নেই। টাকা থাকলে যে কেউই হতে পারবেন ক্লিনিকের মালিক।

খুলনা মহানগরীতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এ রেওয়াজ । তাই সেবার মানসিকতা নয়, ব্যবসাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চলছে এগুলো। অনেক সময় আবার ডাক্তার বা অন্য কোন কর্মকর্তারাও গড়ে তোলেন ক্লিনিক, প্যাথলজী বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কিন্তু তারা যদি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী হন তাহলে মালিকানা পরিবর্তন করে দেখানো হয়। কারও স্ত্রী,কারও মা আবার কারও ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের নামে গড়ে তোলা হয় এসব প্রতিষ্ঠান। অনেকে আবার ব্যবসায়িক পার্টনারের নামেও মালিকানা দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু সব কিছুই যখন ওপেন সিক্রেট হয় তার পরেও ব্যবস্থা নেয়া যায় না অজ্ঞাত হাতের ইশারায়। কোন কোন ডাক্তারের সাথে এ বিষয়ের কথা হলে তারা গর্ব করেই বলেন, চাকরী করলেও প্র্যাকটিস করতে বাধা নেই। কিন্তু মালিকানা অন্যের নামে কেন জানতে চাইলে বিষয়টি এড়িয়ে যান তারা। নগরীর মজিদ স্বরণিস্থ সবচেয়ে বৃহৎ প্রাইভেট ক্লিনিকটির মালিক একজন ডাক্তার। বিদেশী কয়েকটি ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন তিনি। যদিও তার ঐ ডিগ্রী সম্পর্কে রয়েছে নানা বিতর্ক। বিএমডিসি'র অনুমোদন নেই তার কোন কোন ডিগ্রীর। তাছাড়া তিনি কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন না বলেই ক্লিনিকটির মালিকানা রয়েছে তার নামে।

নগরীর কেডিএ এভিনিউস্থ পুরাতন এবং বৃহৎ ক্লিনিকটির মালিক একজন মাছ ব্যবসায়ী। অবশ্য ক্লিনিকটি সফলভাবে পরিচালনা করেন তার চিকিৎসক ভ্রাতা। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, তিনি এক সময় গোপালগঞ্জের কোন একটি ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন। এরপর খুলনায় এসে তিনি এমএলএম (মাল্টি লেবেল মার্কেটিং) ব্যবসা করেন। পরে তিনি শুরু করেন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যবসা। ঐ প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মচারী সম্প্রতি পার্শ্বের একটি দোকান ভাড়া নিয়ে লিখে দিয়েছেন একটি সাইনবোর্ড। রোগী আসলে সার্টার খুলে পরীক্ষা করে আবার বন্ধ রাখা হয়। তাই ঝামেলাও নেই। নগরীর রূপসা এলাকার একটি রাজনৈতিক পরিবারের জনৈক ব্যক্তির মালিকানায় গড়ে উঠেছে বিলাস বহুল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আবার খালিশপুর আলমনগর পালপাড়াস্থ একটি ক্লিনিকের মালিক একজন ঠিকাদার। এভাবে নগরীর রূপসা থেকে শিরোমনি পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকদের সম্পর্কে জানা যায়, তাদের কেউ ব্যবসায়ী, কেউ ঠিকাদার, আবার কেউ রাজনীতিবিদ বা এনজিও কর্মী।

এছাড়া নগরীর বেশ কিছু ক্লিনিকের মালিকানা অন্য নামে থাকলেও মূল মালিক কোন না কোন সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার বা কর্মচারী। এর মধ্যে খুমেক হাসপাতালের সামনের বিশ্বাস ডায়াগনস্টিক

সেন্টারের মালিক হিসেবে কাগজপত্রে দেখানো হয়েছে মিসেস শাহীনুর আক্তার শেফালীকে। কিন্তু এর মূল মালিক তেরখাদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি)। ৪৫, খানজাহান আলী রোডের খুলনা ডায়াগনস্টিকের মালিক ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজিস্ট। ৩১, রায়পাড়া রোডের ক্লিনিকের মালিক খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজিস্ট হলেও দেখানো হয়েছে তার মা মিসেস নুরুন নাহারকে। ৮২, আউটার বাইপাস রোডের এ্যাপেক্স ক্লিনিকের মালিক হিসেবে দেখানো হয়েছে শেখ হাসান বখতিয়ার নামের একজনকে। কিন্তু এর মূল মালিকানার দায়িত্বে রয়েছেন খুমেক হাসপাতাল থেকে সদ্য বদলীকৃত একজন এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তার। খালিশপুর হাউজিং এর ১১০ নম্বর রোডের ২৯ নম্বর বাড়ির মিজানস চিলড্রেন হসপিটালের মূল মালিকের পোস্টিং মংলা বন্দরের একটি সরকারী হাসপাতালে। কিন্তু এর মালিকানা দেখানো হয়েছে ঐ ডাক্তারের স্ত্রীকে। নগরীর ৫৪, জলিল স্বরণির বয়রা ক্লিনিকের মালিকানা হিসেবে এসএম মইনুল ইসলামকে দেখানো হলেও এর মূল মালিক তার মামা। যিনি দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত। নগরীর ১নং সাউথ সেন্ট্রাল রোডের খুলনা প্যাথলজির মালিক খুলনা মেডিকেল কলেজের একজন অধ্যাপক। কিন্তু মালিকানা দেখানো হয়েছে ছেলে এমডি সাজ্জাদ রেজোয়ানকে। ৩৪ নম্বর খান-এ-সবুর রোডের জেএমটিএফ সেবা ক্লিনিকের মূল মালিক রোটারিয়ান মোহাম্মদ শাহীদ হলেও কাগজপত্রে দেখানো হয়েছে তার স্ত্রী ইশরাত জাহানকে। দৌলতপুর পলি ক্লিনিকের মূল মালিক শিরোমনি বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের একজন ডাক্তারের হলেও দেখানো হয় স্ত্রী রুখসানা জেসমিনকে। ৫৯/১, শামছুর রহমান রোডের নূর অর্থোপেডিক্সের মালিক খুলনা মেডিকেল কলেজের অর্থো-সার্জারী বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপকের হলেও দেখানো হয়েছে স্ত্রী সেলিনা আক্তার রুমাকে। ৩৪, লোয়ার যশোর রোডের একটি বেসরকারী হাসপাতালের মালিক একজন সাবেক সরকারী ডাক্তারের হলেও মালিকানা দেখানো হয়েছে স্ত্রী নামে। ৫১, নম্বর লোয়ার যশোর রোডের ফাতেমা রহমান অনকো এন্ড ক্যান্সার সেন্টারের মালিক খুলনা মেডিকেল কলেজের রেডিওথেরাপী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপকের হলেও দেখানো হয়েছে ফেরদৌসী বেগম শিখাকে। ৪৩, নম্বর খানজাহান আলী রোডের মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টারের মালিক খুলনা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজী বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপকের (চলতি দায়িত্ব) হলেও দেখানো হয়েছে স্ত্রী কানিজ আহসানকে। এভাবে খুলনা মহানগরীতে দীর্ঘদিন ধরে নামে বেনামে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে তুলে সেবার কথা বলা হলেও মূলতঃ এর পেছনে নিহিত রয়েছে ব্যবসায়িক মনোভাব। ফলে রেজিস্ট্রেশনের কোন বালাই নেই অনেক প্রতিষ্ঠানেই। আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও এ নিয়ে নেই কোন মাথাব্যথ্যা।

নগরীতে গড়ে উঠেছে রেজিস্ট্রেশনবিহীন ডাক্তার তৈরীর যত্রতত্র কারখানা, প্রতারিত হচ্ছে জনগণ

শুধু ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার নয়, খুলনা মহানগরীতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে অনুমোদনবিহীন ডাক্তার তৈরীর কারখানা। ছয় মাসের কোর্সের মাধ্যমেই এসব প্রতিষ্ঠান উপহার দিতে পারে একজন ডাক্তার। নাম সর্বস্ব সার্টিফিকেটধারী এসব ডাক্তারের অপ-চিকিৎসায় জনসাধারণের জীবন থাকে ঝুঁকির মধ্যে। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় অবৈধ ব্যবসায়ীরা ক্রমান্বয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের অনুমোদনবিহীন বিভিন্ন ডাক্তার তৈরী প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে অনেক স্থানে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছয় মাস বা এক বছরের কোর্স করে ধরিয়ে দেয়া হয় একটি সার্টিফিকেট। এর মধ্যে নগরীর শান্তিধাম মোড়, ময়লাপোতা মোড়, কেডিএ এভিনিউ, শেকপাড়া,দৌলতপুর মহসীন মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড টানিয়ে একটি চক্র চালিয়ে যাচ্ছে এসব অবৈধ ব্যবসা। এসব প্রতিষ্ঠানে খুলনার অনেক নামকরা ডাক্তারকে দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জানানো হয় তাদের প্রতিষ্ঠানে বৈধ। কিন্তু বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে শল্য বিদ্যাসহ চিকিৎসাশাস্ত্র ধাত্রী বিদ্যা, সেবিকাবৃত্তি, ভেষজকর্ম ও ধাত্রী বিদ্যায় কোন পাঠ্যসূচী সংগঠন করতে অথবা প্রশিক্ষণ দিতে এবং সনদপত্র লাইন্সেস, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী প্রদান করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও বিএমএন্ডডিসি জনগণকে সতর্ক করে থাকে। আবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে অবগত করানো হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দীর্ঘদিন ধরে নগরীর উল্লেখযোগ্য স্থানে আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড ব্যানার ঝুলিয়ে চালানো হচ্ছে এসব ব্যবসা। দেয়া হয় শিক্ষা সনদও আর ঐসব শিক্ষা সনদ নিয়ে ডাক্তার নামক কিছু যুবক চালাচ্ছেন ব্যবসা।

ডাক্তারী সার্টিফিকেট থাকায় তাদের দরকার হয় না ড্রাগ লাইসেন্সও তাই ওষুধের ব্যবসাও চালানো সহজ হয়। অবশ্য এগুলো বন্ধের মূল দায়িত্ব যাদের সেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং প্রশাসনের নেই কোন মাথাব্যথা। শোনা যাচ্ছে, এসব অবৈধ ডাক্তার তৈরীর কারখানাগুলো থেকে সংশ্লিষ্টরা মাসোহারা পেয়ে থাকে বলেই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

নাম সর্বস্ব এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব ডিগ্রী দেয়া হয় তা হলো এলএমএএফপি (লোকাল মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট এন্ড ফ্যামিলি প্লানিং) আরএইচএইচসি, এলএমএএফপি (পল্লী চিকিৎসক) পল্লী ডাক্তার এলএফএএফপি (প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট) প্রভৃতি। সূত্র মতে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে থাকে যে, তাদের প্রতিষ্ঠান সরকারী রেজিস্ট্রেশনভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত নয়। কখনও কখনও এসব প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. এম, সাহিদুর রহমান বাবু বলেন, সরকারী রেজিস্ট্রেশনসহ এমন সব আকর্ষণীয় কথা উল্লেখ করে প্রচারণা চালানোর ফলে

জনগণ প্রতিনিয়তই প্রতারিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করছে তা' যথাযথ কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্তও নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নগরীর শান্তিধাম মোড়স্থ একটি প্রতিষ্ঠানের নিবার্হী পরিচালক পূর্বাঞ্চলকে বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রথমে সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে এবং পরবর্তীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে খুলনায় এ প্রতিষ্ঠানটি চলছে। তবে বিএমডিসি থেকে কোন অনুমোদন আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এজন্য বিএমডিসি থেকে অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

খুলনার সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আব্দুল সামাদ মিয়া বলেন, ডাক্তার ও নার্স ট্রেনিং এর জন্য গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন রেজিস্ট্রেশন আছে কি না তা আমার জানা নেই। তবে অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও তিনি জানান। এছাড়া খুলনার একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারী ডিগ্রী সম্বলিত সার্টিফিকেট দিয়ে অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছে বলেও জানা গেছে। এর সাথে জ ড়িত রয়েছেন কিছু এমবিবিএস ডাক্তার এবং ডাক্তারের কাছে থেকে নেয়া হয় পাঁচ বছর কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট। এরপর স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের কাছ থেকে নেয়া হয় আরও পাঁচ বছর এলাকায় ডাক্তারী করার সার্টিফিকেট। ঐ সার্টিফিকেট নেয়ার পর এক সময় বেশ কয়েকজনকে একত্র করে কিছু এমবিবিএস ডাক্তারকে দিয়ে দেয়া হয় প্রশিক্ষণ । ৩০ বা ৬০ দিন প্রশিক্ষণের পর সিভিল সার্জনকে দিয়ে দেয়া হয় সার্টিফিকেট। সমিতির কর্মকর্তা ছাড়াও সিভিল সার্জনের স্বাক্ষর থাকে ঐ সার্টিফিকেটে। আর এভাবেই করা হয় একজন এলএমএএফপি চিকিৎসক। কিন্তু এর কতটুকু বৈধতা আছে তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন।

বোর্ড গঠন হলেও খুমেক হাসপাতালে সার্টিফিকেট ব্যবসা বন্ধ হয়নি, ২২শ' থেকে নেয়া হয় কয়েক হাজার টাকা

সর্বনিম্ন ২২শ' আর সর্বোচ্চ বলে কোন কথা নেই। যার কাছ থেকে যত নিয়ে পারা যায় সেই মোতাবেকই নেয়া হয় টাকা। এটি হচ্ছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্টিফিকেট প্রদানের বাস্তব চিত্র।

হাসপাতালে ইনজুরি সার্টিফিকেটের জন্য সম্প্রতি বোর্ড গঠন করা হলেও তার কোন বালাই নেই। নামে বোর্ড থাকলেও মূলত: কর্মচারীরাই রোগীদের সাথে চুক্তি করে দিয়ে থাকে সার্টিফিকেট। আবার ডাক্তারদের কাছে গেলে বলা হয় থানা বা আদালতে চাহিদাপত্র ছাড়া সার্টিফিকেট দেয়া হয় না। কিন্তু এগুলো কেবলমাত্র এড়িয়ে যাবার কথা বলেও অনেকে মন্তব্য করেন।

গত কয়েক দিনে বিভিন্ন নাম দিয়ে এ প্রতিবেদকের কথা হয় খুমেক হাসপাতালের কয়েকজন কর্মচারীরা সাথে। এরা হলো মুরাদ, নিতাই, হাসান, নিজাম, পরিমল, খলিল ও আলম। সকলের বক্তব্যই প্রায় এই রকম। মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য কেই বলেন দুই হাজার কেউ বলেন আড়াই হাজার কারও বক্তব্য তিন হাজার আবার কেউ বলেন আগে আসুন তারপর দেখা যাবে। তবে বিনা পয়সায় সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইলে জবাব দেয়া হয় 'না'। কিন্তু মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য গঠিত বোর্ডের চেয়ারম্যান ও হাসপাতালের আর, এম, ও ডা. মো. মঈনউদ্দিন মোল্লা বলেন, সার্টিফিকেটের জন্য কোন টাকা নেয়া হয় না। তবে একজন কর্মচারী বললেন, সার্টিফিকেটের জন্য টাকা নেয়া হলেও তাদের পকেটে কিছুই পড়ে না। কোথায় যায় জানতে চাইলে সাফ জবাব 'বোর্ডের সদস্যদের পকেটে'। আর রোগীর কাছ থেকে যদি কিছু নেয়া যায় কেবল সেটিই হয় তাদের পকেট খরচ।

গত ক'দিন আগে কথা হয় হাসপাতালের কর্মচারী পরিমলের সাথে । তার বক্তব্য ছিল এরূপ ৩২৫ ধারার সার্টিফিকেট দেয়া যাবে তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। রোগী ভর্তি না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই জানালেন তিনি। একই দিন কথা হয় অপর কর্মচারী খলিলের সাাথে তার বক্তব্য ছিল মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যেই দেয়া যাবে সার্টিফিকেট। তার চাহিদা ছিল ২২শ' টাকা। কর্মচারী মুরাদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, রোগী ভর্তি না থাকলেও অপর একজনকে রোগী সাজিয়ে ভর্তি করে তারপর সার্টিফিকেট দেয়া যাবে। তবে দরকার হবে তিন হাজার টাকা। কর্মচারী আলম অনেকটা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও আগে রোগীর ধরন বুঝে কত টাকা লাগবে তা দেখা যাবে বলে জানান। কর্মচারী নিতাই রোগীর ছাড়পত্র না থাকলে সার্টিফিকেট হবে না বলে জানানোর পর বলা হয় বহির্বিভাগের একটি স্লিপ আছে। তাহলে হবে জানিয়ে বলা হয়, আসলে স্যারের সাথে আলাপ করে কত লাগবে তা জানাবো। স্যারের সাথে সরাসরি গিয়ে কথা বলা হবে বলেও তিনি জানান। তবে টাকা সবই স্যারকে (ডাক্তারকে) দিতে হবে বলেও তিনি জানান। দুই হাজার টাকা নিয়ে আসলে হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আসুন চেষ্টা করে দেখি হয় কি না। আজ মঙ্গলবার হাসপাতালের ১১/১২ নম্বর ওয়ার্ডে তার ডিউটি আছে বলেও জানানো হয়।অপর কর্মচারী নিজামের সাথেও কথা হয় গতকাল সোমবার সন্ধ্যায়। রোগী ভর্তি ছিল সার্জারী ওয়ার্ডে জানানো হলে বলা হয়, গ্রিবিয়াস সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। সাথে আনতে হবে এক্স-রে ফিল্ম। রিপোর্ট করিয়ে দেয়া হবে বলেও তিনি জানান দেন। সব মিলিয়ে দরকার হবে দুই হাজার টাকা। কর্মচারী হাসানের সাথে কথা হলে তিনি নিজেই স্বীকার করেন, তার গাড়ীর ব্যবসা রয়েছে। তাই তিনি নাও থাকতে পারেন। তবে সার্টিফিকেটের জন্য কোন অসুবিধা হবে না। অন্য লোক আছে তার কাছে আসলেই হবে। তাকে দিয়ে করিয়ে দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। বোর্ড হলেও কোন সমস্যা নেই বলে তিনি জানান। বোর্ডের মাধ্যমে নিলেই ভাল বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক হাজার টাকা হলে হবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, কনফার্ম না তবে আসুন দেখা যাবে।

এভাবে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে চলছে সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা। কর্মচারীদের সামনে রেখে ডাক্তাররা সাজেন দুধের ধোয়া তুলসি পাতা। কিন্তু সার্টিফিকেটের জন্য নেয়া টাকার সিংগভাগই যে ডাক্তারদের দিতে হয় তা কর্মচারীদের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার শৈলদাহ গ্রামের কাজী মনিরুজ্জামান নামের একজন স্কুল শিক্ষকের নামে দেয়া সার্টিফিকেটের জন্য কত টাকা নেয়া হয় তা জানতে সেখানে গেলে বলা হয় সার্টিফিকেটটি তার ভাইয়ের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। তার ভাই রফিকুল ইসলামের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, হাসপাতালের সামেনর জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে সার্টিফিকেটটি নেয়া হয়েছে। তবে কত টাকা দিতে হয়েছে তা তিনি জানতে পারেন নি। অবশ্য - ঐ সার্টিফিকেটে দেয়া রোগীর রেজিঃ নম্বর ৩০৬০/৬। এতে ঐ সার্টিফিকেট নিয়ে পরবর্তীতে ঝামেলার আশংকা করছেন অনেকে।

খুমেক হাসপাতালে এ ধরনের সার্টিফিকেট ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেও কোন প্রতিকার নেই। এর সাথে কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জড়িত থাকলেও তাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসেবে কাজ করছেন হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার সুলতান। কর্মচারীদের মাধ্যমে চুক্তি করে টাকা নিয়ে ওয়ার্ড মাস্টার অথবা কর্মচারীরা নিজেরাই গিয়ে বোর্ডের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন সার্টিফিকেট। তবে ওয়ার্ড মাস্টার সুলতান হোসেন এ বিষয়টি অস্বীকার করেন। টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দেয়া হয় না বলে জানালেন তত্ত্বাবধায়ক ডা. হামে জামাল এবং আর এম ও ডা. মোঃ মঈন উদ্দিন মোল্লা। কিন্তু হাসপাতালের সামনে সার্টিফিকেটের জন্য টাকা নেয়ার বিষয়টি অনেকের কাছেই ওপেন সিক্রেট।

শামসুর রহমান রোডে একটি কক্ষেই একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার, যন্ত্রপাতি নেই, তারপরেও চলছে বহাল তবিয়তে

একটি মাত্র কক্ষ। দু'টি টেবিলের একটিতে টিভি, অপরটিতে একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র। পাশেই একটি খাটে বিছানো রয়েছে বিছানা। এছাড়া অন্যতম কোন যন্ত্রপাতির কোন বালাই নেই। এটি হচ্ছে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচয়। খুলনা মহানগরীর শান্তিধাম মোড় সংলগ্ন শামসুর রহমান রোডে এটি অবস্থিত। সম্প্রতি কোন এক দুপুরে শামসুর রহমান রোডের ঐ ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে দেখা যায়, মালিক মোঃ আঃ রব দুপুরের খাবার কেবল শেষ করলেন খাটে বসেই। পার্শ্বে দাঁড়ানো এক মধ্য বয়সী নারী। সাংবাদিক পরিচয় জানার সাথে সাথেই অনেকটা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন মালিক আঃ রব। চলন্ত টিভিটি বন্ধ করেই প্রশ্ন বলুন কেন আসছেন। আসলাম আপনার প্রতিষ্ঠানটি দেখার জন্য। আচ্ছা এ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? জানতে চাওয়ার সাথে সাথেই ঘুরিয়ে উত্তর ১২ বছর আগে রেজিস্ট্রেশন হয়। বাংলাদেশ ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের সদস্য কি না জানতে চাইলে বলেন, 'আমি সদস্য হতে বাধ্য নই, এসোসিয়েশন আমাকে ট্রেড লাইসেন্স করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেনি, তাই আমি ঐ ব্যক্তি স্বার্থের এসোসিয়েশনের সদস্য হতে যাব কেন'?

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারেরর লাইসেন্স করা হয়েছে ঢাকা থেকে। খুলনাস্থ বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তর থেকে পরিদর্শন না হলে রেজিস্ট্রেশন হয় না উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হয় পরিদর্শন হয়েছে কি না। এতেও তিনি উত্তেজিত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন ? আপনি কি আইন কানুন কিছু জানেন ? এরপর তিনি ১৯৯৬ সালে করা লাইসেন্সটি ড্রয়ার থেকে টেনে বের করে দেখিয়ে বলেন, এই দেখুন রেজিস্ট্রেশনপত্র। প্যাথলজীক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যার লাইসেন্স নম্বর -৪৯৭ । তবে নবায়ন হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বছর নবায়ন হয়নি।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকদের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের পার্সেন্টেস দেয়ার একটি রেওয়াজ খুলনা মহানগরীতে চালু আছে আপনার প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও তা বিদ্যমান কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কোন প্যার্সেন্টেস দেই না তবে আমার নিজস্ব কিছু ডাক্তার আছেন। অবশ্য তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, 'আপনি জানেন যে, ডাক্তারদের পার্সেন্টেস না দিলে ব্যবসা করা যায় না। তাহলে একথাটা আবার জিজ্ঞেস করেন কিভাবে'।

সর্বশেষ ঐ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক বলেন, এখানে কোন প্যাথলজীর রিপোর্ট করি না, শুধুমাত্র ভ্যাকসিন দেই। হেপাটাইটিস বি, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা ইত্যাদি কাজ এখানে করা হয় বলেও তিনি জানান। কিন্তু প্যাথলজির রেজিস্ট্রেশন করার পরও শুধুমাত্র ভ্যাকসিন দেয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুঁজির অভাবে যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না তাই শুধুমাত্র রক্ত পরীক্ষা আর ভ্যাকসিনের উপরই চলছে।

এভাবে নগরীর বিভিন্ন স্থানে নাম কাওয়াস্তে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালানো হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। এসব প্রতিষ্ঠান অনেক সময় রিপোর্ট দিয়ে জনগণকে প্রতারিত

করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করা হয় নিরীহ জনগণকে। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ম মোতাবেক কোন প্রতিষ্ঠান শুরু করতে গেলে আগেই সকল প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রথমে যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না এসব দেখার পর খুলনাস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রিপার্ট দেয়ার পরই কেবল রেজিস্ট্রেশন হবার কথা। অথচ এ ধরনের নামসর্বস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বেলায় কি ধরনের পরিদর্শন হয়েছে সেটিই এখন প্রশ্নের বিষয়। খুলনার বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মোঃ ফজলুল করিম বলেন, কখন কিভাবে এসব ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে তা দেখতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ের একটি প্যাথলজী পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের দেখামাত্রই প্যাথলজীটি বন্ধ করে মালিক পালিয়ে যায়। তবে তার ব্যাপারে আর কিছু করার নেই কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, মালিককে ধরার চেষ্টা চলছে। ধরার পর কি করা যায় দেখা যাবে। অবশ্য জনবল সংকটের সুযোগ নিয়ে অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের নামের দীর্ঘ তালিকা, মূল কর্মস্থল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

ক্লিনিক একটি, কিন্তু ডাক্তার প্রায় অর্ধশত। যা নেই অনেক সরকারী হাসপাতালেও। আবার সরকারী হাসপাতালে নামের সিরিয়াল দিয়ে বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড না থাকলেও প্রাইভেট ক্লিনিকের বেলায় চোখে পড়ে দৃষ্টিনন্দন সাইনবোর্ড। বড় বড় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগী দেখেন তাই এখানেই যেতে হবে' রোগীদের মধ্যে এ মানসিকতা সৃষ্টি করতেই ক্লিনিকগুলোতে সাইনবোর্ডের সমাহার দেখা যায় বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু নগরীর প্রাইভেট ক্লিনিকের সাইনবোর্ডে সরকারী হাসপাতালের যেসব ডাক্তারের নাম দেখা যায় তাদেরকে ঐ ডাক্তারের মূল কর্মস্থল সরকারী হাসপাতালে দেখা না গেলেও পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট ক্লিনিকে।

নগরীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোর সামনে দেখা গেছে দৃষ্টি নন্দন সাইনবোর্ড হাসপাতাল হলেও প্রাইভেট ক্লিনিকের প্র্যাকটিসকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। অনেক সময় সরকারী কোন কোন ডাক্তারের নাম রয়েছে একাধিক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ তাদের মূল কর্মস্থল সরকারী হাসপাতালের রোগীদের অবহেলার পাত্র হিসেবে দেখা হলেও ঐ একই রোগী প্রাইভেট ক্লিনিকে গেলে দেখা হয় গুরুত্বের সাথে। অথচ রোগী ও ডাক্তার সবই এক কিন্তু ভিন্ন শুধুমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রটি।

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের সাথে কথা বললে বেরিয়ে আসে বাস্তবতার নানা চিত্র। এ দু'টি সরকারী হাসপাতালের অনেক ডাক্তার বিরক্ত হয়ে রোগীদের বলে থাকেন এখানে কেন আসছেন অমুক হাসপাতাল/ক্লিনিকে যেতে পারেন না? অর্থাৎ ঐ ডাক্তার নিজেই বলে দিচ্ছেন সরকারি হাসপাতাল চিকিৎসার জন্য নয়, সেটি হচ্ছে রোগী ধরার জন্য। কিন্তু তিনি বেতন নিচ্ছেন সরকারি হাসপাতাল থেকেই। আবার কয়েকজন রোগী এ প্রতিবেদককে বললেন , সরকারী নিয়ম মোতাবেক সকাল নয়টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত অফিস সময় থাকলেও এ দু'টি হাসপাতালে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র । হাসপাতাল দু'টিতে ১১টার পর শুরু হয় রাউন্ড। চলে ঘণ্টাখানেক কোন কোন ওয়ার্ডে আধা ঘণ্টায়ও শেষ হয়ে যায় রাউন্ডের কাজটি।এরপর আর ঐ ডাক্তারের খোঁজ থাকে না। স্ব-স্ব হাসপাতালে প্রতিটি ডাক্তারের চেম্বার থাকলেও রাউন্ডের পর সেখানে বসেন শুধুমাত্র ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার জন্য। তাদের সাথে কথা বলার পর খুব কম ডাক্তারই আছেন যাদেরকে নিজ কক্ষে দেখা যায়। বিশেষ করে যারা বাইরের ক্লিনিকগুলোতে ডিউটি করেন সরকারী হাসপাতালে তাদের দেখা পাওয়া খুবই কঠিন। অনেকে আবার বিশেষ বিশেষ সময়ই গিয়ে থাকেন সরকারী হাসপাতালে। বিশেষ করে যাদের রাউন্ডের প্রয়োজন হয় না এ ধরনের ডাক্তারদের খুঁজে পাওয়া যায় না সরকারী হাসপাতালে। গতকাল বুধবার দুপুরে যখন অফিস টাইম চলছিল তখন খুমেক হাসপাতালের একজন এ্যানেসথেসিয়া ডাক্তার ছিলেন পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিক কাম ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অপারেশন থিয়েটারে। খুলনা জেনারেল হাসপাতালের গাইনীসহ অনেক স্পর্শকাতর বিভাগ অনেক সময় দেখা যায় অরক্ষিত। কখনও কখনও শুধুমাত্র নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়া দিয়েই চলে সরকারী হাসপাতালের কার্যক্রম। ফলে রোগীদের যেমন ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয় তেমনি কে ডাক্তার আর কে ওয়ার্ড বয়, আয়া তা বুঝে ওঠাও হয়ে পড়ে কঠিন।

এভাবেই নগরীর সরকারী হাসপাতালের রোগীদের বঞ্চিত করে প্রাইভেট ক্লিনিকে ডিউটি করার প্রবণতা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। কখনও দেখা যায়, খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিক ঘুরে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ডাক্তারের নামের তালিকা রয়েছে কেডিএ এভিনিউস্থ একটি প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। ঐ ক্লিনিকে ভর্তিকালীন রোগীর সেবা দেয়ার জন্য ৮ জন, ক্লিনিক চেম্বারে ১১জন এবং ভর্তিকালীন কল বেসিসে ২৩ জন ডাক্তারের নামের তালিকা রয়েছে । এর মধ্যে অধিকাংশ ডাক্তারই খুমেক ও জেনারেল হাসপাতালের।নগরীর সোনাডাঙ্গাস্থ খুলনা মেডিকেল কলেজ পাশ্ববর্তী একটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রয়েছে ২৩ জন ডাক্তারের নামের তালিকা। এর মধ্যে খুমেক হাসপাতালেরই ১৬ জন। তবে খুমেক হাসপাতালে প্রেষণে কর্মরত জনৈক ডাক্তারের সম্প্রতি বদলী আদেশ হয়েছে। তিনি ঐ ক্লিনিকের নেপথ্য মালিক বলেও কথিত রয়েছে। মজিদ স্মরণীস্থ একটি বৃহৎ প্রাইভেট ক্লিনিকেও রয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও খুলনার বাইরের সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের নাম। বয়রার একটি বেসরকারী হাসপাতাল ও তার শেখপাড়াস্থ কনসালটেশন সেন্টারের ডাক্তারের সংখ্যা দেখা গেছে ২৩ জন। এর মধ্যেও অধিকাংশ খুমেক হাসপাতালের। একই অবস্থা শেখপাড়ার কেডিএ এভিনিউস্থ অপর একটি নব প্রতিষ্ঠিত মেমোরিয়াল ক্লিনিক, একই রোডের একটি ইমেজিং সেন্টার ও জেনারেল হাসপাতাল এবং তারের পুকুর এলাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের।

অবশ্য এসব প্রাইভেট ক্লিনিকের কোন কোনটিতে দেখা গেছে, একজন ডাক্তারের নাম কয়েক বছর আগে লেখা হলেও পরে তা আর মুছে ফেলা হয়নি। দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার খুমেক বা জেনারেল হাসপাতাল থেকে অনেক আগেই বদলী হয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরেও বছরের পর বছর সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ঐ ডাক্তাররের নামটি শোভা পাচ্ছে খুমেক বা জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে। এমনটি দেখা যায় নগরীর তারের পুকুরে সংলগ্ন একটি ক্লিনিকে।

এভাবে খুলনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরে চরম অব্যবস্থাপনা চললেও নেই কোন প্রতিকার। এগুলো দেখার দায়িত্ব কার সেটিই এখন প্রশ্নের বিষয়। অবশ্য এসব দেখার পরিবর্তে খুলনার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা ব্যস্ত থাকেন বিভিন্ন দিবস পালন আর অফিসিয়াল সফর বাণিজ্য নিয়ে। এমনকি স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যাপারে কোন সংবাদ প্রকাশ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। গত মাসের ২২ তারিখ থেকে দৈনিক পূর্বাঞ্চলে স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় খুলনার সাধারণ জনগণ এবং ভুক্তভোগীদের মধ্যে আলোড়েন সৃষ্টি হলেও পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মোঃ ফজলুল করিম পত্রিকা পড়ার সময় পান না বলে জানান।

এক কোটি টাকা ব্যয় হলেও সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, রোগীদের দুর্ভোগ বাড়ছেই

এক কোটি টাকার উন্নয়ন হলেও অনেক স্থানই রয়েছে সংস্কারবিহীন। বারান্দার মোজাইক খসে পড়েছে, বাথরুমের কলের পানি পড়ছে দিন-রাত আর ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে যেখানে-সেখানে। এ চিত্র এখনও বিরাজ করছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সম্প্রতি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ট্রলিতে করে রোগী নেয়ার সময় উহ্ আহ্ করে কাতরাচ্ছিলেন এক রোগী। দোতলার মেডিসিন ইউনিট-২ এ ভর্তির পর জরুরী বিভাগ থেকে ওয়ার্ডে নেয়ার সময় দোতলার বারান্দায় ঐ রোগীটি এভাবে কাতরাচ্ছিলেন। এর কারণ হচ্ছে হাসপাতালের বারান্দার মোজাইক খসে উঠে যাওয়া। ট্রলি যখন ভাঙ্গা জায়গা থেকে টেনে নেয়া হচ্ছিল তখন রোগীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। দেখা যায়, বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে বারান্দায়। অনেক সময় বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রাতে চলাচল করতে গিয়ে রোগীর ভিজিটররা পড়ে গিয়ে আহত হন এমন কথাও বললেন অনেকে। কিন্তু সংস্কার নেই। যদিও সম্প্রতি খুমেক হাসপাতালে এক কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু তার ছোঁয়া লাগেনি এখানে।

শুধু বারান্দাই নয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপতালের অনেক স্থানেই দেখা যায় নোংরা পরিবেশের বাস্তব চিত্র। বাথরুমের পানি পড়ছে একাধারে, ওয়ার্ডের পার্শ্বেই ফেলা হয় ময়লা-আবর্জনা, কেবিনে পরিবেশ না থাকায় রোগীর নামে বরাদ্দ হলেও তা না নেয়ার মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। হাসপাতালে রয়েছে ওয়াডবয়/আয়া। কিন্তু বাথরুম পরিষ্কারের লোক পাওয়া যায় না। খুলনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সৈয়দ মোঃ ইলিয়াস সম্প্রতি এ প্রতিবেদকের সামনেই বলছিলেন, মালিরা থাকে কর্মকর্তাদের মত। অপরিষ্কার থাকার কারণে বাগানে হাটা চলা করা যায় না। এ অবস্থা চলছে হাসপাতাল ও কলেজে। অথচ প্রতি বছরই হচ্ছে কোটি কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ। অবশ্য সম্প্রতি খুমেক হাসপাতালে চলছে প্রলেপ দেয়ার কাজ। যা দেখে অনেকেই মন্তব্য করে বলছেন, মোজাইকের স্থলে শুধুমাত্র সিমেন্ট-বালি দিয়ে প্রলেপ দেয়ার অর্থই হতে পারে নিরর্থক।

সূত্র মতে, খুমেক হাসপাতালের বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের জন্য সম্প্রতি চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু তা থেকে প্রয়োজনীয় মালামাল না কিনে কেনা হচ্ছে এম, আর, আই মেশিন। অবশ্য এখানে নেই সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। তাছাড়া একটি এম, আর, আই মেশিনের দামই প্রায় তিন কোটি টাকা। বাকী এক কোটি টাকা দিয়ে সামান্য কিছু মালামাল কিনেই টাকা শেষ করার চক্রান্ত চলছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এম, আর, আই মেশিন নষ্ট হলে তার পার্টস এ দেশে পাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে তিন কোটি টাকা মূল্যের এ মেশিনটি পড়ে থাকার সম্ভাবনা বেশী। কেননা যেখানে সামান্য পয়সা খরচের অভাবেই হাসপাতালের এক্স-রে মেশিনগুলো থাকে প্রায়ই বন্ধ। ফলে রোগীদের বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হয়। খুমেক হাসপাতালে চারটি এক্স-রে মেশিন থাকলেও বর্তমানে একটি মাত্র চালু রয়েছে বলে একটি সূত্র জানায়। তাছাড়া ঐ বিভাগে কর্মরত তিনজন টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি) থাকলেও তারা সকলেই ডিউটি করেন নগরীর কেডিও এভিনিউস্থ একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে যদিও নিয়ম রয়েছে তিনজনের ২৪ ঘণ্টাই ডিউটি করার। শুধুমাত্র সকাল থেকে দুপুর

পর্যন্ত এক্স-রে বিভাগ খোলা থাকলেও বাকী অধিকাংশ সময়ই থাকে বন্ধ। এ অভিযোগ হাসপাতালের রোগীদের। এমনকি সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়েও দেখা যায় এ দৃশ্য। খুমেক হাসপাতালে চার কোটি টাকা বরাদ্দ এবং তা থেকে এম, আর, আই মেশিন ক্রয়ের ব্যাপারে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হামে জামাল বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ভান্ডারের তত্ত্বাবধানেই এ মালামাল কেনা হচ্ছে, তবে আমি এ মেশিন ক্রয়ের বিরোধী।

এভাবে কোটি কোটি টাকার কাজ হলেও তার বাস্তবতা দেখা যায় ভিন্ন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। যে কারণে হাসপাতাল থেকে ওষুধ পাচার, কাজ না করে ঠিকাদারের বিল গ্রহণ, সিডিউল অনুযায়ী মালামাল না দিয়ে কম মূল্যের মালামাল প্রদানসহ নানা ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়।

ইউনানী ও হার্বাল চিকিৎসার নামে জনগণের সাথে প্রতারণার ব্যবসা, কোন নিয়ম-নীতির বালাই নেই

চিকিৎসা সেবায় নতুন সংযোজন হয়েছে পুরাতন পদ্ধতি হারবাল। গত কয়েক বছর ধরে এটির প্রচলন বেড়েছে বাংলাদেশে। তাই খুলনা মহানগরীতেও এ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের কারণে জনগণ নিয়মিত প্রতারিত হচ্ছে। পাশাপাশি বেড়ে যাচ্ছে অনৈতিক কর্মকাণ্ড।

নগরীর রূপসা পিটিআই মোড়, ময়লাপোতা, শান্তিধাম মোড়, রয়্যাল চত্বর, দৌলতপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ইউনানী, আয়ুর্বেদীও হারবাল দাওয়াখানার নামে চলছে প্রতিযোগিতা। ডাক্তার বা কবিরাজের নামের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের নামের বৃহৎ সাইনবোর্ড টানিয়ে রোগীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। যা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের বিধি বহির্ভূত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে ওষুধ বিক্রি হলেও অধিকাংশেরই নেই কোন ড্রাগ লাইসেন্স। এ প্রসঙ্গে খুলনার ড্রাগ সুপার মোঃ শহীদুল ইসলাম বলেন, আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান ওষুধ বিক্রি করায় কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা। যেহেতু ডাক্তার বা হাকিম নিজেই রোগী দেখেন সেহেতু তারা ওষুধ বিক্রি করছে অনায়াসে।

এদিকে বিধি অনুযায়ী 'বি' ক্যাটাগরীর হাকিমদের ফি না নেয়ার কথা থাকলেও খুলনার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের হাকিমই ১০০-২০০ টাকা করে ফি নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ খুলনায় একজন মাত্র 'এ' ক্যাটাগরীর হাকিম রয়েছে। কিন্তু বাকীরা কিভাবে এত ফি নিচ্ছেন সেটিই এখন প্রশ্নের বিষয়। এভাবে চমকপ্রদ সাইনবোর্ড-ব্যানার ঝুলিয়ে লোভনীয় বক্তব্য দিয়ে খুলনার কয়েকটি হার্বাল প্রতিষ্ঠান মাসে ১০/১২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলেও অনুসন্ধানে জানা যায়। চমকপ্রদ বক্তব্য ও গ্যারান্টিতে

আকৃষ্ট হয়ে যুব সমাজ ঝুঁকে পড়ছে এসব প্রতিষ্ঠানের দিকে। সেই সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের ওষুধ সেবনে কেউ অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নগরীর বেশ কিছু আবাসিক হোটেলের সাথে রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ। যেসব হোটেলে অনৈতিক কর্মকান্ড চলে সেসব স্থানে সরবরাহ করা হয় উত্তেজনাকর হার্বাল ওষুধ। নগরীর কিছু ক্লিনিক ও নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের সাথেও এসব হার্বাল প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রয়েছে। নার্স ট্রেনিং-এর নামে কোন কোন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অনৈতিক কর্মকান্ড চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নগরীর শান্তিধাম মোড় এলাকার একটি নার্সিং হোমের মালিক একটি অপহরণ মামলার আসামি বলেও জানা যায়।

হার্বাল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সমিতি, এ্যাসোসিয়েশন, সোসাইটি ইত্যাদি পরিচয়ে গজিয়ে উঠেছে কিছু প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান সরলমনা মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় এবং সনদ বিতরণের নামে নানা কৌশলে প্রতারণা করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই কোন রেজিস্ট্রেশন নেই বলে জানা যায়। ফলে হারবাল চিকিৎসা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেম অব মেডিসিনের রেজিস্ট্রার/সচিব প্রদত্ত এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ''সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী/আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রদ্বয়ের শিক্ষাদান ও সনদ প্রদান, বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করে প্রতারণামূলক চিকিৎসা ব্যবসা করা, চিকিৎসার নামে গ্যারান্টি দেয়া, রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত চিকিৎসা কাজ চালিয়ে যাওয়া, বিনা অনুমতিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা ইত্যাদি কাজ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের অনুসরণীয় নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩-এর কতিপয় ধারার সুস্পষ্ট লংঘন''। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বর্ণিত ধারাসমূহের জন্য ক্ষেত্র মতে চিকিৎসা রেজিস্ট্রেশন বাতিল ছাড়াও অর্ডিন্যান্স এর সেকশন ৩১ ও ৩২ এর অধীন জেল জরিমানার বিধান রয়েছে। কিন্তু খুলনায় এসব প্রতিষ্ঠান দাপটের সাথে চললেও প্রশাসনের পক্ষে থেকে কোন প্রকার ব্যবস্থা না নেয়ায় জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই এসব প্রতিষ্ঠান চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

খুলনা ইউনানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হাকিম মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন, নগরীর কিছু কিছু ইউনানী ও আয়ুর্বেদী প্রতিষ্ঠান আইনের সুস্পষ্ট লংঘন করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

খুলনার সিংহভাগ ডাক্তারের দুর্ব্যবহারের কারণে রোগীরা পাড়ি জমাচ্ছেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে

গুটি কয়েকজন ছাড়া সিংহভাগ ডাক্তারই রোগীদের সাথে করে থাকেন দুর্ব্যবহার। ফলে খুলনাঞ্চলের রোগীরা পাড়ি জমাচ্ছেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এদিকে খুলনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হালচিত্র নিয়ে বিগত প্রায় এক মাস ধরে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ হলেও ডাক্তারদের মধ্যে নেই কোন প্রতিক্রিয়া। অনেকে দাম্ভিকতার সাথে বলছেন, এসব লেখালেখিতে তাদের কিছুই হয় না। তাদের এ ধরনের মন্তব্যে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে, ডাক্তাররা কি তাহলে আইনের উর্দ্ধে ? অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব নেই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের কাছে।

খুলনা মহানগরীর সরকারী হাসপাতালের মধ্যে রয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা জেনারেল হাসপাতাল, মিরেরডাঙ্গা আইডি হাসপতাল, যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং নগরীর নিউ মার্কেট সংলগ্ন বক্ষব্যাধি ক্লিনিক। এসব হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে নানা দৃশ্য। রোগীদের সাথে শুধু ডাক্তারই নয় নার্স-কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারও অনেককে ব্যথিত করে। রোগীর কোন লোক দেখা মাত্রই অনেক ডাক্তার যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তাদের কক্ষে যেমন প্রবেশ করে কোন কথা জানতে চাওয়াকে কোন কোন ডাক্তার রীতিমতো অপরাধ মনে করেন, তেমনি ওয়ার্ডের অনেক ইন্টার্নী ডাক্তারদের বেলায়ও চলছে তেমনটি। গুটি কয়েক ছাড়া সিংহভাগের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এ দৃশ্য। অবশ্য সরকারী হাসপাতালের রোগীদের ক্ষেত্রে এ দৃশ্য দেখা গেলেও একই রোগীর ক্ষেত্রে বেসরকারী ক্লিনিকের বেলায় দেখা যায়না বলেও অনেকে অভিযোগ করেন। এর কারণ হিসেবে অনেকে মন্তব্য করে বলেছেন, টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নেয়ার কারণে ঐসব রোগীদের যে কোন কথা ডাক্তারদের শুনতে হবে, কিন্তু বিনা পয়সায় চিকিৎসা নেয়া সরকারী হাসপাতালের রোগীদের ক্ষেত্রে তেমনটি হবে কেন ?

অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে ডাক্তার, নার্স-কর্মচারীদের ব্যবহারেই অনেক রোগীর রোগ অনেকটা ভাল হয়ে যায় বলেও অনেকে মন্তব্য করে বলেন, ভারতের ডাক্তাররা রোগীর সাথে ভাল ব্যবহারকেই ক্রেডিট মনে করেন। আর বাংলাদেশ বা খুলনায় তার ঠিক বিপরীত। যে কারণে খুলনায় যে পয়সা দিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে হবে তার চেয়ে একটু বেশি পয়সা খরচ করেই অনেকে ভারতে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে আসেন।

ভারত ফেরত অনেক রোগীর সাথে কথা হলে তারা এ প্রতিবেদককে জানান, খুলনার সরকারী হাসপাতাল বা অন্য কোন ক্লিনিকের ডাক্তারদের রূঢ় আচারণের চেয়ে ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানো অনেক ভাল। কেননা তাদের ব্যবহারই রোগীকে মুগ্ধ করে।

অপরদিকে গত ২২ নভেম্বর থেকে দৈনিক পূর্বাঞ্চলে খুলনার স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর কোন কোন ডাক্তার অনেকের কাছে মন্তব্য করে বলেছেন, এসব লেখালেখিতে তাদের কিছুই হয় না। সরকারি হাসপাতালের চাকরীর পাশাপাশি তারা একদিকে যেমন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করবেন তেমনি কেউ কেউ হবেন ক্লিনিকের মালিক। এ ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই বলেও অনেকে দম্ভ করেন। আবার সরকারী হাসপাতালের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীও ডিউটি ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ডিউটি করবেন। এটিও অনেকটা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। খুলনার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের ব্যাপারে যেমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা নেই তেমনি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলে শুরু হয় আন্দোলন। আবার নার্সদের বেলায় ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (নার্স) এর। ফলে ঢাকা থেকে খুলনার নার্সদের নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কঠিন ব্যাপার তেমনি কোন ব্যবস্থা নেয়া হলেও পরে তদ্বির করে তা ঠেকানো হয়। খুলনার বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মোঃ ফজলুল করিম বলেন, লোকবলের অভাবে তিনি কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। তবে লোকবলের ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবর লেখালেখি হচ্ছে কি না জানতে চাইলে তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে দেন। খুলনার সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আব্দুস সামাদ মিয়া বলেন, সব কিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে যেগুলোর ব্যাপারে সম্ভব সেগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্যাথলজিস্ট ছাড়াই চলছে নগরীর অনেক ডায়াগনস্টিক সেন্টার, রিপোর্ট লেখেন কর্মচারীরা, হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা

কোন প্রকার প্যাথলজিস্ট ছাড়াই চলছে খুলনা মহানগরীর অধিকাংশ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ক্লিনিকের ডাক্তার অথবা টেকনিশিয়ান নন-টেকনিশিয়ান লোক দিয়েই বিভিন্ন পরীক্ষার নামমাত্র রিপোর্ট লিখে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। আর এসব রিপোর্ট নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে রোগীরা। কোন কোন ক্লিনিকে প্যাথলজিক্যাল কোন যন্ত্রপাতি না থাকায় বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনার ঘটনাও ঘটছে। খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে এ ধরনের বেশ কিছু ক্লিনিক কাম ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠছে গত কয়েক বছর ধরে। কিন্তু প্রশাসনের কোন নজর নেই এদিকে। শ্রমিক নির্ভর হওয়ায় ঐ এলাকায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও চলছে অপারেশনে বা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। চুক্তি ভিত্তিক হচ্ছে অপারেশন।

খালিশপুর পুরাতন যশোর রোডের একটি ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স রোববার দুপুরে গিয়ে দেখা যায় দোতলা বাড়ির নিচ তলায় সেটি অবস্থিত। হাউজিং এস্টেটের ১৮ নম্বর রোডের ১১ নম্বর ঐ দোতলা বাড়ির নিচ তলায়ই ক্লিনিকটি অবস্থিত। মাত্র পাঁচটি কক্ষের একটিতে ওয়ার্ড, দু'টিতে কেবিন, একটিতে অপারেশন থিয়েটার এবং একটি হচ্ছে ডাক্তারের চেম্বার। সামনে রিসিপশনে টিভি দেখছিল কয়েক যুবক। ক্লিনিক সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলেই বলা হয় পিছনে যান। ঘুরে পিছনে যাওয়ার পথে দেখা যায়, নারী পুরুষের কাপড়-চোপড় নাড়া রয়েছে পাশ্বেই । অর্থাৎ এটি যে একটি ক্লিনিক তা বোঝাই যায় না। একটু সামনে গিয়েই দেখা যায়, দো'তলার উপরে রয়েছে একজন ডাক্তারের সাইনবোর্ড। কিন্তু সেখানে ঐ ডাক্তারকে না পেয়ে ডান পাশের ভিতরে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি রুমেই রয়েছে রোগী। এ্যাপেন্ডিসাইড জনৈক রোগীর সাথে কথা বলতেই তিনি বলেন, দু'হাজার টাকার বিনিময়ে শনিবার তার অপারেশন হয়েছে। রিসিপশনে পরিচয়টি দিয়ে ডাক্তারের সাথে দেখা করতে চাইলে পার্শ্বে একটি কক্ষে মহিলা ডাক্তার লেখা এ্যারো চিহ্নের দিকে যেতে বলা হয়। কিন্তু গিয়ে সেখানে কোন মহিলা ডাক্তার না পেয়ে দেখা গেল দোতলার সাইনবোর্ড লেখা সেই ডাক্তারই বসা। যিনি ঐ ক্লিনিকের মালিক। কথা শেষে বের হবার সময় ক্লিনিক নামের ঐ বাড়ির বিভিন্ন দেয়ালে দেখা যায় লাল রংয়ে নানা ধরনের লেখা। এর মধ্যে রয়েছে মহিলা ওয়ার্ড, কেবিন, অপারেশন থিয়েটার, আল্ট্রাসনোগ্রাম প্রভৃতি। আবার সামনের রিসিপশনে লেখা রয়েছে এখানে ঔষধ পাওয়া যায়। ক্লিনিকটি পরিদর্শনের সময় যেসব লেখা দেখা যায়, তার সাথে বাস্তবের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানে যেমন নেই আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন তেমনি নেই অন্যান্য প্যাথলজিক্যাল যন্ত্রপাতিও। ওষুধের কথা লেখা থাকলেও এ প্রতিবেদকের সাথে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। বলা হয়, এখানে জরুরী ভিত্তিতে যেসব ওষুধ দরকার সেগুলোই পাওয়া যায়। তবে ড্রাগ লাইসেন্স না থাকার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এমনটি বলা হয়েছে বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। তাছাড়া জরুরী রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ আছে বলা হলেও এ প্রতিদেকের উপস্থিতিতেই বেলা ২টার দিকে মাথায় আঘাত পাওয়া এক রোগী আসলে তার জন্য শুধুমাত্র একটি টিটেনাস ইনজেকশন, কিছু গজ ও ব্যান্ডেজ আনতে যেতে হয়েছে পার্শ্বের খালিশপুর ক্লিনিকের সামনের ওষুধের দোকানে।

আবার ঐ রোগীটিকে ওটিতে না নিয়ে ওয়ার্ডের একটি বেডে শুইয়ে দিয়েই একজন কর্মচারী কোন রকমে ব্যান্ডেজ করে দেন। অথচ সামনেই লেখা রয়েছে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। এ প্রসঙ্গে এলাকার জনৈক ব্যক্তি বলেন, ২৪ ঘন্টা পাওয়া যাবে না। নার্স-কর্মচারীরাই জরুরী রোগীদের দেখাশোনা করেন। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটে বলেও মন্তব্য করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, হাউজিং এস্টেটের ঐ ক্লিনিকটির মালিক খুলনা মিরেরডাঙ্গাস্থ আইডি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। যিনি সম্প্রতি একটি মামলায় হাজত বাস করে বের হয়েছেন। ক্লিনিকটির নামের সাথে পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকের হুবহু মিল রয়েছে। শুধুমাত্র প্রথমে নিউ কথাটি যুক্ত করেই ক্লিনিকটির নামকরণ করা হয়েছে। ক্লিনিকটির কোন রেজিস্ট্রেশন নেই বলে স্বীকার করলেন মালিক নিজেই। তিনি বলেন, রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাগজপত্র জমা দেয়া হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পরিদর্শন করা হয়নি।

ক্লিনিকের একমাত্র ডাক্তার একটি সরকারী হাসপাতালে চাকরী করলেও অন্য কোন ডাক্তার নেই সেখানে। অর্থাৎ সরকারী হাসপাতালে শুধুমাত্র স্বাক্ষর করে চলে আসেন নিজের প্রতিষ্ঠানে। মাঝে মধ্যে অপারেশনের সময় কলিং বেসিসে আনা হয় ডাক্তার। আর কতিপয় নার্স-কর্মচারী দিয়েই চলছে ক্লিনিকটি।

আবার ক্লিনিকটির ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এক্স-রে, আল্ট্রাসনোসহ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা করা হয় বলে প্রচার করা হলেও দেখা যায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো হয়। জনৈক রোগীর এক্স-রে ফিল্মে প্যাকেট দেয়া ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ০১৭১১-৯৪২৬০৬ নম্বর মোবাইলে রিং করে দেখা যায় সেটি অন্য একটি ডায়াগস্টিক সেন্টারের মালিকের। ঐ মোবাইলটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকের বলে জানা যায়। অর্থাৎ ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানটি ঠিক রাখা হচ্ছে। যদিও খুমেক হাসপাতালের সামেনর ঐ প্রতিষ্ঠানটিরও নেই কোন রেজিস্ট্রেশন।

এভাবে নগরীর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে নামসর্বস্ব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। যার নেই কোন সরকারী অনুমোদন আর নিজস্ব ডাক্তার ও প্যাথলজী। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা প্যাথলজিস্ট সেজে রিপোর্ট লিখে দেন। এতে সঠিক রিপোর্টের পরিবর্তে দেখা দেয় হিতে বিপরীত। যা' রোগীদেরকে ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিতে পারে বলেও আশংকা করছেন অনেকে। কিন্তু এসব ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন তা জানে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য বিভাগই।

মধুপুরের বিভিন্ন ব্যাংক, সাব-রেজিস্টার অফিস ও ভূমি অফিস কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে জালিয়াতির সিন্ডিকেট

প্রতিবেদন
মধুপুরের বিভিন্ন ব্যাংক,
সাব-রেজিস্টার অফিস ও ভূমি
অফিস কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে
জালিয়াতির সিন্ডিকেট

প্রতিবেদক
আনোয়ার সাদাৎ ইমরান

প্রকাশের তারিখ
২৯ অক্টোবর ২০০৭

সংবাদপত্র
দৈনিক প্রগতির আলো

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক প্রগতির আলো
নির্বাহী সম্পাদক ও প্রকাশক
টাঙ্গাইল

মধুপুরের বিভিন্ন ব্যাংক, সাব-রেজিস্টার অফিস ও ভূমি অফিস কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে জালিয়াতির সিন্ডিকেট

ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে মহ-পরিচালক পর্যন্ত স্বাক্ষর জাল করে চলছে অফিসিয়াল কাজকর্ম

মধুপুরের সরকারী ব্যাংক, সাব-রেজিস্টার অফিস ও ভূমি অফিস কেন্দ্রীক এক শক্তিশালী জালিয়াতির সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এই সিন্ডিকেট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে মহাপরিচালক পর্যন্ত স্বাক্ষর, সীল জাল করে অফিসিয়াল কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশী জালিয়াতি চলছে জমির দলিল, পর্চা, আরওআর সিএস এর কাগজ পত্র তৈরীর ক্ষেত্রে। মধুপুরের ব্যাংকগুলো থেকে লোন তোলার ক্ষেত্রে ঐ জাল কাগজ পত্রগুলোর ব্যবহার হচ্ছে বেশী। অপরদিকে সাব রেজিস্টার অফিসে জাল কাগজপত্র দিয়ে একজনের জমি আরেক জনের নামে দলিল করে দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটছে। এমনকি সাব রেজিস্টার অফিসের দলিল লেখক লাইসেন্স তৈরী করছে মহা পরিচালকের স্বাক্ষর অনুন্ধানে জানা যায়, মধুপুর সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সাবরেজিস্ট্রারের জ্ঞাতসারেই ছামাদ ভেন্ডারের (লাইসেন্স নং ২৮২) নেতৃত্বে ঐ জালিয়াতি চক্রটি দলিল, পর্চা, আরওআর সিএস এর ভুয়া কাগজ পত্র দিয়ে ভূমি রেজিস্ট্রির কাজ চালাচ্ছে। অতীতের কয়েকবার জালিয়াত চক্রের সদস্য আশ্রা গ্রামের মোঃ আব্দুল আজীজ, দিগরবাইদ গ্রামের মোঃ সাইফুল ইসলামসহ কয়েকজন ব্যক্তি আর কোনদিন জালিয়াতির মত জঘন্য কাজ করবেনা বলে মুচলেকা দেয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ না নেওয়ার এবং সাবরেজিস্টার সহ কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ চক্রটিকে আরো সহযোগিতা করায় তারা বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা ভূয়া আর ও আর, সিএস, পর্চা, হাল জরিপের মাঠ পর্চা, এমনকি সহকারী জমিশনার (ম্যাজিস্ট্রেট) এর স্বাক্ষর জাল করে জমির মালিকের নামের খারিজ পর্যন্ত করা শুরু করে।

এমনই একটি খারিজের কাগজ সরবরাহ করা হয়েছে মির্জাবাড়ী ইউনিয়নের হাসিল গ্রামের হায়দর আলী গংকে। ঐ কাগজে মধুপুর উপজেলার সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন এর স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। ঐ জমা ভাগ খারিজ মোকদ্দমার নম্বর ৪৮৯ (১-১) ১৯৯৫-৯৬। ঐ কাগজে খতিয়ান দেখানো হয়েছে ৪৫৭, দাগ ২২৬ ও ২২৭, জমির পরিমাণ ৫৫ শতাংশ। মধুপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অনেক খোজাখুজি করে ২২৬ ও ২২৭ দাগে নতুন নামে খতিয়ান খোলার কোন কাগজ পত্র বা আলামত পাওয়া যায়নি। মধুপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নায়েব ওয়াজেদ আলী খারিজের কাগজ, সীল, স্বাক্ষর চেক করে দেখে খারিজের কাগজটি সম্পূর্ণ জাল বলে অবহিত করেন। এ ব্যাপারে মধুপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি এর অফিসে গিয়ে জানা যায়, হাসিল মৌজার ২২৬ ও ২২৭ নং দাগের সাত জন মালিক রয়েছে। কিন্তু ভুয়া ঐ খারিজের কাগজে উল্লেখিত হায়দার আলী, পিতা-মোঃ আমজাদ আলী, মোসাঃ জনাবা বেগম, জং-হায়দার আলী, এবং আব্দুল জলিল, মোঃ খলিলুর রহমান, ফজলুর রহমান, পিতা- হায়দার আলী এদের নামের কোন অস্তিত্ব পুরো হাসিল মৌজায় খুজে পাওয়া যায়নি। অপরদিকে জমাভাগ মোকদ্দমার ৪৮৯ (১X-১) ১৯৯৫-৯৬ নম্বর ফাইলে দেখা যায় ঐ জমাভাগ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে ভূমির মালিক আমিরুল ইসলাম পিতা মৃত মমির উদ্দিন, বালিয়াচড়া। এমন ধরনের অজস্র ভূয়া কাজগপত্র দিয়ে সাব রেজিষ্টার অফিসে দলিলের কাজ চলছে প্রতিনিয়ত। এমনই এক ঘটনা ঘটেছে

মধুপুর পৌরশহরের চাড়ালজানি গ্রামে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, মধুপুর মৌজার আরওআর-৩৬, জেএল-১৮২ (হাল), আর এস খতিয়ান-১১৯২, দাগ নং ১৭৭৩ (হাল) দাগের ৫৭ শতাংশ জমি ভূয়া জাল কাগজ পত্র দিয়ে দলিল করা হয়েছে। ভূমি অফিসের কাগজপত্র জাল হচ্ছে এ ব্যাপারের সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ আবদুল হাই বলেন, ভূমির কাগজ পত্রে জালিয়াতি রোধে আপাতত খারিজের কাগজপত্র কয়েক দফায় যাচাইয়ের পর ১ জনের পরিবর্তে ৪ জনের স্বাক্ষরে সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে স্থায়ীভাবে এই জালিয়াতি রোধ করতে চাইলে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। এবং ভূমির সকল রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করতে হবে। কারন পুরাতন অনেক কাগজপত্র এখন উধাও হয়ে যাচ্ছে। কম্পিউটারে ডাটাবেইজড করে ইন্টারনেটে দেওয়া থাকলে উধাও হওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

ভুয়া মালিক সাজিয়ে জাল কাগজপত্র তৈরী করে মধুপুর সাব রেজিস্টার অফিসে ১৬ আগস্ট তারিখে ৩৫৮৯, ৩৫৯০ ও ৩৫৯১ নং দলিলের মাধ্যমে যথাক্রমে, ২৭ শতাংশ ভূমি ঘাটাইল উপজেলার বিরাহিমপুর গ্রামের মোঃ ফিরোজুর রহমান মিয়া, ২০ শতাংশ ভূমি মধুপুরের রুহুল আমীন কাজীর স্ত্রী মোছাঃ হালিমা বেগম, ১০ শতাংশ ভূমি দেওলা টাঙ্গাইলের মোঃ আসাদুজ্জামান খানের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। দলিলে উল্লেখিত জমির মৌজা মধুপুর, আরওআর-৩৬, জেএল-১৮২ (হাল), আর এস খতিয়ান-১১৯২, (হাল) দাগ ১৭৭৩। ঐ জমি রেজিস্ট্রি করে দেন সোহাগী বেওয়া। প্রকৃতপক্ষে খরিদের দলিলসূত্রে মালিক দুর্গেশ চন্দ্র নিয়োগী গং আর একোয়ার সূত্রে ঐ জমির মালিক সড়ক ও জনপথ বিভাগ। উল্লেখিত দলিল বাতিলের দাবীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট একটি অভিযোগ পত্র সম্প্রতি দাখিল হয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডাঃ এ এম পারভেজ রহিম বলেন, সম্প্রতি সাব রেজিস্টার অফিসে ভূয়া কাগজ পত্র দিয়ে জাল দলিলের ঘটনা তদন্তে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সাব রেজিস্ট্রার ও নিকাহ রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় হচ্ছে জালিয়াতি কর্মকাণ্ডের আস্তানা। তারা কার জমি কাকে দিচ্ছে, কার স্ত্রীকে কার সাথে বিয়ে দিচ্ছে এগুলো বলা মুশকিল।

এ ব্যাপারে মধুপুর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার হীরা লাল এর সাথে যোগযোগ করা হলে তিনি বলেন, জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। তবে আমি এর সাথে সম্পৃক্ত নই। ভুয়া কাগজ দিয়ে দলিলের কথা বললে তিনি বলেন, একটি ঘটনা ভুলবশত হয়ে গেছে।

অপরদিকে জালিয়াত চক্রের হোতা সামাদ ভেন্ডার নিবন্ধন পরিদপ্তরের মহা পরিচালক মিজানুর রহমানের স্বাক্ষর জাল করে দলিল লিখকের ভুয়া সনদপত্রও সরবরাহ করছেন নির্বিঘ্নে। এমনকি ঐ ভুয়া সনদের বলে অনেকেই মধুপুরে দলিল লেখক হিসাবে কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মধুপুর মুকুল একাডেমীর শিক্ষক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে এমনই একটি ভূয়া সনদপত্র এনে দিয়েছেন তিনি। মোয়াজ্জেম হোসেন তার সনদপত্রটি ভূয়া নিশ্চত হয়ে তিনি তার সনদ টাঙ্গাইলের জেলা রেজিস্ট্রারের নিকট সারেন্ডার করেছেন। এ ব্যাপারে মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, দীর্ঘ ১১ মাস ঘুরিয়ে সম্প্রতি সামাদ ভেন্ডার ৯/১০/২০০৬ সালে অনুমোদিত একটি লাইন্সেস দিয়েছেন। সনদটি ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় সারেন্ডার করেছি।

এই জালিয়াত চক্রের তৈরী করা ভূয়া জমির কাগজপত্র দিয়ে মধুপুরের সরকারী ব্যাংকগুলো থেকে ভুয়া ঋণ উত্তোলনের ঘটনাও ঘটছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মধুপুর শাখায় জালিয়াত চক্রের সাথে কতিপয় দালালও যোগসাজশে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কৃষি ব্যাংকে মোঃ মোক্তার হোসেন, ছোহরাব আলী, রফিকুল, ইসলাম, কাজিম উদ্দিনসহ জনাদশেক দালাল এই সমস্ত কার্যকলাপে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঐ দালালরা ঋণ গ্রহিতার দলিল, পরচা, সহ বিভিন্ন কাগজপত্রের ডুপ্লিকেট বা ভুয়া কাগজ পত্র দিয়েও ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ সাজশে ঋণের ব্যবস্থা করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আউশানারা ইউনিয়নের কদিম হাতিল গ্রামের বিশ্বজিৎ সাহা ১৯৮৬ সাল হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে আসছেন। তার হিসাব নং ১০১৪। লোন পৃষ্ঠা নং ১০৩ (৪) সিসি চলমান। এই ঋণ গ্রহীতা কদিমহাতিল মৌজার ৫ নং আর ও আর খতিয়ানের ১১৩/১২০ দাগের ৪৮ শতাংশ ভূমির দলিল ব্যাংকে বন্ধক রাখেন। ঐ দলিল শুধুমাত্র ব্যাংকের লকারেই থাকার কথা। কিন্তু ঐ দাগের একই জমি বন্ধক দেখিয়ে কদিম হাতিল গ্রামের জোনাব আলী ভূইয়ার নামে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার ঋণ পাশবই নং ১৪১৪ ও ঋণ ক্রমিক নং ৫০২। শুধু তাই নয় ঐ ঋণের বিপরীতে আরো যে সকল জমির বন্ধকী দেখানো হয়েছে তাও অন্যলোকদের জমি। মধুপুর সোনালী ব্যাংকেও এমনতর অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। হলদিয়া গ্রামের মোঃ আব্দুর রহিম কোনদিন ব্যাংকেই আসেননি। কিন্তু ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে তার নামেও ২০ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়েছে। এই প্রতারক চক্রের হাত থেকে মধুপুরবাসীকে রক্ষার জন্য মধুপুর সুধীমহল ও কতিপয় সাবরেজিস্ট্রার অফিসের ভ্যান্ডার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন।

উপাচার্য-কথা

প্রতিবেদন
উপাচার্য-কথা

প্রতিবেদক
শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রকাশের তারিখ
১১ মার্চ ২০০৭ থেকে
১৮ মার্চ ২০০৭

সংবাদপত্র
দৈনিক প্রথম আলো

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক প্রথম আলো
চিফ রিপোর্টার

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য খলিলুরের দুর্নীতি ও অনিয়মই এখানে নিয়ম

৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য আছেন ৪৬১ জন শিক্ষক ও কর্মচারী। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত পদ ১৯৯। জনবল নিয়োগে বিস্ময়কর এ রেকর্ড তৈরি হয়েছে সরকারি টাকায় প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। অননুমোদিত ও অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে চলতি ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দুই কোটি পাঁচ লাখ টাকা। মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান। একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ছিলেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তিনি নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। কেবল অস্বাভাবিক জনবল নিয়োগই নয়, অনুসন্ধানে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এবং কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ শরীফ মারা যাওয়ার পর ২০০৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ড. খলিলুর রহমান উপাচার্য হয়ে এই বিপুল জনবল নিয়োগ দেন। এমনকি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই পদ খালি করতে প্রয়াত উপাচার্যের সময়ে নিয়োগ দেওয়া ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেন তিনি। প্রয়াত উপাচার্যের মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩০ জনকে চাকরিচ্যুত করা সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, তাঁরা ছিলেন অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। চাকরির শর্তেই বলা ছিল, তাঁরা স্থায়ী জনবল নন। তা ছাড়া কারও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

আপ্যায়ন ও বাড়ি ভাড়া: চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে উপাচার্য আপ্যায়ন ব্যয় করেছেন এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে তাঁর আপ্যায়ন ব্যয় প্রায় ৩০ হাজার টাকা। অথচ ইউজিসির চেয়ারম্যান মাসে আপ্যায়ন ভাতা নেন এক হাজার টাকা। কেবল আপ্যায়ন ভাতা নয়, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া নেন। নিয়ম অনুযায়ী যে এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সে এলাকায় উপাচার্য বাসা নেবেন। কিন্তু খলিলুর রহমানের নিজের বাসা উত্তরায়, আর এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি মাসে ভাড়া নেন ৪৫ হাজার টাকা। অস্বাভাবিক আপ্যায়ন ব্যয় সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, আসলে ছয় মাসে উপাচার্যের কার্যালয়ে আপ্যায়ন ব্যয় এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা ছিল না। এই ব্যয় ছিল ৫৯ হাজার টাকা। এ সময় উপাচার্যের কার্যালয়ের কেনাকাটা মিলে হয়েছে এক লাখ ৫৯ হাজার টাকা। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ভুল তথ্য দেওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। নতুনভাবে তদন্ত কমিটিকে তথ্য দেওয়ার কথা জানান তিনি।

খলিলুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর ঢাকার উত্তরায় ১২ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কে 'খলিল কটেজ' নির্মাণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে বাড়িটি ছিল একতলা, এটি এখন ছয়তলা ভবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর ড. খলিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াজোঁ কার্যালয় হিসেবে নিজের বাসভবনটি ২৬ হাজার ৪৪০ টাকায় ভাড়া নেন। এ ছাড়া অগ্রিম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই লাখ ৩৭

হাজার ৬০০ টাকা নিয়েছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগ জানায়, লিয়াজোঁ কার্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল হিসেব তিনি মাসে আট হাজার ৯০১ টাকা এবং জ্বালানি হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা নিচ্ছেন। নিজের বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে খলিলুর রহমান বলেন, নিয়ম মেনেই তিনি কম টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়কে বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় নয়, নয় বছর দেশের বাইরে চাকরি করে অর্জিত টাকায় ছয়তলা বাড়ি নির্মাণের কথা জানান তিনি।

এক ব্যক্তি ছয় দায়িত্বে: নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক বা কর্মকর্তা একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে পারেন। কিন্তু উপাচার্য খলিলুর রহমান একাই পাঁচটি দায়িত্ব পালন করেন। উপাচার্য পদের পাশাপাশি তিনি দুটি ডিনের ও তিনটি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এই পাঁচটি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য মাসে অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা নিয়েছেন।

একাই নেননি: উপাচার্য খলিলুর রহমান কেবল নিজেই নেন না, অপরকেও দেওয়ার নজির স্থাপন করেছেন। ছয় মাসে তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা দিয়েছেন দুই কোটি ১৮ লাখ টাকা। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন ১০ কোটি ৫০ হাজার টাকা।

নিয়োগে অনিয়মের কিছু দৃষ্টান্ত: এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখায় সাইক্লোস্টাইল মেশিন নেই, কিন্তু মেশিনের অপারেটর পদে লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মেশিন না থাকলে ও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পাম্প অপারেটর। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাম্প না থাকলেও পাম্প অপারেটর এবং মেশিন না থাকলেও অপারেটররা অন্য কাজ করছেন। গ্রন্থাগার দপ্তরে একজন মহিলা কর্মকর্তার নিয়োগের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন উপাচার্যের পিএস এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। অধিকাংশ নিয়োগ আদেশে কাটাকাটি ও মোচনীয় কালি (ফ্লুইড) ব্যবহার করা হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ নয়টি, নেওয়া হয়েছে ৩১জন। ৩৮ জন কর্মকর্তার থাকার কথা, আছেন ৬৫ জন। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৭৪ জনের জায়গায় ১৯৪ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৭৮ জনের জায়গায় ১৭১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০১তম রিজেন্ট বোর্ড উপাচার্যকে ২৫৬টি পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থে তিন বছরের মধ্যে পূরণ করতে বলে। এরপর বেশ কয়েকটি রিজেন্ট বোর্ড সভায় পদ সৃষ্টি করা হলেও বোর্ড উপাচার্যকে নিয়োগের ক্ষমতা দেয়নি। উপাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ঢালাও দুর্নীতির অভিযোগ ঠিক নয়। রিজেন্ট বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থী বাড়বে, কিন্তু জনবল তেমন বাড়বে না। এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, মন্ত্রী-সাংসদদের অনুরোধে কিছু জনবল নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় নানামুখী চাপের কারণে কিছু কর্মচারী নেওয়া হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

অপরিকল্পিত নির্মাণকাজ: নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনের প্রায় প্রতিটি দেয়ালে ফাটল তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া এই ভবনে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী বাথরুম তৈরি করা হয়েছে, যা প্রকৌশলীদের অদক্ষতা বলে শিক্ষকদের অনেকে মনে করছেন। এ ছাড়া ভবনটি পার্শ্ববর্তী সড়কের বেশ নিচুতে নির্মাণ করায় জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে এর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রহল নির্মাণাধীন হলেও ছয় মাস আগেই কেনা হয়েছে আসবাবপত্র। এসব আসবাব পড়ে আছে খোলা আকাশের নিচে।

দুদক ও ইউজিসির তদন্ত: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিশ্ববিদ্যালয়টির সামগ্রিক অনিয়মের তদন্ত শুরু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসির একটি তদন্ত কমিটি ৩ ফেব্রুয়ারি সরেজমিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে। তদন্ত কর্মকর্তারা চাহিদা মোতাবেক সব তথ্য পাননি। পরবর্তী সময়ে নয়টি তথ্য মঞ্জুরি কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি মঞ্জুরি কমিশন আরেক চিঠির মাধ্যমে এসব তথ্য পাঠানোর তাগিদ দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পদ ও লোকবলের বিবরণী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে উপাচার্যের আপ্যায়ন ব্যয়ের বিবরণী, উপাচার্যের ঢাকাস্থ কার্যালয়ের ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও চেয়ারম্যানদের তালিকা, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে জ্বালানি তেলের হিসাব, সাবেক উপাচার্যের আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে চাকরিচ্যুতদের তালিকা, প্রকল্প প্রস্তাবে বরাদ্দ ৪৫ লাখ টাকার মধ্যে ২৫ লাখ টাকা খরচের পরও বাড়ি নির্মাণ শেষ না হওয়া সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া ও যাতায়াত ভাতা হিসেবে প্রায় ১৩ কোটি টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ।

আমাদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কামনাশীষ শেখর জানান, উপাচার্যের আর্থিক দুর্নীতি, প্রশাসনিক অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা আন্দোলন শুরু করেছেন। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান ক্যাম্পাসে আসছেন না। এমনকি ২৮ জন শিক্ষক একযোগে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সুপার পদ থেকে পদত্যাগকারী শিক্ষক ওমর ফারুক বলেন, 'উপাচার্যের সঙ্গে কাজ করার অর্থ তাঁর দুর্নীতি, অন্যায় ও অনিয়ম মেনে নেওয়া। তাই আমরা প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি।'

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিলেও শিক্ষক ও ল্যাবরেটরি সংকটের বিষয়ে উপাচার্য আন্তরিক নন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগে তিনটি ব্যাচে ১৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রভাষক আছেন পাঁচজন। শিক্ষক উমর ফারুক জানান, ফরেনসিক ল্যাব ও ইনভেস্টিগেশন ল্যাব না থাকায় শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ধারণা দিতে পারছেন না তাঁরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড নিউট্রেশন সায়েন্স বিভাগে ল্যাবরেটরি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগে কম্পিউটার থাকলেও ইন্টারনেট সংযোগ নেই। বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মদ শাহীন বলেন, দুই বছর ধরে বিষয়টি উপাচার্যকে বলেও কোনো লাভ হয়নি। শিক্ষক ও ল্যাবরেটরি সংকট সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কিছু সমস্যা থাকতেই পারে। পর্যায়ক্রমে সমস্যাগুলোর সমাধান চলছে। তিনি বলেন, কয়েকজন শিক্ষক তাঁর কাছে পদোন্নতি চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি চেষ্টাও করেছেন, ইউজিসির সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু ওইসব শিক্ষক তাঁকে ভুল বুঝে শিক্ষার্থীদের মাঠে নামিয়েছেন।

উপাচার্যের অতীত: ড. খলিলুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য। একজন সহ-উপাচার্য হয়ে তিনি ভুয়া বিলের মাধ্যমে পারিবারিক বিভিন্ন খরচের টাকা নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে। এমনকি রুটি, বিস্কুট, নুডলস, রসগোল্লা, কোক, পেটিস, ময়দাসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য কিনে তিনি এগুলোর বিল বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন।

এ সংক্রান্ত বেশ কিছু বিল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সহ-উপাচার্যের কার্যালয় গাজীপুর অবস্থিত হলেও তিনি যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনাকাটা করেছেন, সেগুলো কেনা হয়েছে ধানমন্ডি এলাকা থেকে এবং এই এলাকায় ছিল তাঁর বাসা। পণ্য ক্রয়ের বেশকিছু রসিদ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, খলিলুর রহমান ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকার দোকান থেকে পণ্য কিনে সব বিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগে দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে অবস্থিত এবং তিনি অফিসের জন্য কোনো পণ্য কিনলে তা গাজীপুর এলাকা থেকে কেনার কথা। কিন্তু ক্রয় রসিদে দেখা যায়, সাবেক সহ-উপাচার্য খলিলুর রহমান যেসব বিল জমা দিয়ে লাখ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে ধানমন্ডি এলাকার রস বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড, চিটাগাং কনফেকশনারি, ইউরো হাট, মীনা সুইটস, মধুবনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রসিদ রয়েছে। এছাড়া সোনারগাঁও হোটেল থেকে পাউরুটি, স্টার কাবাব থেকে বিরিয়ানি, রাশেদ ফ্রুট থেকে আপেল, নিউ জেকে জেনারেল স্টোর থেকে দুধ কেনা হয়েছে। আগোরা থেকে ২০০৩ সালের ২৭ আগস্ট রাত আটটায় তিনি কিনেছেন হিমায়িত শামি কাবাব, ডেনস সল্ট বিস্কুট, পেস্ট্রি, নুডলস, পটেটো চিপস ইত্যাদি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগে এসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট শাখায় একজন কর্মকর্তা বলেন, হিসাব বিভাগের প্রায় সবাই জানতেন, সহ-উপাচার্য বাসার খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর বিল আটকে রাখার ক্ষমতা কারও ছিল না। উল্লেখ্য, যেসব বিল সহ-উপাচার্য স্বাক্ষর করে নিয়েছেন সেখানে বলা আছে, 'প্রত্যায়ন করছি যে, এর মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত খরচের বিল নেই।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়য়ের সহ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে পারিবারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিল নেওয়া সম্পর্কে খলিলুর রহমান বলেন, যেখান থেকেই কেনা হোক না কেন, তা অফিসের জন্য ব্যবহার করেছেন। গাজীপুরে অফিস হলেও ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন দোকান থেকে মিষ্টি, নুডলস, দুধ, আপেল কেনা সম্পর্কে তিনি বলেন, হয়তো অফিসে আসা-যাওয়ার পথে এগুলো কেনা হয়েছে।

উপাচার্য ড. খলিলের বক্তব্যের প্রতিবাদ: গতকাল রোববার প্রকাশিত 'মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: উপাচার্য খলিলুরের দুর্নীতি ও অনিয়মই এখানে নিয়ম' শীর্ষক প্রতিবেদনে উপাচার্য ড. খলিলুর রহমানের দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক। তাঁরা জানান, ছাত্র আন্দোলনের জন্য উপাচার্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়ী করে যে মন্তব্য করেছেন, তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মহিউদ্দিন, মাহমুদ হাসান, ড. ইউনুস মিয়া, নূরজাহান খাতুন, শরীফ আহমেদ, শাহীদ উদ্দিন ও উমর ফারুকসহ কয়েকজন এই প্রতিবাদ জানান।
সংশোধনীঃ প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ নয়টি বলা হলেও এটি পুরানো তথ্য। বর্তমানে শিক্ষকের অনুমোদিত পদ ৭৭টি, কিন্তু কর্মরত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে ২২টি ব্যাচে মাত্র ৩০ জন শিক্ষক। তাদেঁর মধ্যেও দুজন ছুটিতে আছেন।

মওলানা ভাসানী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন:
মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খলিলুর রহমান গতকাল সোমবার পদত্যাগ করেছেন। গত রোববার প্রথম আলোয় 'উপাচার্য খলিলুরের দুর্নীতি ও অনিয়মই এখানে নিয়ম' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাঁর পদত্যাগের খবরে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা আনন্দ মিছিল করেছেন।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত উপাচার্যের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়গুলো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তবে সরকারের নির্দেশে নাকি স্বেচ্ছায় তিনি পদত্যাগ করেছেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গতকালই ড. খলিলুর রহমান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে যোগদানের আবেদন করেন। বিভাগের অধ্যাপক এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন আবেদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইশতিয়াক মাহমুদও প্রথম আলোকে জানান, গতকাল ড. খলিল যোগদানের আবেদনপত্র দিয়েছেন। কবে থেকে তিনি বিভাগে যোগ দিচ্ছেন-এমন প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, আবেদনপত্রটি তিনি ভালভাবে দেখার সুযোগ পাননি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এত অভিযোগ মাথায় নিয়ে তাঁর ফিরে আসার বিষয়ে বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি জানান, উপাচার্যের পদত্যাগের খবরে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আনন্দ মিছিল করেছে। কয়েক দিন ধরে তাঁরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে ক্লাস বর্জন করে আসছিলেন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও একযোগে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক উপাচার্যের দুর্নীতির হাল ধরেছেন বর্তমান উপাচার্য!

তিন-তিনটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মু ওয়াহিদ-উজ-জামান। সব কটি মোবাইল ফোনে মাসে গড়ে বিল আসত ৩০ হাজার ৩৫০ টাকা। ওই পুরো বিল তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে নিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্যের ব্যবহারের একটি মোবাইল ফোনের বিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়ার কথা। সাবেক এই উপাচার্যকে ওই বিল হিসেবে অতিরিক্ত নেওয়া এক লাখ ৯৩ হাজার ৯৩৬ টাকা এবং বাড়ি ভাড়া, জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন খাতে নেওয়া অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বিলের টাকা ফেরত দিতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

নানা অনিয়ম, কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে রেষারেষি এবং ছাত্র আন্দোলনের মুখে ওয়াহিদ-উজ-জামানকে সরিয়ে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মো.আব্দুল লতিফ মাসুমকে গত বছরের ২৭ আগস্ট উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১০/১ ধারায় বলা আছে, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।' আব্দুল লতিফ মাসুম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যঙ্গ করে বলা হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানও তো বিজ্ঞান! সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ইউসুফ হাসান হুমায়ুন শিক্ষাসচিব এবং উপাচার্যকে এ অনিয়মের বিষয়ে উকিল নোটিশ দিয়েছেন। এতে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যকে অপসারণ এবং অনিয়মতান্ত্রিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবি জানানো হয়। দুর্নীতি, অদক্ষতা, নিয়োগে অনিয়মের কারণে উপাচার্য ড. ওয়াহিদকে সরিয়ে দেওয়া হলেও যেন তাঁর দুর্নীতির হাল ধরেছেন নতুন উপাচার্য আব্দুল লতিফ। তাঁর বিরুদ্ধেও সাবেক উপাচার্যের মতো বহুমুখী আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় কোটি টাকা ছাড় করছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মেরও তদন্ত শুরু হয়েছে।

বর্তমান উপাচার্য: নিয়ম অনুযায়ী যে এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সেই এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা বাড়িতে উপাচার্য অবস্থান করবেন। এর জন্য উপাচার্য মূল বেতনের ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ আট হাজার ৫০ টাকা ভাড়া প্রাপ্য। এই টাকায় মফস্বলে ভালো বাড়ি পাওয়ার কথা। কিন্তু ইউজিসির তদন্তে দেখা গেছে, তিনি ১৬ মাসে বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন চার লাখ টাকা। এ নিয়ে কথা উঠলে তিনি এক লাখ টাকা ফেরতও দেন। কিন্তু ইউজিসি বলছে, নিয়মের বাইরে নেওয়া পুরো টাকা আদায়যোগ্য। উপাচার্য লতিফ প্রথম আলোকে বলেন, বিষযটি নিয়ে আপত্তি ওঠায় তিনি এখন বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন না। এর আগে তিনি দুই লাখ টাকা বাড়ি ভাড়ার বিপরীতে ঋণ নেন, যার এক লাখ টাকা ফেরত দিয়েছেন। তিনি জানান, উপাচার্য বাড়ি ভাড়াসহ কী কী সুবিধা পাবেন, তা নিয়ে সিন্ডিকেটে একটি কমিটি হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর তিনি সে অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া নেবেন। এ উপাচার্যের বিরুদ্ধে মাসে সর্বোচ্চ ৯০০ লিটার তেল নেওয়ারও অভিযোগ আছে। সরকারি নিয়মে তাঁর সর্বোচ্চ ২০০ লিটার পাওয়ার কথা। তাঁর মোবাইল ফোনে তিন মাসে বিল হয়েছে যথাক্রমে ১২ হাজার ৬৯২ টাকা, নয় হাজার ৬৮৪ এবং নয় হাজার ৪৫০ টাকা। আর গড়ে প্রতি মাসে তাঁর মোবাইল বিল ছয় হাজার ৫৪৭ টাকা। উপাচার্যের বক্তব্য, 'দু-এক মাসে হয়তো ৯০০ লিটার তেল খরচ হতে পারে। কিন্তু গড়ে মাসে ৩৫০ থেকে ৪০০ লিটার তেল খরচ হয়।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এবং ঢাকায় একটি গাড়ি ব্যবহারের কথা স্বীকার করেন। ঢাকার গাড়ি পরিবার-পরিজন ব্যবহার করে না দাবি করে তিনি বলেন, আমি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ঢাকায় লিয়াজোঁ কার্যালয়ে গেলে গাড়িটি ব্যবহার করা হয়।' নিজের মোবাইল ফোনের বিল সম্পর্কে উপাচার্যের মন্তব্য, 'বিল আগের তুলনায় অনেক কমেছে, তবে এটা আরও কমা উচিত।'

উপাচার্য আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ, তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ এবং সিএসই (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগে ২৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করেছেন। মেধা তালিকার বাইরের এ ভর্তি নিয়ে 'অডিট আপত্তি' আছে। এটাও তদন্তের আওতায় আছে। উপাচার্যের দাবি, ভর্তিতে অনিয়ম হয়ে থাকলে এ জন্য তিনি দায়ী নন। তবে ওই সময় তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে স্বীকার করেন।

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে অনুমোদিত কোনো বিভাগ নেই। অথচ উপাচার্যের অতি ঘনিষ্ঠ আবুল বাশার খান নিউটনকে সরকার ও রাজনীতির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু উপাচার্যের দাবি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য বিষয়ের শিক্ষক থাকতে পারে। কারণ, 'মৌলিক বিষয় (কোর সাবজেক্ট)' হিসেবে ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হয়। নিউটনকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে তাঁর যুক্তি, 'ওই ছাত্রটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়রানির শিকার হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালে আমার অধীনে নিউটন এমএস করেছিল।'

পদ খালি না থাকলেও চারজনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন উপাচার্য। আগের উপাচার্যের সময় বিভিন্ন অভিযোগে তিনবার সাময়িক বরখাস্ত হওয়া একজন অফিস সুপারকে তিন হাজার ৪০০ টাকার বেতন স্কেল থেকে ১১ হাজার টাকার স্কেলে সহকারী রেজিষ্টার পদে নিয়োগ দিয়ে সমালোচিত হন তিনি। নিয়োগ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে আরও নানা অভিযোগ পাওয়া গেছে। জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে উপাচার্য বলেন, 'আমার আত্মীয় স্বজনসহ স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষোভ থাকলেও নিয়ম মেনেই সবকিছু করছি।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯২০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন। এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অতিরিক্ত জনবল, অর্থিক অনিয়ম এবং স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

সাবেক উপাচার্য: পদত্যাগে বাধ্য হওয়া উপাচার্য ড. মু ওয়াহিদ-উজ-জামান মাসে গড়ে ৫৫২ লিটার জ্বালানি তেল নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। নিয়ম অনুযায়ী তিনি ২০০ লিটার নিতে পারেন। ইউজিসির মতে, '১০ মাসে জ্বালানি তেল কেনা বাবদ তাঁর নেওয়া অতিরিক্ত দুই লাখ ৪৮ হাজার ৩৭৩ টাকা আদায়যোগ্য।' ওয়াহিদ-উজ-জামান দরপত্র আহবান না করেই চারটি গাড়ি কিনেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্রয় কমিটিও ছিল না। গাড়িগুলোর দাম বাবদ ৭০ লাখ

৮৯ হাজার ৫৮০ টাকা বিল দেওয়া হলেও তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটির অনুমোদন ছিল না। ইউজিসির একজন তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, ব্যক্তিগত সমঝোতার মাধ্যমে এবং টাকা আত্মসাতের জন্য অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার গাড়িগুলো কেনা হয়েছে।

এই উপাচার্য তিনটি গাড়ি ব্যবহার করতেন। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তিনি একটি গাড়ি মেরামতের জন্য চার লাখ ৬৩ হাজার ৮৩০ টাকা বিল দেন। তদন্ত কর্মকর্তারা মন্তব্য করেছেন, এটা অবিশ্বাস্য এক ভুয়া বিল। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে পাঁচটি বিলের মাধ্যমে এক লাখ ২২ হাজার ১৬০ টাকা গাড়ি মেরামত বাবদ বিল দেওয়া হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২১টি বিলের মাধ্যমে গাড়ি মেরামত বাবদ নেন চার লাখ ৬৩ হাজার ৮৩০ টাকা। ২০০৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর একই গাড়ির জন্য তিনটি বিলে নেওয়া হয় এক লাখ ৫৮ হাজার ৩৯০ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিজেন্ট (নীতিনির্ধারণী কমিটি) সভায় ঢাকা থেকে সদস্যদের নেওয়ার জন্য উপাচার্য হেলিকপ্টার ভাড়া করেছেন এক লাখ ১৩ হাজার টাকায়। তাঁদের আপ্যায়নে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে । এসব খরচ ভুয়া বিলের মাধ্যমে সমন্বয় করার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে একটি ডামি বিমান বসানো হয়েছে পাঁচ কোটি ৭৮ লাখ টাকা খরচ করে। একই কাজে আনুষঙ্গিক খরচ দেখানো হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত টাকা খরচ করে ডামি এয়ারক্রাফট স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না বলে মনে করেন বর্তমান উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় এক কোটি ২১ লাখ টাকা খরচে তৈরি করা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানাগারটি (সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি) কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মচারী ও কেমিক্যালসহ বিভিন্ন উপকরণের অভাবে কাজে আসছে না।

সাবেক এই উপাচার্যকে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ডেকে পাঠানো হয়। কমিশনের প্রায় সব সদস্যের উপস্থিতিতে তাঁর কাছে আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলো জানতে চাওয়া হয়। কমিশন সূত্র জানায়, ড. ওয়াহিদ অধিকাংশ অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন খাতে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে আমি চলে আসার পর সম্মানহানির জন্য অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।' তবে তিনি মঞ্জুরি কমিশনে যাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, আইনত যদি টাকা ফেরত দিতে হয়, তাহলে দেবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া ও মোবাইল বিল নেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা কমবেশি হয়েছে। তবে সবকিছুই হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী। গাড়ি কেনা ও গাড়ি মেরামতের নামে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার বিষয়টি সত্য নয় বলে তাঁর দাবি।

তাঁর পাল্টা অভিযোগ, 'আমি চলে আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব দুর্নীতি চলছে, তা আড়াল করার জন্য বারবার আমাকে দেখানো হচ্ছে। এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।'

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ডামি বিমান বসানোর বিষয়ে তিনি বলেন, বিমানবাহিনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আকর্ষণ এবং এলাকার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এটি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করা হলেও তা চালু না করতে পারা সম্পর্কে ড. ওয়াহিদ বলেন, নেতৃত্বের অভাবে এটা চালু করা যাচ্ছে না। আর যিনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, তিনি তো বিজ্ঞানেরই লোক নন।

সংশোধনী: ১২ মার্চ *প্রথম আলোর* 'পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক উপাচার্যের দুর্নীতির হাল ধরেছেন বর্তমান উপাচার্য' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে ডামি বিমান বসানো বাবদ পাঁচ কোটি ৭৮ লাখ টাকা খরচের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অকেজো এফ-৬ বিমান এবং এটি স্থাপনে পাঁচ লাখ ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এটি বসাতে আনুষঙ্গিক খরচ হয়েছে লক্ষাধিক টাকা।

নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল খালি করে ফেলেছেন উপাচার্য!
ছয় মাসে আপ্যায়ন ব্যয় সাড়ে ৩ লাখ, মাসে মোবাইল বিল ২০ হাজার টাকা

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের তহবিলে তখনো আট কোটি ৩৩ লাখ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। কিন্তু উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসিকে জানান, 'প্রকল্পের সব টাকা খরচ হয়ে গেছে।' ইউজিসি গত বছরের ৩০ জুন সে তথ্য সরকারকে জানিয়ে দেয়। পরে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউজিসিকে অসত্য তথ্য দিয়েছিল।

অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে, ওই উদ্বৃত্ত টাকা থেকে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে দুই কোটি ৭২ লাখ ৩৪ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া নির্মাণ খাতে এক কোটি এবং ফার্নিচার ক্রয়ে ১২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়।

ইউজিসির একজন কর্মকর্তা জানান, উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বৃত্ত টাকা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া রাজস্ব খাতে খরচ করা যায় না। উপাচার্য অধ্যাপক আবুল খায়ের *প্রথম আলো*কে বলেছেন, এই টাকা তিনি ধার হিসেবে নিয়েছেন। কিন্তু ইউজিসির অর্থ কমিটির একজন সদস্য বলেছেন, উন্নয়ন খাতের টাকা ধার হিসেবে নেওয়া বা তা রাজস্ব খাতে খরচের কোনো নিয়ম নেই।

দেশের ১২টি পুরানো জেলার যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেখানে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নোয়াখালীর সোনাপুরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন করা হয়। ২০০১ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩১ কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুমোদন করে। ২০০৪ সালের ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। এক বছর হলো সেখানে লেখাপড়া শুরু হয়েছে।

শিক্ষার্থী ১৮৩, শিক্ষক-কর্মচারী ১৩৯: এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন ১৮৩ শিক্ষার্থী। ভর্তির অপেক্ষায় আছে একটি ব্যাচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুমোদিত পদ ৪১টি। কিন্তু নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১৩৯ জন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রার প্রথম বছরে বেতন-ভাতা খাতে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে ৭৬ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। বেতন-ভাতা খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। অতিরিক্ত জনবলের কারণে বছরান্তে ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে এক কোটি ২০ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, শিক্ষক পদে অতিরিক্ত দুজন নেওয়া হলেও অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৮৬ জন। এসব নিয়োগের নেপথ্যে দুর্নীতি ও দলীয়করণ গুরুত্ব পেয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্নে যে বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হবে, তার দায়দায়িত্ব পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

উপাচার্য দাবি করেন, নিয়ম মেনে তিনি সব নিয়োগ দিয়েছেন। বিশেষ করে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৯৫ বলে তিনি দাবি করেন। অননুমোদিত পদে নিয়োগ দেওয়া সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে যত লোকবল দরকার, ততটাই নেওয়া হয়েছে।

অস্বাভাবিক আপ্যায়ন ব্যয়: বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর প্রথম ছয় মাসে উপাচার্য অধ্যাপক খায়ের তিন লাখ ৫৫ হাজার টাকা আপ্যায়ন ব্যয় দেখিয়েছেন। শুধু তাঁর কার্যালয়েই ছয় মাসে আপ্যায়ন বাবদ খরচ দেখানো হয় ৭২ হাজার টাকা। এর বাইরে ছয় মাসে অতিথি আপ্যায়নে খরচ দেখিয়েছেন আরও এক লাখ ৬০ হাজার ৮৫২ টাকা।

উপাচার্য বলেন, 'এই আপ্যায়ন ভাতা খুব বেশি নয়। একজন উপাচার্য হিসেবে আমি মাসে ২০ হাজার টাকা আপ্যায়ন খরচ করতেই পারি।'

নিয়মানুযায়ী, ইউজিসির চেয়ারম্যানসহ একজন উপাচার্য প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আপ্যায়নে ব্যয় করতে পারেন। ইউজিসির একটি তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, মঞ্জুরি কমিশনে প্রতিদিন শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তাসহ অতিথিরা আসা-যাওয়া করেন।

সেখানে মাসে এক হাজার টাকা আপ্যায়ন বাবদ খরচ হলে নোয়াখালীতে অবস্থিত একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এত টাকা আপ্যায়ন ব্যয় বাস্তব ও বিধিসম্মত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ছয় মাসে ছাত্রদের ডাইনিং খাতে ৪৫ হাজার টাকা, শিক্ষক ডরমিটরিতে খাওয়া খাতে ছয় হাজার ৫৮১ টাকা, ইফতার ও মিলাদ বাবদ ৩৬ হাজার ৯৩৬ টাকা এবং নবীনবরণে ৩৬ হাজার ৪২৪ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্র ও শিক্ষকদের ডরমিটরিতে খাওয়া বাবদ ব্যয় কেন বিশ্ববিদ্যালয় করবে? উপাচার্য আবুল খায়েরের বক্তব্য, চরাঞ্চলে আসা শিক্ষকদের তিনি দুই মাস বিনামূল্যে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া প্রকল্প চলাকালে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন। উপচার্য আরও বলেন, 'ছাত্র-শিক্ষকদের বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এটা সত্য। তা না দিলে অনেকেই এখানে আসবেন না বা থাকতে চাইবেন না।'

বসবাস নোয়াখালীতে, ভাড়া ঢাকার মতো: উপাচার্য আবুল খায়ের মাইজদীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্টহাউসে থাকেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাসে বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন ২৫ হাজার টাকা। মূল বেতনের ৩৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়া হওয়ায় উপাচার্য গত ছয় মাসে অতিরিক্ত লক্ষাধিক টাকা বাড়ি ভাড়ার নামে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিয়ম হলো, বিশ্ববিদ্যালয় যে শহরে, উপাচার্য সেখানে বাড়ি ভাড়া নেবেন। সেই হিসেবে মফস্বল শহরে বাসা ভাড়া ২৫ হাজার টাকা হওয়ার কথা নয়। বেতন স্কেল অনুযায়ী, উপাচার্য আট থেকে সাড়ে আট হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া বাবদ পাবেন। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, ওই টাকা দিয়েই মাইজদী এলাকায় ভালো বাসা পাওয়া যায়।

উপাচার্যের দাবি, ২৫ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন। তাঁর পরিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে থাকে। তাঁর মন্তব্য, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা আরও বেশি ভাড়া নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিন্ডিকেট সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু অধ্যাপক খায়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, সেহেতু অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে থাকতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নয়, প্রচলিত বাজারমূল্যে তাঁকে ভাড়া দিতে হবে। তবে তিনি নোয়াখালী বসবাস করে ঢাকার ভাড়া নেবেন কি না সেটাই প্রশ্ন।

অস্বাভাবিক ফোন বিল: গত ছয় মাসে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোবাইল ফোন বিল বাবদ নিয়েছেন এক লাখ ১৯ হাজার টাকা। প্রতি মাসে গড়ে তিনি প্রায় ২০ হাজার টাকা মোবাইল বিল নিয়েছেন। তদন্ত কমিটি উপাচার্যকে মোবাইল বিলের বিষয়ে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। উপাচার্যের যুক্তি, 'বিল বেশি হওয়ার কারণ এখানে ল্যান্ডফোন নেই।'

অপ্রয়োজনীয় খরচ: বছরখানেক আগে চালু হওয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ লাখ টাকা ব্যয় করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ল্যাব স্থাপন করা হয়। হেড ফোনসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কিনতে এ টাকা খরচ হয়। ১৮৩ শিক্ষার্থীর একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ল্যাব কতটা জরুরি এবং এটা অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

একইভাবে এই ছোট ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাসে পাঁচ লাখ টাকার ষ্টেশনারি, এক লাখ টাকার বৈদ্যুতিক সামগ্রী, এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা যাতায়াত ভাতা, ১৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা বিবিধ ব্যয় দেখানো হয়েছে। ইউজিসির তদন্তে এসব ব্যয়ের সিংহভাগই অপ্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে উপাচার্য খায়ের বলেন, ইংরেজি ভাষা ল্যাব স্থাপনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভালো ইংরেজি বলতে পারেন। তিনি দাবি করেন, সরকারের বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, পরীক্ষণ বিভাগ (আইএমইডি) এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজসহ সামগ্রিক কাজের প্রশংসা করেছে।

কিন্তু নতুন অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ হওয়া টাকা ছাড় করেনি। অনিয়ম দূর না করা পর্যন্ত টাকা ছাড় করা হবে না। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির বিদ্যমান অনিয়ম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তদন্ত করা হচ্ছে। শিগগিরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করা হবে।

অবশ্য উপাচার্য বলেছেন, চলতি অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। মঞ্জুরি কমিশনে ছাড়ের অপেক্ষায় আছে মাত্র ৫৮ লাখ ৪৬ হাজার টাকা।

উপাচার্য বারীর দুর্নীতির ভার বইতে পারছে না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে উপাচার্য অধ্যাপক এম এরশাদুল বারীর জীবন-বৃত্তান্তে বলা আছে, 'বাংলাদেশে তিনিই প্রথম আইনের শিক্ষক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন।' উপাচার্য হওয়া নিয়ে এই আইনের অধ্যাপক হয়তো গর্ব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর বেআইনি কর্মকান্ডের ভার আর বহন করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়টি। প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-ইউজিসি তাঁকে অপসারণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষার সুপারিশ করেছে। তাঁর অনিয়মের তদন্ত করছে দুদকও।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও সংবাদমাধ্যমসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মহলে এরশাদুল বারীর কর্মকান্ড নিয়ে তীব্র সমালোচনা হলেও জোট সরকারের শেষ বছরে তিনি দ্বিতীয় দফায় আরও চার বছরের জন্য নিয়োগ পেতে সক্ষম হন। অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ও সমালোচনার দিক থেকে তিনি এখন সব উপাচার্যের শীর্ষে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি যে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত করেছে, তার মধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম পেয়েছে। গত সোমবার ইউজিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, প্রতিবেদনে অবিলম্বে ড. বারীকে অপসারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি রক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদকও বারীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং মিথ্যাচারের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখছে একটি টাস্কফোর্স। এর আগে বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো ড. বারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করলেও জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি রেহাই পান। ৬ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা উপদেষ্টা আয়ুব কাদরী উন্মুক্তসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তদন্ত প্রতিবেদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনিয়মের কারণে ইউজিসি টাকা আটকে দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিতে আর্থিক সংকট চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা বলেছেন, দুর্বল আইন, উপাচার্যের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং বিএনপি-জামায়াত উভয় দিকে সুসম্পর্ক বজায় রাখায় ড. বারী শুরু থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতদের প্রজা এবং নিজেকে রাজা মনে করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. নিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী এ প্রসঙ্গে বলেন, একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি দুর্বল এবং এ আইনে সবকিছু কেন্দ্রীভূত।

শিক্ষার মানোন্নয়ন করে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) বিশেষ ঋণ কর্মসূচির আওতায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০৩২ সাল পর্যন্ত এই ঋণ শোধ করতে হবে।

খাতা মূল্যায়ন ছাড়াই পরীক্ষার ফল প্রকাশ!
উপাচার্য ড. বারীর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক খাতা দেখা বাণিজ্যের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করেই নম্বর দেওয়া কয়েকটি খাতা এ প্রতিবেদকের হাতে এসেছে। এতে দেখা যায়, ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় শেখ বোরহানদ্দিন কলেজ কেন্দ্রের অর্থনীতি প্রথম পত্রে বেশ কিছু খাতা দেখা হয়নি। এসব খাতার প্রথম পাতায় নম্বর উল্লেখ করা হয়নি, ভেতরে কোথাও কোনো দাগ পড়েনি, প্রশ্নভিত্তিক নম্বর দেওয়া হয়নি। অথচ এসব পরীক্ষার্থীকে আনুমানিক ও গড়ে ৪০ নম্বর করে দেওয়া হয়েছে। খাতায় পরিদর্শকের স্বাক্ষর থাকলেও প্রধান পরীক্ষক বা নিরীক্ষকের স্বাক্ষর নেই।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা সূত্র জানায়, ইউজিসি থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে ওই কেন্দ্রের অর্থনীতি প্রথম পত্রের ৪০টি খাতা কোন শিক্ষক মূল্যায়ন করেছেন, খাতাগুলো আদৌ মূল্যায়ন হয়েছে কি না, মূল্যায়নে কী পদ্ধতি অনুসরণ হয়েছে তা জানাতে বলা হয়েছে। চিঠি পেয়ে উপাচার্য তাঁর ঘনিষ্ঠদের দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করেছেন।

নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ ৩০০ থেকে ৪০০ খাতা মূল্যায়ন এবং চার হাজার থেকে ছয় হাজার খাতা নিরীক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিন হিসেবে কর্মরত ড. আরশাদ আলী মাতুব্বর গত এইচএসসি পরীক্ষায় পাঁচ হাজার খাতা মূল্যায়ন এবং ৩০ হাজার খাতা নিরীক্ষণ করেছেন এবং সময়মতো খাতা জমাও দিয়েছেন।

শিক্ষকেরা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা ৩০০ থেকে ৪০০ খাতা মূল্যায়নে হিমশিম খান। ডিন হিসেবে নয়টা-পাঁচটা অফিস করে আরশাদ আলী কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ হাজার খাতা দেখা এবং ৩০ হাজার খাতা নিরীক্ষণের কাজ শেষ করলেন?

আরশাদ আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'খাতা দেখার পর তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখায় ফেরত দেওয়া হয়। যেটা নিয়ে কথা উঠেছে তা এক বছর আগের এবং তখন কত খাতা দেখেছি এই মুহূর্তে খেয়াল নেই।' আরশাদ আলী দাবি করেন, একজন পরীক্ষক কতটি খাতা দেখবেন তার বিধিবদ্ধ কোনো নিয়ম নেই।

জনবল নিয়ে লুকোচুরি: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় জনবলের সংখ্যা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং সংবাদমাধ্যমের সমালোচনার মুখে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন জনবল আছে এক হাজার ২০৯। এদের মধ্যে বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদে ৪৮৭ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

এরশাদুল বারী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ২০০১ সালে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮৩৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ থেকে ৮৯ তম বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে কমপক্ষে ৭৮৩টি পদ সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭১০টি পদে ড.বারীর মেয়াদে নিয়োগ হয়েছে। তাই তাঁর দেওয়া তথ্য সঠিক নয়।

নিজেই নিজের নিয়োগদাতা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই 'ল' স্কুল খুলেছেন ড. এরশাদুল বারী। একাধিক শিক্ষক থাকার পরও তিনি নিজেই ওই স্কুলের ডিন হয়েছেন। তিনি 'এডুকেশন' স্কুলেরও ডিন হিসেবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পাঁচ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপককে ডিঙিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার দুই শিক্ষককে ডিনের দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু 'ল' স্কুলে সহযোগী অধ্যাপক থাকলেও এখানকার ডিন হয়েছেন নিজেই।

জামায়াতপন্থী শ্বশুর-জামাইকে নিয়োগ: ড. বারীর মেয়াদে নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রায় সবাই জামায়াত সমর্থক। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত সমর্থক শিক্ষক নেতা অধ্যাপক ড. এ কিউ এম বজলুর রশিদকে তিনি কৃষি অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগ দিয়ে দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপক করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ও নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন পদে জামায়াত-শিবিরের ২৪ নেতা-কর্মী ও সমর্থককে নিয়োগ দিয়েছেন ড. বারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত সমর্থকেরা কতটা শক্তিশালী তার প্রমাণ জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের গত নির্বাচনে ১৫টি পদের মধ্যে ১৪টিতেই জামায়াত সমর্থকেরা নির্বাচিত হন।

অনিয়ম ঠেকাতে টাকা বন্ধ: বাজেট বরাদ্দের বাইরে জনবল নিয়োগ না দেওয়ার জন্য ইউজিসি বারবার অনুরোধ করলেও ড. বারী তোয়াক্কা করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভালো হওয়া সত্ত্বেও ঘাটতি বাজেট পেশ এবং অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে জনবল নিয়োগ করায় ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রায় ২১ কোটি টাকা আটকে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, এত টাকা আটকে থাকলে আর্থিক সংকট তো হবেই। কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাওনা বিল আটকে যাওয়ার কথাও স্বীকার করেন।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার একজন আইনের শিক্ষক হলেও সেখানে অসংখ্য বেআইনি কাজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত সত্য।'

সাত তথ্য চেয়েছে ইউজিসি: সর্বশেষ ১ মার্চ ইউজিসি সাতটি তথ্য দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেয়। এর মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছরের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কপি, সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশ ও অপেক্ষমাণ তালিকা, অস্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা এবং জনবলের বেতনের মাসিক হিসাব। এ ছাড়া উপাচার্য যে নয়টি টেলিফোন এবং মোবাইল ব্যবহার করেন সেগুলোর বিলের কপি, তাঁর গুলশানের বাসায় ব্যবহারের জন্য কেনা এসি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, আসবাব এবং গৃহসজ্জা সামগ্রীর তালিকা চাওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলেন, যদিও ইউজিসির এসব বিষয় জানার এখতিয়ার নেই, তবুও আমরা তথ্যগুলো পর্যায়ক্রমে জানাচ্ছি।

বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিবাদ: বক্তব্য চেয়ে পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশিত দুর্নীতির খবরের প্রতিবাদ করেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এসব প্রতিবাদ ছাপাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে - এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি কোষাধ্যক্ষ ফরিদ আহমেদ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মো. আবুল কাসেম শিকদার *প্রথম আলোর* প্রশ্নের জবাবে জানান, গত কয়েক বছরে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ জানাতে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। যদিও সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, 'উপাচার্য ড. বারী তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করতে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলের প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করেছেন।'

প্রতিহিংসা, স্বেচ্ছাচারিতা: এরশাদুল বারী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। বোর্ড অব গভর্নরস থাকলেও সেটি আছে তাঁর কব্জায়। কোণঠাসা থেকে থেকে সাবেক দুই সহ-উপাচার্য মেয়াদ পার করে গেছেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনো সহ-উপাচার্য নিয়োগ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মঞ্জুর-ই-খুদা তরফদারকে ওএসডি করে রাখা হয়েছে। তবে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ খান ও আর্থিক কর্মকান্ড পরিচালনাকারী পরিচালক (অর্থ) জহুরুল হক উপাচার্যের পছন্দের তালিকায় আছেন। জহুরুল হক সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অবসরে যাওয়ার পর ৩০ হাজার টাকা বেতনে আবার নিয়োগ পেয়েছেন অর্থ পরিচালক হিসেবে।

ড. বারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মাশেকুর রহমান খানকে দুবার বরখাস্ত করেছেন। আদালতের রায় পেয়েও ওই কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হন। সহকারী অধ্যাপক আনিছুর রহমানকে বরখাস্ত করার পর আইনের আশ্রয় নিয়ে তিনি চাকরি টিকিয়ে রেখেছেন। স্টুডেন্ট সাপোর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. আখতার হোসেনকে হয়রানিমূলকভাবে পদাবনতি করায় তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সাময়িক বরখাস্ত আছেন আঞ্চলিক পরিচালক খান মো. আব্দুল রশীদ। এ ছাড়া হয়রানিমূলক বদলি ও বরখাস্তের শিকার হয়েছেন আরও প্রায় ১৫০ কর্মকর্তা-কর্মচারী।

যেমন স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজের সহকারী অধ্যাপক তানভির আহসানকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দুদিন অনুপস্থিত থাকার কারণ জানতে চাওয়া হয় গত ডিসেম্বরে। তিনি জবাবে জানিয়েছেন, ওই দুদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ক্যাম্পাসের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর ডিন বিষয়টি জানেন। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে তাঁর দুদিনের অর্জিত ছুটি কেটে সমন্বয় করতে পারে। একই রকম চিঠি আর চারজন শিক্ষককে দেওয়া হলেও শুধু তানভির আহসানকে জবাব গ্রহণ না করে 'অননুমোদিত ছুটির কারণে কেন চাকরিচ্যুত করা হবে না'- এমন কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি এর জবাব দিতে ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় চান। কিন্তু নোটিশের জবাব দেওয়ার সময় পার হয়ে গেলে তাঁকে জানানো হয়- 'আপনাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না।' অধ্যাপক তানভির মনে করছেন, তাঁকে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত করতেই উপাচার্য এই ছুতো বের করেছেন।

পছন্দের লোককে নিয়োগ ও পদোন্নতি দেওয়ার জন্য এই উপাচার্য তিনবার নীতিমালা সংশোধন করেন। তিনি সহযোগী অধ্যাপকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও অস্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন। এসব অভিযোগের কোনোটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে চান না ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। প্রায় পাঁচ মাস ওএসডি করে রাখা বিশ্ববিদ্যালয়ের

রেজিস্ট্রার মঞ্জুর-ই-খুদা তরফদার *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আদালতের একটি চিঠি গ্রহণ করায় তিনি উপাচার্যের রোষানলে পড়েন। চিঠিটি গ্রহণ করায় উপাচার্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন।

স্ত্রীর ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন: অধ্যাপক বারী উপাচার্য হিসেবে যোগ দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসের বাড়িটি ছিল বসবাসযোগ্য কিন্তু তিনি এটিকে রেস্টহাউস হিসেবে ব্যবহার করে নিজের স্ত্রীর নামে থাকা গুলশানের ১৯০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেন। আর স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার পরও উপাচার্য ভবন পৌনে চার বছর নির্মাণাধীন দেখানো হয়। ভাড়াটিয়া হিসেবে ফ্ল্যাটের মালিক স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা ভাড়া দেন উপাচার্য। প্রথম ৪৬ মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৬ লাখ ১০ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া বাবদ নেন। এ বিষয়ে অডিট আপত্তি ওঠায় যোগদানের ৪৭তম মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসভবনে ওঠেন।

অভিযোগের শেষ নেই: এরশাদুল বারী ছাড়া এত অভিযোগ আর কোনো উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠেনি। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা খরচ করে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া সেন্টারে ২১ কোটি টাকার অকেজো যন্ত্রপাতি সরবরাহ করলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জামানতে টাকা ফেরত দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলকে নিজের নাম বসানো নিয়ে সংযোজন-সংশোধন, অস্বাভাবিক আপ্যায়ন ব্যয়, জ্বালানি তেল ব্যবহারে দুর্নীতি, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জামায়াতপন্থী একটি গ্রুপকে নিয়ে আসা প্রভৃতি।

অতীতও ভালো নয়: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগে ড. বারী ব্যাপক সমালোচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে থাকা অবস্থায় কয়েক দফা তাঁর কক্ষ ভাঙচুর করেন ছাত্ররা। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর এমফিল ডিগ্রি ১১ বছর ঝুলিয়ে রাখায় গত বছরের ৭ আগস্ট অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির নামে বৃক্ষশোভিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছপালা কেটে উজাড় করার ছবি তুলতে গেলে উপাচার্যের ব্যক্তিগত কর্মচারীরা দুজন ফটোসাংবাদিককে প্রায় ছয় ঘন্টা আটকে রাখেন।

গত জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সময় অধ্যাপক বারী একই রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এবং হাওয়া ভবনে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন।

জমিদারতন্ত্র: উপাচার্য এরশাদুল বারীর কক্ষে সবাইকে খালি পায়ে ঢুকতে হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসের ভেতর কেবল উপাচার্য পরিবারের সদস্য ছাড়া সবাইকে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হয়। উপাচার্য তাঁর বাসভবনে স্থাপন করেছেন পর্যবেক্ষণ চৌকি (ওয়াচ টাওয়ার) যেখানে অস্ত্র তাক করে পাহারায় থাকে প্রহরী।

বক্তব্য দেবেন না ড. বারী: প্রায় এক সপ্তাহ ধরে উপাচার্য এরশাদুল বারীর বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই প্রতিবেদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগ এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের মাধ্যমেও অভিযোগগুলো সম্পর্কে

উপাচার্যের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। শেষমেশ গত বৃহস্পতিবার লিখিতভাবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ তাঁর জবাবের জন্য জনসংযোগ বিভাগে পাঠানো হয়।

জনসংযোগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক আবুল কাসেম শিকদার ফ্যাক্স পেয়ে জানান, বৃহস্পতিবার বক্তব্য দেওয়া সম্ভব নয়। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, শনিবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকে। রোববার উপাচার্য জবাব দেবেন। রোববার যোগাযোগ করা হলে বলা হয়, সোমবার দেবেন। কিন্তু সোমবার জনসংযোগ বিভাগ জানিয়েছে, উপাচার্য কোনো বক্তব্য দেবেন না।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এরশাদুল বারীমুক্ত
রাতে মালামাল নিতে দেওয়া হয়নি।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এরশাদুল বারীকে অপসারণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এ সংক্রান্ত ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্যাতিত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনাব বারীর অপসারণের খবরে গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে মিষ্টি বিতরণ করেছেন।

'উপাচার্য বারীর দুর্নীতির ভার বইতে পারছে না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে গত বুধবার *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমেদকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন শাখা থেকে তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে তিনি এ সংক্রান্ত চিঠি হাতে পাননি।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্র *প্রথম আলোকে* ড. বারীর অপসারণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সাপ্তাহিক ছুটির পর প্রকাশ হবে বলে সূত্রটি জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন ভুক্তভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী গতকাল এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও প্রধান উপদেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি রাহুমুক্ত হয়েছে। বিবৃতিতে ড. বারী ও তাঁর সহযোগীদের সীমাহীন দুর্নীতি তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, অধ্যাপক মো: আব্দুল রশীদ অধ্যাপক মনিরা হোসেন, সহকারী অধ্যাপক মো. আনিছুর রহমান, মেহেরুন্ন নেসা ও তানভীর আহসান সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো.জহুরুল ইসলাম, প্রভাষক মো. মনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য এরশাদুল বারী গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁর বাসভবন থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় রেজিস্ট্রার গাড়িসহ মালামাল আটকে দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত উপাচার্যের বাসা থেকে মালামাল দুটি ট্রাক ও একটি পিকআপ ভ্যানে তোলা হয়। এ খবর পেয়ে শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মালামাল সরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে রেজিস্ট্রার ড. নিয়াজ আহমেদ সিদ্দিকী ওই সব আবসাবপত্র না সরানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, কাল হিসাব-নিকাশ করে দেখা হবে এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পত্তি আছে কি না। এর পরই তিনি (উপাচার্য) মালামাল সরাতে পারবেন।

ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানে তোলা আসবাবপত্র নিরাপত্তা কর্মকর্তা আব্দুল গফুরের জিম্মায় আছে বলে রেজিস্ট্রার জানান।

সংশোধনী: গতকাল বুধবার প্রথম আলোয় প্রকাশিত 'উপাচার্য বারীর দুর্নীতির ভার বইতে পারছে না উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক খবরে অসাবধানতাবশত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফরিদ আহমেদকে উপাচার্যের পছন্দের ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোষাধ্যক্ষ নন, অর্থ পরিচালক হলেন ড. বারীর আস্থাভাজন ব্যক্তি, যিনি সব সুবিধা নিয়ে অবসরে যাওয়ার পর ৩০ হাজার টাকা বেতনে আবার নিয়োগ পেয়েছেন।

দুর্নীতির হাত ধরে হাজী দানেশ থেকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মোশাররফ

দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসাইন মিঞার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি দলীয়করণ ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগসহ নানা খাতে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও ছয় মাস আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান।

হাবিপ্রবির বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোতাহার হোসেন মন্ডল *প্রথম আলো*কে বলেন, শুরু থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে বর্তমান প্রশাসনকে। তিনি বলেন, 'গত সাড়ে চার বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম হয়েছে, তা তদন্তে সরকারের উচিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা।' বিএনপির অঙ্গসংগঠন জিয়া পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোশাররফ ২০০২ সালের ৮ এপ্রিল হাবিপ্রবির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান। প্রায় ৫২ মাস দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

হাবিপ্রবির রিজেন্ট বোর্ডের সদস্য ও বিএনপির সাবেক সাংসদ লে. জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান এই উপাচার্যের অনিয়মতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদ করেও কোনো ফল পাননি। ফলে গত বছরের ২ জুন তিনি রিজেন্ট বোর্ড থেকে পদত্যাগ করেন। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের কাছে পাঠানো পদত্যাগপত্রে জেনারেল মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, উপাচার্যের ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়োগে অনিয়মের কথা বলেন।

সম্প্রতি তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, সাবেক উপাচার্য, বর্তমান রেজিস্ট্রার ও জেলা বিএনপির কতিপয় নেতা মিলে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন।

দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আব্দুল মজিদ বলেন, 'রেজিস্ট্রার হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, নিয়োগ দিয়েছেন উপাচার্য, এবং রিজেন্ট বোর্ড সেটি অনুমোদন দিয়েছে। অবৈধ কোনো আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকলে সেটা উপাচার্যের সঙ্গে হতে পারে, আমার সঙ্গে নয়।'

৫২ মাসে ২৫৬ নিয়োগ: ড. মোশাররফ তাঁর সময়ে ৪৮ জন শিক্ষক ও ২০৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয়করণ ছাড়াও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ আছে, চাহিদামতো অর্থ না দেওয়ায় নিয়োগ পাওয়ার পরও কয়েকজন যোগ দিতে পারেননি। ২০০৩ সালের ১০ জুলাই বিরল উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের রতনচন্দ্রকে কর্মচারী হিসেবে মাস্টাররোলে

নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৪ জুলাই তিনি যোগদানও করেন। রতনের অভিযোগ, দাবি অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় দুই দিন পরই তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হয়।

সূত্র জানায়, ইউজিসি উপাচার্য ড. মোশাররফের নেওয়া ১০৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নিয়োগ অনুমোদন করেনি। অনিয়মের কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা কয়েক কিস্তির টাকা ছাড় বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল মজিদ এর সত্যতা স্বীকার করেছেন ।

নিজের ৩৩ জন, গৃহপরিচারিকার ছয়জন: ড. মোশাররফ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩ জন স্বজনকে নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। এর মধ্যে তাঁর বড় ভাই শামসুল ইসলাম মিঞার ছেলেকে সেকশন অফিসার হিসাবে, আরেক ভাই মিজানুর রহমান মিঞার এক ছেলেকে সংস্থাপন শাখায়, আরেকজনকে হিসাব বিভাগে, ভায়রার ছেলেকে সেকশন অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া ভাতিজি-জামাই, শ্যালকসহ আত্মীয় ও আত্মীয়ের ঘনিষ্ঠদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিস্ময়কর হলো উপাচার্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বাসার গৃহপরিচারিকার পরিবারসহ ওই পরিবারের ঘনিষ্ঠ অন্তত ছয়জনকে চাকরি দিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। গৃহপরিচারিকার ছেলেকে ফটোকপি মেশিন অপারেটর, পুত্রবধূকে গ্রন্থাগার সহকারী, পুত্রের শ্যালিকাকে পিয়ন, শ্যালিকার স্বামীকে হিসাব বিভাগ এবং ওই স্বামীর পরিবারের আরও দুজনকে দুটি শাখায় নিয়োগ দেন।

তিনটি কার্যালয়: নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি কার্যালয় বানিয়েছেন সাবেক উপাচার্য ড. মোশাররফ মিঞা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ক্যাম্পাস থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে স্থানীয় লিয়াজোঁ কার্যালয় ও ঢাকার ধানমন্ডিতে আরেকটি লিয়াজোঁ কার্যালয়-কাম-অতিথিশালা স্থাপন করেন তিনি। স্থানীয় লিয়াজোঁ কার্যালয়ের জন্য ছিল সাতজন কর্মচারী । উপাচার্যের পিএস মো. রেজাউল ইসলাম ওই কার্যালয়টি নিয়ন্ত্রণ করতেন। মাসে ১২ হাজার টাকা ভাড়া ছাড়াও এখানে কর্মরতদের বেতন ও আনুষঙ্গিক খাতে খরচ দেখানো হয়েছে গড়ে ৫০ হাজার টাকা করে। ঢাকা লিয়াজোঁ কার্যালয়ের জন্যও মাসে প্রায় সমপরিমাণ টাকা খরচ দেখানো হয়।

বিস্ময়কর অনুপাত: ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫ অনুযায়ী ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল ৯০৩ জন এবং শিক্ষক ৯৫ জন। অর্থাৎ প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক। আর কর্মকর্তা ৫৪ জন এবং সহায়ক কর্মচারী ২৭৭ জন। গড়ে প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর জন্য আছেন একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু ব্যয় ৪৪ হাজার ৮২০ টাকা হলেও হাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ব্যয় ৫৪ হাজার ৮১৭ টাকা।

বাবা উপাচার্য তাই: উপাচার্য থাকাকালে ড. মোশাররফের ছেলে ঢাকায় হাবিপ্রবির একটি পাজেরো (নম্বর ঘ-১১-০০১২) সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতেন। গাড়ির তেল ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ প্রতিমাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে প্রায় ৪০ হাজার টাকা নেওয়া হতো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ

গাড়ির জন্য কোন চালক ছিল না। উপাচার্যপুত্র নিজেই গাড়িটি চালাতেন। গাড়িটির লগবই সংরক্ষণ করতেন উপাচার্যের আরেকটি পাজেরোর (নম্বর দিনাজ-ঘ-১১-০০১৩) চালক চুমকু সরেন। চুমকু *প্রথম আলোর* কাছে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

লাগামহীন অপচয়: সাবেক উপাচার্য তিনটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন। দুটি মোবাইল ফোনের বিল হিসেবে ১৫ মাসে (১৫ জুন ২০০৫ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে নিয়েছেন এক লাখ ৭০ হাজার ১৮১ টাকা। তাঁর গাড়ির জ্বালানি ও বাড়ির যাবতীয় ব্যয় বাবদ মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। ৩০ আগস্ট তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার পর এসব খাতে খরচ বন্ধ করা হয়েছে। গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে স্থানীয় লিয়াজোঁ কার্যালয়। সাবেক উপাচার্যের মেয়াদে ঢাকার শ্যামলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬৫ লাখ টাকার দুটি ফ্ল্যাট কেনায় প্রায় ২৫ লাখ টাকা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

সাবেক উপাচার্যের বক্তব্য: ড. মোশাররফ মিঞা *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, অনিয়ম করে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। বৈধ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নিয়োগের দায়িত্ব পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটি। ইউজিসি সব নিয়োগের অনুমোদনও দিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

আর্থিক অনিয়ম প্রসঙ্গে সাবেক উপাচার্য বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। আমি কোনো অনিয়ম করিনি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্ল্যাট কেনা বা নিজের ফ্ল্যাট সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক অনিয়ম হয়নি দাবি করে তিনি বলেন, 'এ রকম অনিয়ম কেউ প্রমাণ করতে পারবে না।'

ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাজেরো ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'একজন উপাচার্য ভিভিআইপি মর্যাদার লোক, চ্যান্সেলরের পরই তাঁর স্থান। কাজেই আমার ছেলেমেয়েরা সেই সৌভাগ্য নিয়েই জন্মেছে। উপাচার্য পরিবারের সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ গাড়ি তারা ব্যবহার করবে, এটাই স্বাভাবিক।' রিজেন্ট বোর্ডের পদত্যাগী সদস্য মাহবুবুর রহমানের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রিজেন্ট বোর্ডের সভায় নিয়োগগুলো অনুমোদন হয়েছে, সে সময় তিনি এসব প্রশ্ন তোলেননি।

স্থানীয় ক্ষোভ: দিনাজপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম বলেছেন, সাবেক উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারসহ কয়েকজনের লাগামহীন অনিয়ম, দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট দিনাজপুর শাখার আহবায়ক মির্জা আনোয়ারুল ইসলাম তানু একই দাবি জানিয়ে বলেন, অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য এবং দলীয় লোকদের নিয়োগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নেওয়া হয়েছে। তিনি অযোগ্যদের বাদ দিয়ে মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

ইউজিসির বক্তব্য: ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানসহ তদন্ত কমিটির তিন সদস্য গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়োগ, নির্মাণ, মুদ্রণ ও কেনাকাটায় ব্যাপক অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছেন। উপাচার্য ছাড়াও রেজিস্ট্রার, একটি জাতীয় দৈনিকের স্থানীয় প্রতিনিধি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বোন প্রয়াত মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হকের আশীর্বাদপুষ্ট কিছু ব্যক্তিসহ স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের কিছু নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান বলেছেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কিছু বলতে চাই না। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্ময়কর সব দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট কৃষকনেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশের নাম অনুসারে তাঁর নিজ জেলা দিনাজপুরে ১৯৮৮ সালের ১১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করা হয় কৃষি কলেজ। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় না থাকা ১২টি পুরোনো জেলায় একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের আওতায় কৃষি কলেজটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তর করা হয়। দিনাজপুর শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে ৬৬ একর জায়গার ওপর এ বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন চান শিক্ষাবিদেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করা দরকার বলে মনে করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। কয়েকজন উপাচার্যের দুর্নীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ পদে কাদের আসা উচিত, দীর্ঘদিনের সেই অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাবে তাঁরা এ মত দেন।

এক সপ্তাহ ধরে *প্রথম আলোর* ধারাবাহিক প্রতিবেদন 'উপাচার্য-কথা' প্রকাশের পর শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, দুর্নীতি এবং অনিয়মের সঙ্গে জড়িত উপাচার্যদের অপসারণই কি যথেষ্ট? তাঁরা মনে করেন, উপাচার্য পদে আসীন হয়ে অধ্যাপকদের কেউ কেউ শিক্ষকতা পেশা এবং গুরুত্বপূর্ণ এই পদকে যেভাবে কলুষিত করেছেন তার বিচার হওয়া উচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন-ইউজিসি ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একমাত্র বেসরকারি সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম তদন্ত করছে। এগুলো শেষ হওয়ার পর আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তদন্ত হবে।

ইতিমধ্যে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এরশাদুল বারীকে অপসারণ করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. খলিলুর রহমান নিজ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ মিললে আরও কয়েকজন উপাচার্যকে শিগগিরই অপসারণ করা হতে পারে। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরিও ৬ মার্চ সংবাদ সম্মেলনে *প্রথম আলোর* প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্ত উপাচার্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, সমাজের সর্বক্ষেত্রের মতো বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দুর্বলতা, ফাঁকফোকর এবং উপাচার্যের প্রভাবে সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হলেও এসব সিদ্ধান্ত হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'একজন শিক্ষক হিসেবে আমিও লজ্জা পাচ্ছি। একজন অধ্যাপক উপাচার্য হয়ে এ ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম করতে পারেন- এটা বিশ্বাস করাও কঠিন।' অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের (২০০৩) প্রতিবেদনে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটির (সার্চ কমিটি) মাধ্যমে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালে জোট সরকার ওই সুপারিশ বাস্তবায়ন দূরে থাক, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অযোগ্য এবং দলীয় শিক্ষকদের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেয়। এ দলীয় উপাচার্যদের অনেকেই অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের মতো দুর্নীতি ও অনিয়ম করেছেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের সুখের স্মৃতি নিয়ে বের হওয়ার কথা। সেখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীত, খেলাধুলা, বিতর্ক, নাটকসহ সংস্কৃতিচর্চা থাকবে। আর

এসব নেতৃত্ব দেবেন একজন উপাচার্য, যাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মান নিয়ে প্রশ্ন থাকবে না। তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি অনুভূত হবে সবখানে।

ইউজিসি ২০ বছরের (২০০৫-২০২৫) যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে পেশ করেছিল তাতেও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট। পরিকল্পনায় উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ওই কমিটি উপাচার্য পদে পাঁচজনের নাম প্রস্তাব করতে পারে। এই পাঁচজনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তিনজনকে মনোনীত করবে। ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে উপাচার্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে পারবেন আচার্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, দেশে এখন ২৮টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিরপেক্ষ ও যোগ্য উপাচার্য খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, প্রত্যেক শিক্ষকের কোনো না কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি আছে। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, উপাচার্য হওয়ার মতো যোগ্য লোক অনেকেই আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বড়জোর চার ভাগের এক ভাগ রাজনীতি করেন। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদেরই চেহারা দেখা হয়। অথচ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিবান, শিক্ষিত ও সাহসী শিক্ষক আছেন। এরপরও যদি সরকার উপাচার্য হওয়ার মতো যোগ্য শিক্ষক খুঁজে না পায় তাহলে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে পারে। ওই কমিটিতে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষাবিদকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

তাঁর মতে, উপাচার্য হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ একাডেমিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নয়নে তিনি মেধাকে কাজে লাগাবেন। যাঁর শিক্ষাগত উৎকর্ষ বা লক্ষ্য নেই, যিনি অতি সহজেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তাঁর এ পদে আসা বা থাকার যোগ্যতা নেই। তারপরও যদি কোনো উপাচার্য সরকার বা অন্য কোনো চাপের মুখে পড়েন, সে ক্ষেত্রে নীতিবোধ থাকলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

মোজাফফর আহমদ বলেন, যেসব উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, এসব যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে দেশের প্রচলিত আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, উপাচার্যদের দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির যে খবর দেখলাম তাতে কেবল আমি নই, সবাই বিমূঢ় বোধ করছেন। পত্রিকায় তা কয়েকজনের কথাই জানলাম, এ রকম 'সম্ভাবনাপূর্ণ শিক্ষক' যে আরও আছেন, তা অনুমান করা যায়।

উপাচার্য মনোনয়নের বর্তমান পদ্ধতির বদল হওয়া দরকার মন্তব্য করে তিনি বলেন, সরকারি কর্মকমিশনেরও যেসব কাহিনী শোনা যাচ্ছে তাতে ওই প্রতিষ্ঠানের ওপরও ভরসা করা যায় না। এখন নিরপেক্ষ একটি সন্ধান পরিষদ গঠনের কথা ভাবতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিবেচনা করে উপাচার্য পদে কয়েকটি নাম এ পরিষদ সরকারের কাছে পাঠানোর সুপারিশ করবে।

উপন্যাসের নায়ক শাহজালালের সাবেক উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন

উপাচার্য চরিত্র নিয়ে বাংলা ভাষায় যে তিনটি উপন্যাস আছে তার একটির নায়ক হলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের সাবেক উপাচার্য মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'মহব্বত আলীর একদিন' উপন্যাসে মোসলেহ উদ্দিনের নাম নেই। কিন্তু উপাচার্য হওয়ার পর থেকে তিনি কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দলীয়করণ, দুর্নীতি, ওপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহার করেছেন- তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

এর আগে প্রয়াত আহমদ ছফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক উপাচার্যের কর্মকান্ড নিয়ে লিখেছিলেন 'গাভী বৃত্তান্ত' উপন্যাস। তারও আগে ভারতে জওয়াহেরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রশাসনকে নিয়ে চাণক্য সেন লিখেছিলেন 'ব্রুটাস তুমিও!'। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর জওয়াহেরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্মথন দেওয়া প্রসঙ্গে উপন্যাসটি লেখা হয়।

বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারে আমলে যে তিনজন উপাচার্য ছাত্র আন্দোলন ও সমালোচনার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হন তাঁদের একজন হলেন ড. মোসলেহ উদ্দিন। জোট সরকারের আশীর্বাদ থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের মুখে তিনি টিকে থাকতে পারেননি।

উপাচার্য পদ কেন ছেড়ে দিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন বলেন, 'আমি পরিস্থিতির শিকার। কাউকে দোষ দিতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি, ছাত্রদের ভুল বুঝিয়ে উসকে দেওয়া হয়েছিল।'

উপাচার্য হয়েও সন্তুষ্ট ছিলেন না: ড. মোসলেহ উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোকপ্রশাসন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে তাঁর পদোন্নতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও অভিযোগ ছিল। ২০০২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি শাবিপ্রবির সহ-উপাচার্য পদে যোগ দেন। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে উপাচার্য অধ্যাপক শফিকুর রহমান অপসারিত হওয়ার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পান। ২০০৪ সালের ২ অক্টোবর জোট সরকার তাঁকে পুরোপুরি উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়। তিনি সহ-উপাচার্য হিসেবে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও উপাচার্য হিসেবে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি হয়ে ওঠেন একক ক্ষমতার অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে ড. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা সিন্ডিকেট কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দিতে পারে না। তবে কোষাধ্যক্ষ না থাকায় উপাচার্য হিসেবে তিনি কিছু দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া উপাচার্য না থাকায় সহ-উপাচার্য হিসেবে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাবেক উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদ তথা প্রক্টর, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা, প্রভোস্ট, পরিবহন প্রশাসক পদে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের নিয়োগ দেন। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অর্থ

কমিটি, নিয়োগ কমিটি, টেন্ডার কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব কমিটি তিনি সাজিয়েছিলেন দলীয় লোকদের দিয়ে।

বাসভবন সাজাতে দুর্নীতি : ২০০২ সালের ৪ মার্চ সহ-উপাচার্যের বাড়িভাড়াসহ বাড়ি ও অফিসের যাবতীয় মালামাল কেনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী কমিটির কাজ পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করেন। বাকি তিন সদস্য তাৎক্ষনিক ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো কেনার বিষয়টিকে পর্যায়ে ভাগ করে ওই বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার লাখ টাকার আসবাব কেনেন। কিন্তু বাজেটে এই অর্থ বরাদ্দ ছিল না। পরে এই অর্থ অন্য প্রকল্প থেকে নেওয়া হয়।

ড. মোসলেহ উদ্দিন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পর ২০০৪ সালের অক্টোবরে উপাচার্যের বাসভবনে বসবাস শুরু করেন। এর আগে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শফিকুর রহমান প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ করে উপাচার্যের বাসভাবনের জন্য আসবাব ক্রয় করেন। ড. মোসলেহ উদ্দিন একই বাসভবনের জন্য আবারও প্রায় তিন লাখ টাকা খরচ করে পর্দা, ফ্রিজ, টিভি ও বিভিন্ন আসবাব দরপত্র আহবান ছাড়াই কিনে ফেলেন। এছাড়া বাসভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, বাথরুম ঠিক করা, ফিটিংসসহ বিভিন্ন খাতে তিনি প্রায় প্রতি মাসেই ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে নিতেন। বাসভবন রং করানোর ছয় মাস পরেই একই কাজের জন্য ড. মোসলেহ উদ্দিন পুনরায় এক লাখ ৬০ হাজার টাকা খরচ করেন। বাসভবনের কার্পেট পরিবর্তন করা হয় এক লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে। প্রধান ফটক বদলান আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে। মাছ চাষের জন্য বাসভবনের চারপাশে খনন করা হয় কয়েকটি পুকুর। এ ছাড়া বাসভবনে গাভি পোষা হতো।

যাওয়ার সময় নিয়ে গেলেন : গত বছরের ১৪ মে ছাত্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন ড. মোসলেহ উদ্দিন। বাসভবন ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে কেনা সাড়ে তিন লাখ টাকার তিনটি খাট, ডাইনিং টেবিলসহ আটটি চেয়ার, ৫০ হাজার টাকা দামের সোফা সেট, একটি টেলিভিশন, দুটি ফ্রিজ, দুটি এয়ারকন্ডিশনার, দুটি আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, ডিনার সেট, কম্পিউটার, আলনা, বাসনপত্র, গাছের কাঁঠাল, তিনটি গাভিসহ প্রায় আট লাখ টাকার সামগ্রী দুটি ট্রাকে ভর্তি করে নিয়ে যান।

এরপর গত বছরের ৫ জুলাই ড. মোসলেহ উদ্দিন ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির কর্মীদের সশস্ত্র প্রহরায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। সিন্ডিকেটের বৈঠকে তিনি জানান, এসব মালামাল অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সূত্রমতে বাসভবনের বিভিন্ন খরচ বাবদ এক বছরে তিনি ব্যয় করেন প্রায় তিন লাখ টাকা।

এ প্রসঙ্গে ড. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসার সময় তিনি বইপত্রসহ ঢাকার বাসা থেকে নেওয়া মালামাল ফেরত এনেছেন। এ ছাড়া তাঁর নিজেরও অনেক মালামাল আগুনে পুড়ে গেছে, এর ক্ষতিপূরণও তিনি নেননি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, তিনি যেসব মালামাল এনেছেন তা বিশ্বাবিদ্যালয়ে নথিভুক্ত আছে। ২০০৬ সালের ১৪ মে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবনে আগুন দেন।

গাড়ি, আপ্যায়ন ও মোবাইল: ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ড. মোসলেহ উদ্দিনের ব্যবহৃত মাইক্রোবাসের জ্বালানি বিল দেখানো হয় ৭২ হাজার টাকা। এভাবে প্রায় প্রতি মাসেই জ্বালানি তেল বাবদ বিপুল পরিমাণ

অর্থ নিয়েছেন। গত বছর তাঁর ব্যবহৃত গাড়ির জ্বালানি বাবদ ব্যয় হয় পাঁচ লাখ ২৭ হাজার টাকা। পরিবহন খাতে যন্ত্রাংশ মেরামত বাবদ তিনি বছরে তিন থেকে চার লাখ টাকা নিতেন।

বিদায়ের আগে এক বছরে ড. মোসলেহ উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে আপ্যায়ন বাবদ তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা, মোবাইল বিল বাবদ ৬৫ হাজার টাকা নেন। এ ছাড়া ঢাকায় বিমানযোগে আসা-যাওয়া বাবদ বিল নিয়েছেন এক লাখ ২০ হাজার টাকা।

এসব বিষয়ে উপাচার্য বলেন, এত টাকা আপ্যায়ন বিল তিনি নেননি। মাসে ব্যক্তিগত আপ্যায়নের জন্য ৫০০ টাকা নিতেন। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোবাইল বিল দেওয়া হতো দেড় হাজার টাকা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের চেয়ারম্যান থাকাকালে ঘন ঘন ঢাকায় গেছেন। সেক্ষেত্রে হাতে সময় থাকলে গাড়িতে এবং সময় কম থাকলে বিমানে ঢাকায় গেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোসলেহ উদ্দিন জানান, তাঁর নিজের কোনো বাড়ি নেই, নতুন কোনো গাড়িও কেনেননি। এগুলো অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিয়োগ-বাণিজ্য, একাই সব কমিটির প্রধান: বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৫৫ জনই ড. মোসলেহ উদ্দিন নিয়োগ দিয়েছেন। একাধারে তিনি উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সমমানের কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান, সহ-উপাচার্য পদের শূন্যতার সুযোগে সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান এবং কোষাধ্যক্ষ পদের শূন্যতার সুযোগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ফলে তাঁর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫৫ জন শিক্ষক, ৫১ জন কর্মকর্তা ও ১৩৪ জন কর্মচারী নিয়োগ পেয়েছেন। এদের অধিকাংশই বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত অথবা উপাচার্যের আত্মীয়স্বজন।

নিয়োগে অনিয়ম সম্পর্কে সাবেক উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে সব নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কে বিএনপি, কে জামায়াত এটা দেখা হয়নি। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষক অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদেশে ছিলেন, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ড. মোসলেহ উদ্দিনের দুর্নীতির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী বলেন, 'সবাই যা জানে আমিও সেটুকু জানি। তবে আমাকে জড়িয়ে সাবেক উপাচার্য কিছু করতে পারেননি।'
শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ড. আখতারুল ইসলাম বলেন, সাবেক উপাচার্যের ধ্বংসাত্মক অনিয়ম, দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার হওয়া উচিত।

সাবেক উপাচার্যের পথে বর্তমান উপাচার্য: গত বছরের ২২ অক্টোবর ড. এম আমিনুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এবং তাকে বলা হতো প্রয়াত উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদের 'হাতের পুতুল'।
শাবিপ্রবির উপাচার্য হওয়ার পর আমিনুল ইসলাম আগের সাজানো প্রশাসন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। বর্তমানে প্রক্টর, প্রভোস্ট, ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা, সিন্ডিকেটসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ সব পদে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকেরাই অধিষ্ঠিত আছেন।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য আমিনুল ইসলাম জানান, ধাপে ধাপে এসব পদ পরিবর্তন করা হবে।

ছাত্রীদের দাবি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হলে কোনো মহিলা প্রাধ্যক্ষকে নিয়োগ দেননি বর্তমান উপাচার্য। বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি ওই হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তবে উপাচার্য বলেছেন, এ পদের জন্য জ্যেষ্ঠ শিক্ষক খোঁজা হচ্ছে।

সিন্ডিকেটের ১২৮ তম সভায় প্রকাশনাসহ সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক ড. মাকসুদুর রহমানকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে অপর শিক্ষক সামসুজ্জোহার প্রকাশনা সন্তোষজনক না হলেও তাঁকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করে উপাচার্য বিজ্ঞাপিত পদের বাইরে জামায়াতপন্থী শিক্ষক ড. আব্দুল সালাম বিশ্বাসকে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেন। বিষয়টি অবগত না থাকায় রসায়ন বিভাগের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুস ওই নিয়োগসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবহিত করার জন্য ৪মার্চ উপাচার্যকে চিঠি দেন।

এ বিষয়ে উপাচার্য ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, সিন্ডিকেটে সর্বসম্মতিক্রমে ওই শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগে ৩৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন নয়জন। বিজ্ঞাপিত পদ দুটির জায়গায় উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছেন তিনজনকে।

এ ব্যাপারে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, আগে স্থগিত থাকা নিয়োগগুলোই দেওয়া হয়েছে। আর নয়জন শিক্ষক লোকপ্রশাসন ছাড়াও পলিটিক্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ক্লাস নেন বলে জানান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে এই বিভাগের কোনো কার্যালয়, শ্রেণীকক্ষ কিংবা বিভাগীয় প্রধান নেই।

ড. এম আমিনুল ইসলাম সাবেক উপাচার্যকে রক্ষার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। সাবেক উপাচার্যের মেয়াদে ঘটে যাওয়া অনিয়ম দূর করার বদলে একই পথে হাঁটছেন তিনি । এ প্রসঙ্গে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, সাবেক উপাচার্য সম্পর্কে ইউজিসি যে সিদ্ধান্ত দেবে, তাই তিনি বাস্তবায়ন করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দেশের প্রথম সারির এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব বিভাগে শিক্ষক সংকট চললেও একজনের বদলে চারজন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নষ্ট করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম তদন্ত করা হবে বলে জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, সাবেক উপাচার্য দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রত্যেকটি শাখাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁর দুর্নীতির সহযোগীরা এখনো প্রশাসনে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করতে হলে এসব দুর্নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি স্বজনপ্রীতির চাষ!

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) সিন্ডিকেট সভায় ঢুকে পড়েছিলেন ছাত্রদলের নেতারা। দাবি, 'জোট সরকার ক্ষমতায়, তাই ছাত্রদলের নেতাদের চাকরি দিতে হবে।' দফায় দফায় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে এভাবে চাকরি বাগিয়ে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব প্রভাবশালী নেতা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এম ফারুক এবং কোষাধ্যক্ষ আকবর আলী সিরাজীও দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছিলেন।

গত পাঁচ বছরে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বিএনপি-জামায়াতের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। রাজধানীতে অবস্থিত দেশের ক্ষুদ্র এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ব্যঙ্গ করে অনেকে 'ছাত্রদলের নেতাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র' বলে থাকে। শুরু থেকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও নিয়োগ-অনিয়মে কৃষিশিক্ষার জন্য বিশেষায়িত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তাই বিশ্ববিদ্যালয়টির আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দলীয় ও আত্মীয়করণ: বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের এক নেতার ছেলে স্নাতকে প্রথম শ্রেণীতে ৩৫তম হলেও প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিন ও জিয়া পরিষদের এক নেতা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মেয়ে শাখা কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পান। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদকের স্ত্রী এসএসসিতে তৃতীয় বিভাগ পেয়েও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ থাকলে তিনি এ পদে আবেদনের অযোগ্য। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুই কর্মকর্তার বোন ও শ্যালিকাও নিয়োগ পেয়েছেন যোগ্যতার ঘাটতি নিয়ে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাবেক তিন সাধারণ সম্পাদকেরও চাকরি হয়েছে। এদের একজন উপাচার্যের ব্যক্তিগত সহকারী, আরেকজন শাখা কর্মকর্তা। তৃতীয়জন সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পান। ছাত্রদলের সাবেক এক ক্যাডার বহিরাঙ্গন কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পান। ছাত্র সংসদের সাবেক এক সাধারণ সম্পাদক উপ-রেজিস্ট্রার এবং ছাত্রদলের সাবেক আটজন সহসভাপতি, একজন ক্রীড়া সম্পাদক এবং একজন যুগ্ম সম্পাদক শাখা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। ভূ-সম্পদ কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পান ছাত্রদলের সাবেক এক সহসভাপতি। কুষ্টিয়া-২ আসনের সাবেক সাংসদ শহীদুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পান। ওই পদে বিমানবাহিনীর নিরাপত্তা শাখার অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জান মৃধা আবেদন করেছিলেন, চাকরি হয়নি।

দলীয়করণের অভিযোগ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও । প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া যুগল কিশোর নাথ ঝন্টু ও দ্বিতীয় মো. জুলকারনাইন প্রভাষক পদে নিয়োগ পাননি। পরবর্তী সময়ে প্রথম শ্রেণীতে ৩২তম, ২৯তম, ২৭তম (উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগ), ২৩তম, ২২তম, ১৩তম (উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় বিভাগ) ও ১২তম স্থান পাওয়া প্রার্থীদের প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর প্রথম শ্রেণীতে ৫২তম হয়েছেন এমন একজন খন্ডকালীন প্রভাষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। কারণ একটাই, এঁরা সবাই ছাত্রদলের সাবেক নেতা।

এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতিকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সাবেক এক সহসভাপতিকে শাখা কর্মকর্তা হিসেবে যখন নিয়োগ দেওয়া হয় তখন তাঁরা ছাত্রদলের নেতা হাসু খুনের মামলার আসামি ছিলেন। জোট সরকারের শেষের দিকে মামলাটি খারিজ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আবু আকবর মিয়ার শ্যালিকা, ভাতিজা, নাতনি, ভাগিনা, গৃহপরিচারিকার স্বামীও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন।

উপাচার্য দাবি করেছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে কে কোন দল করে, কে কার আত্মীয়- এসব দেখা হয়নি। তিনি আরও বলেন, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেও নিয়োগ বোর্ডের নেওয়া মৌখিক পরীক্ষায় যুগল কিশোর নাথ মোটেই ভালো করতে পারেননি। 'পরীক্ষার ফলাফলই যোগ্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না' বলে মন্তব্য করেন উপাচার্য ।

বয়স নেই, তবু চাকরি: ২০০৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ণাঙ্গ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৫ জন শিক্ষককে স্থায়ী করা হয়। একাধিক সূত্র জানায়, এর মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের নিয়োগপত্রে কমপক্ষে এক বছর আগের তারিখ বসিয়ে চাকরি দেওয়া হয়। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগে একজন প্রভাষককে নিয়োগ দেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৪ বছর। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা ছিল, 'বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর হতে হবে।' ওই বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. নজরুল ইসলাম দুটি নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন তোলেন।

চাকরির জন্য জমা দেওয়া কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ৩৪ বছর আট মাস বয়সে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে একজন এবং ৩৪ বছর ছয় মাস বয়সে পশুপালন বিভাগে আরেকজন শাখা কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পান। এ ছাড়া ৩১ থেকে ৩৩ বছর বয়সে নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ডিন কার্যালয়, প্রাণরসায়ন বিভাগ, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, পরীক্ষা শাখার নয় জন শাখা কর্মকর্তা বা সহকারী। উপাচার্য বলেন, ইউজিসির নিয়োগ নীতিমালায় সর্বোচ্চ বয়সের বিষয়টির উল্লেখ নেই।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি উপ-রেজিস্ট্রার, একটি উপপরিচালক, একটি সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, দুজন শাখা কর্মকর্তা পদে স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে আর কোনো প্রার্থীই মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাননি। নিয়োগ বোর্ডের সভায় প্রতিটি পদের বিপরীতে শুধু উল্লিখিত নিয়োগপ্রাপ্তরাই উপস্থিত হন। অভিযোগ আছে, অন্যদের আবেদনপত্রগুলো বাছাই করেন অস্থায়ী ভিত্তিতে চাকরিরত এসব প্রার্থী। তাঁরা অন্য প্রার্থীদের আবেদনপত্র গায়েব করে ফেলেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তিনটি পদে আরও ২০ জন আবেদন করেছিলেন। উপাচার্য অবশ্য বলেন, তখন আবেদন কম পড়েছিল। এ নিয়োগের পর থেকে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অপূর্ণাঙ্গ সিন্ডিকেট, ঢালাও দলীয়করণ: তিন বছর ধরে শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়াই চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ- সিন্ডিকেট। ১৭ সদস্যের সিন্ডিকেটের সাতটি পদই খালি। এ সুযোগেই চলছে দলীয় নিয়োগ। গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর রাতে ছয়জন শিক্ষক, ১৪ জন কর্মকর্তা ও ১২৭ জন কর্মচারীর নিয়োগ স্থায়ী করা হয়। জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের সংগঠন সচেতন শিক্ষক সমাজ বিধিবহির্ভূত এ ধরনের নিয়োগের বিরোধিতা করে সিন্ডিকেট নির্বাচনের দাবি জানায়। সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বারবার শিক্ষকেরা এ নিয়ে উপাচার্যের কাছে গেছেন, নির্বাচন চেয়েছেন, কিন্তু উপাচার্য কোনো কথাই শোনেননি।'

উপাচার্যের দাবি, শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের নতুন সংবিধি তৈরি করে তা ইউজিসির মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আর সিন্ডিকেট অপূর্ণাঙ্গ হতেই পারে, কোরাম তো হচ্ছে। তিনি বলেন, চাপের মুখে হয়তো কোনো কোনো সময় নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছে।

পেছনের তারিখে ১০০ নিয়োগ: গত বছরের ২৮ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগে বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু আগের তারিখ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। যদিও উপাচার্য দাবি করেন, নিয়ম অনুযায়ী এবং সময়মতো এসব প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তদন্ত হবে। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান জানান, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তদন্ত চলছে সেগুলোর কোন কোনটির চেয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক বেশি অনিয়মের অভিযোগ আছে।

মুক্তিযোদ্ধা কোটা লঙ্ঘন: উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক পদে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আলবেলী আফিফা মীর আবেদন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক এক সহসভাপতি ওই কোটায় নিয়োগ পান। আবার বাবার মুক্তিযোদ্ধার জাল সনদ দেখিয়ে একজন উপ-রেজিস্ট্রারের দুই আত্মীয়কে সেকশন অফিসার পদে নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তবে উপাচার্য বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটার চেয়ে প্রার্থীর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

জুটেছেন কুষ্টিয়ার গডফাদার শহীদুল: কুষ্টিয়া-২ আসনের বিএনপির সাবেক সাংসদ শহীদুল ইসলাম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হয়েছেন তিন-তিনবার। বিভিন্ন সভায় যোগ দিতে পাঁচ বছরের অন্তত ৪৭ বার বিমানভাড়া বাবদ কমপক্ষে সাড়ে তিন লাখ টাকা নিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সাংসদ না হলেও শহীদুলকে পরপর তিনবার সিন্ডিকেট সদস্য মনোনীত করার বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'আচার্য হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ মনোনয়ন এসেছে।'
তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলার সময়ও শহীদুল যশোর-ঢাকা বিমানভাড়া নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ আকবর আলী সিরাজী *প্রথম আলো*কে বলেন, সংসদ অধিবেশন চললেও হয়তো তিনি এলাকায় ছিলেন, বিমানে এসে সিন্ডিকেট সভায় যোগ দিয়েছেন।

ঠিকাদারি: বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজ প্রভাব খাটিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে নিয়েছেন সাবেক সাংসদ শহীদুল। সাড়ে ৪৪ লাখ টাকায় শিক্ষা ভবনের পশ্চিম দিকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ মেসার্স ওয়েষ্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ৪৪ লাখ ৭৪ হাজার ২৬৯.০১ টাকায় বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের কাজ পায় মেসার্স গ্রামার বিল্ডার্স লি.। দুটি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে কারওয়ান বাজারের টিসিবি ভবনের পঞ্চমতলা। ওয়েষ্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শহীদুলের মালিকানা আছে। আর গ্রামার বিল্ডার্সে আছে তাঁর মেয়ের নাম। এসব ঠিকাদারির কাজ তদারক করতেন সাংসদ শহীদুলের ঘনিষ্ঠ ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি, ভাঙচুর: দ্বিতীয়বার উপাচার্য পদে নিয়োগ লাভের পর দফায় দফায় ছাত্র বিক্ষোভের মুখে পড়েন উপাচার্য ড. ফারুক। ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রভাবশালী নেতারা দফায় দফায় হামলা, ভাঙচুর করে এবং উপাচার্যকে জিম্মি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে চাকরি লাভ করেন। এমনকি সভা চলাকালে সিন্ডিকেট সভায় ঢুকে তাঁরা চাকরি বাগিয়ে নেন। এ প্রসঙ্গে উপাচার্য কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

বিশ্ববিদ্যায়ের কোষাধ্যক্ষ আকবর আলী সিরাজী বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সরকার সমর্থকেরা বেশি নিয়োগ পেয়েছেন।

প্রতিবাদ: গত ১২ মার্চ প্রথম আলোয় প্রকাশিত 'পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্যের দুর্নীতির হাল ধরেছেন বর্তমান উপাচার্য!' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করেছেন বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল লতিফ মাসুম। প্রতিবাদে উল্লেখ করা হয়, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতো সাবেক উপাচার্যের দুর্নীতির জন্য বর্তমান উপাচার্যকে দায়ী করা হয়েছে। উপাচার্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বিজ্ঞানের শিক্ষক না হলেও দলীয় প্রভাবে বর্তমান উপাচার্য এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদনে তার দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে।

Grafts reign supreme in import trade

Report
Grafts reign supreme in import trade

Reporter
Sayed Ashfaqul Haque and Julfikar Ali Manik

Publication Date
20 May 2008 to 23 May 2008

Newspaper
The Daily Star

Current Employment
Sayed Ashfaqul Haque
Chief News Editor
The Daily Star
&
Julfikar Ali Manik
Special Correspondent
Dhaka Tribune

GRAFTS REIGN SUPREME IN IMPORT TRADE

Nexus of traders, politicians, taxmen abusing PSI system to gobble up at least Tk 1,000cr revenue a year

The system for pre-shipment inspection (PSI) of imports has become riddled with corruption, and plagued by tax dodging and money laundering, depriving the country of huge amounts of revenue, reveals an investigation by The Daily Star.

Behind the large scale corruption is a nexus of some businessmen, politicians, taxmen and PSI staff who have plundered government revenues since the system was made mandatory in 2000.

The exact amount the scams have cost the country is difficult to know, but businessmen and revenue experts believe the sum is well in excess of 1,000 crore taka a year.

Now the National Board of Revenue (NBR) has been forced to act, cancelling the License of one PSI company and launching Probes into the activities of others

"NBR will go tor instant actions, if it finds any PSI company involved in irregularities," NBR chairman Muhammad Abdul Mazid told The Daily star. "Though we have cancelled license of one company, but none of the three others is innocent."

The PSI system system was introduced to help the National Board of Revenue (NBR) generate revenue by minimising corruption in customs and ending hassle for importers in clearing goods. However it is now being abused at will, and swamped by phoney declarations, under or over invoicing, false inspections and fraudulent certification of consignments.

"Name whatever latest weapon or Luxury item you want, it can be smuggled in as any lagal item. Let's not bother about the duty!" says a top player in the syndicate that controls much of the PSI business with a laugh.

In the course of investigation, The Daily Star came to know about numerousabuses:

Rolls Royce without doors was imported as non-usable vehicle to dodge hefty taxes. The doors arrived in different container, and the super luxury vehicle was seen on the Dhaka roads complete with snugly fitting dorrs. In another case, an exclusive Mercedes Benz was landed at Chittahong port and declared as scrap although it was in pristine condition.

When checked another consignment duty-free computers became heavy, duty sophisticated photocopier machines. Containers of tennis balls turned into containers of contraband B&H cigarettes at the Inland Container Depot (ICD) in Kamlapur, while hugely expensive Hummer SUV vehicles were shown at least two times cheaper on the government's tax sheet than their actual value. VCDs became cigarettes after import. And there are plenty more skeletons to be found out in the NBR-customs closet.

The investigation of the taskforces as well as the Anti-Corruption Commission could not yet reveal much as the corruption web is very complicated and money-laundering network works efficiently all over the globe in the form of hundi-the age-old underworld money transfer system.

With a grim face, the country's first-ever Tax Ombudsman, Khairuzzaman Chowdhury confirmed the untold tale of smuggling and money laundering. "What has come out so far is just the tip of a corruption iceberg. Possibly, we may never get to the bottom of it", he said.

The massive corruption went on mostly unnoticed for years until the taskforces cracked down on the Chittagong port early last year. In March, the sheer scale of abuse forced the NBR to cancel the license of PSI company Cotecna Inspection SA.

It is not the first time Cotecna has run into problems with the NBR, which has already issued several warnings to the company and dealt out several crore taka worth of fines following probes into the Swiss group's operations. Indeed the National Coordination Committee against Grievous Offences asked the Central Intelligence Cell of NBR to take lagal action against Cotecna for its alleged illegal activities back in December last year.

However, the stern action of today mocked NBR's decision to award about 50 percent import areas to a relatively inexperienced company like Cotecna that has no offices in many of the main cities in countries of the blocks assigned to it- a major qualification for the PSI job.

NBR turned to the PSI system against a backdrop of massive corruption and harassment by a significant section of customs people, but its major move failed to live up to expectation as irregularities started with awarding of first license to 3 companies, dividing countries of import in 3 blocks.

The mandatory PSI system started off on the wrong foot with then prime minister Sheikh Hasina bending the first PSI order using her 'inherent power' to award license to the Intertek Testing Service (ITS) International Limited in 2000 after Griffith pulled out of Block A which includes China, Hong Kong and 45 European countries.

Without considering option for close tender of re-tender after the pullout, NBR offered the job to ITS, the highest bidder in the block, initially for 3 years at a service charge rate 0.14 percent higher than the lowest bid of 0.45 percent after the Prime Minister's Office (PMO) office weighed in brushing aside opinions of finance and law ministries.

The government charges 1 percent of value from importers, a portion of which, fixed during tender, it shares with PSI companies for their service. The combined earnings by PSI companies should be around TK 250 crore a year, 80 percent of which they are allowed to remit.

Then NBR chairman Abdul Muyeed Chowdhury in his note stated that the prime minister ordered 'to award three blocks to three companies for the sake of public interest and to protect revenue interest.

But the ACC is now examining the low pricing in the Its contract through which the country allegedly missed out on over TK 100 crore in revenue in five and half years of the deal. Buoyed by taskforce finds and ACC initiative, NBR, after all these years on April 10, issued internatinal note to collect information on how much ITS earned in service charges during the period from 2000-2005.

All most all the PSI companies, number of which was increased to 4 after import regions were divided in 5 blocks for the second tender in 2005, had their share of controversial contract and poor performance.

Griffith ended up with series of poor performances so much so that on expiry of its 3-year contarct the block was offered to ITS, which contracted out India portion to Societe General de Surveillance (SGS). Interestingly, the change in blocks took place without tender procedure.

Though contarct awarding evaluation committee was to check technical and financial qualifications of bidders, a small group of unscurpulous businessmen with political clouts found no problem in influencing the government machinery and policy-making circle through brokers. And when appointed the company started to return the favour to its backers. Insiders of the PSI sector told of numerous stories, detailing how Hawa Bhaban stalwarts cashed in on the favour returned by a certain PSI company during BNP-led coalition rule.

"Did we check history of PSI companies before appointment? We considered lobbying before awarding license," remarked prominent economist Professor Muzaffer Ahmad. "Companies that got license in our country have obtained through some linkages. Some got it through money and some through political linkage."

Declined to be named, a leading PSI executive meanwhile refused to accept the allegation that all PSI companies are graft-ridden. " The allegation of irregularities and corruption in imports were there against customs even before the PSI system was made mandatory," he argued. " And it's for sure the PSI companies helped increase government revenue significantly in last eight years. There could be some mistakes in the process. But there is provision for punitive action for that." Genuine businessmen reap the benefits of the PSI system but unscrupulous political businessmen and their partners in crime-a section of PSI, NBR and customs officials--- manipulate the system to dodge taxes and siphon off maney abroad with the help of hundi players.

Dishonest importers always have documents of their choices, certified duly by related PSI companies, which are obligated to carry out 100 percent inspection of goods in addition to its valuation and classification job.

"I believe the PSI companies are not involved with this corruption, but some of their greedy employees are for sure getting a fair share of the graft," said a top tax official, wishing not to be named.

According to taskforce investigations, many of our politicians, businessmen and even sidekicks of lawmakers amassed staggering wealth or bought lavish properties abroad, thanks to the PSI system manipulation and hundi. Our financial system could only see legal cash transaction as documented on invoices but the hundi networks work behind the scene to complete bulk of the money transfers involved with the imports. The caretaker government is now in touch with a few countries to bring back the money laundered by some detained graft suspects. Portion of export proceeds and remittance never enter the country after being routed into to different destinations by hundi network, confide players in the unholy league. Million of dollars can be transferred to anywhere in the world or brought in local currencies, and it will take only few minutes for hundi network to get the job done.

Meanwhile, traders can also manipulate a provision that allows importers to directly bring in goods for customs inspection, not the PSI, and get away with fines, exploiting the corrupt system.

The corruption syndicate and many of its kingpins slipped into background when the taskforces unearthed some cases of curruption through the PSI system. A PSI broker earned so much success in winning appontment that he was nicknmed Mr PSI in the circle. Mr PSI, who thrived on his links with both AL-BNP governments and NBR, went into hiding for months after taskforces and NBR moved to probe the questionable ITS contract during the AL rule.

The caretaker government has so far made some progresses in a few isolated corruption cases, feel PSI specialists, adding that it is far from tracking down the syndicated graft network, which is gobbling up country's economy and capable of creating price disorder in the import based market.

Sources in the joint forces alleged that the syndicated graft network manipulated the market prices to cause commotion among people after the government came down hard on the racket.

The PSI companies play a dominating role in poor economies and are capable of causing embarrassment to governments. They have histories of becoming partners in corruption with government top brasses in African and third world countries.

Figures like former Pakistan prime minister Benazir Bhutto and her spouse Asif Ali Zardari hogged the world headlines in 2003, when a Swiss court indicted tham for receiving kickbacks from SGS and Cotecna. And if investigated extensively and without any influence, a lot of high-profile names from Bangladesh will also hit world headlines, say anti-graft investigators.

HUMMER HUMS GRAFT GALORE IN IMPORTS

Crackdown of joint forces on high-profile graft suspects opens up Pandora's Box

Few sports utility vehicles attract as much as attention rolling down the road as the Hummer. With its robust shape, iconic look and US military Humvee-inspired styling, the Hummer SUV stands out like a sweaty heavyweight prizefighter. The Humvee was used in US's Operation Desert Storm in Iraq,but the vehicle jumped in popularity after macho Hollywood actor and California governor Arnold Schwarzenegger had one converted for civilean use. And, it was Ellen Bhutto, a former BNP law-maker from Jhalakathi, who introduced the prized vehicle to Bangladesh using her MP privilege of duty-free import.It didn't take long bedore a few influentials became eager to match Ellin on the street despite the fact that Hummer looked rather odd on the crammed streets of Dhaka. so,six more awe-inspiring Hummer SUVs arrived, captured the imaginaton of passers-by and left the country's customs department on the trail of about Tk. 7.40 crore of alleged duty dodging by the importer, Auto Museum Ltd.

Like many other instances of glaring grafts involving imports, it took a cocktail of four elements. The greed of the importer, the endorsement of a pre-shipment inspection (PSI) company, the help of the exporter, and the convenient ignorance of the National Board of Revenue (NBR) and its customs wing.

But when the scam was exposed, NBR came down hard on one element—the PSI company in question. The board washed its hand of the corruption by canceling the license of Cotecna inspection SA for numerous irregularities including the Hummer scam, letting related customs people off the hook and allowing the importer to keep penalty at bay.

The irregularities were detected along with many others once the military-backed government came into power last year, with its National Coordination Committee (NCC) against Grievous Offences launching a crackdown on high profile corruption suspects in February,

Owned mostly by political families and purchased largely through illegal income, a fleet of exotic SUVs turned a lot of heads on the Dhaka streets during the last few months of the BNP-led alliance rule. But all those exclusive vehicles suddenly disappeared from streets, and owners openly disowned their once proud possessions amid anti-graft drive by taskforces under NCC.

Joint forces picked up the lead from an abandoned Hummer H3 SUV, the smallest of the three models introduced by the US automaker General Motors in 2006, inside an under-construction Kakrail house. NBR was asked to probe the matter as startling finds started to come out after initial investigation.

NBR noticed a gulf of difference between purchase and sale prices after carrying out some intelligence works on Auto Museum, whose import of 6 Hummer vehicles also included a H_2 model that offered something a bit more practical than the designed-for- military-use H_1.

Auto Museum stated the new SUVs were imported from Thailand, declaring value of Hummer H_3 $ 18,500 and Hummer H_2 $ 31,000, Formed on July 19 last year, the five-member NBR probe committee, led by a first secretary, Dr Md Khairuzzaman Majumder, went through all documents certified duly by Cotencna, realising that it was a plain case of gross under-invoicing of Hummer to evade customs duty.

Under-invoicing or over-invoicing of products is a common fraudulent practise to dodge customs charges or siphon off money aboroad. Exporters see no harm to entertain importers as they get actual payment or refund excess prices through money-laundering tool,

The probe got a new twist when the Square Toiletries Limited sub-mitted import documents of a new Hummer H_2 from the Uk, stating its price four times higher at $1,20,987 (GBP 60,586) than Auto Musuem's. The PSI company this time was bureau Veritas Bangladesh Ltd. and the import was initially considered as a case of over-invoicing to siphon off money abroad.

Puzzled, NBR finally tried to know about the actual price by asking two other PSI companies-Intertek Testing Service (ITS) Internationl Limited and Societe General de Surveillance (SGS) for counter price and by doing the simplest job of checking the website of General Motors,

Having analysed the information on prices, the probe body concluded that the approximate unit price, including costs of freight and conversion from right-to-left- hand drive, of Hummer H_3 should be $ 35,215 and H_2 $ 62,895,

Cotecna, which was warned several times in the past for widespread irregularities, stuck to its pricing, certification and inspection. But sensing NBR determination this time, it changed its story, claiming it was unaware of the fact that vehicles were 'new but damaged, ' But its bid to clutch at a straw in defence of low pricing was rejected by NBR.

"As per import policy 2003-2006, used or damaged cars are only importable from the country of origin (US) and not from any other country (Thailand," stated

NBR in its reply, slapping Cotenca with a fine of Tk 7.40 crore after canceling its license But Dermot A. Jennings, general manager of Cotecna, told The Daily Star, "Those six Hummer vehicles were the first of their kind to have been imported in the country. We as the PSI agent, accepted the declared price under the transaction value system. That is the rule. The NBR or anybody else has not said anything to the contrary."

The cars were new as per definition but were damaged and repaired and consquently the valuation had to reflect that fact, he argued, adding that NBR remained silent to their offer to facilitate its verifying the truth by visiting the countries concerned, at Cotecna's expense.

Cotecna, however, challenged the heftly fine in the court.

NBR, meanwhile, found no way but to accept the apparent over-pricing by the Square Toiletries, which claimed that it bought the new Hummer H_2 at a higher price from the Uk as there was a restriction then in the US on the sale of new vehicles. Besides, the price also involved extra fittings and accessories, the importer argued in an NBR hearing. Unable to verify the claim, NBR eventually settled the matter accepting arguments of Square and Bureau Veritas.

Curiously though, four out of five-member probe committee were from customs. And the com-mittee found no reason to hold responsible the customs authorities, which allowed Auto Museum to get away with grossly manipulated under-invoiced Hummer vehicles.

PSI companies concerned are to provide Clean Reports of Findings (CRF) certifying prices, quantity, description, HS (harmonised system) Code and importability of goods, pointed out the probe body in its report, adding that customs authorities only can investigate CRF-cerfified prices if instance of higher price is there or if valuation appears suspicious.

"As the vehicles were absolutely new in Bangladeh, there was idea about prices.. there was no chance to suspect," the probe report stated in support of related customs people.

As logistics required for investigation (e. g. internet based search) in such cases are not available at appraiser / principal appraiser level, it wound not be logical to hold anyone responsible, it added.

But many in the sector fund this excuse hard to accept. Customs people should have been cautious or suspicious about prices as the vehicles were very new to Bangladesh, they argued. "The price information was just a few clicks away on the website of General Motors for all the people in the world, "quipped a PSI specialist from the rival camp of Cotecna.

Corruption by customs is no new issue and the PSI system has been introduced to curb grafts by customs. A recent follow-up study of the Transparency International Bangladesh stated" corruption has assumed an institutional shape in Chittagong Port Authority and the Customs... The rules of law and accountability have been almost non-existent here." Business people still claim bribes have to be paid at least 30 spots for releasing a consignment from the customs and the port. "I am not surprised at all why customs has never got rid of corruption as departmental inquiries have always found corrupt staff innocent, " says a leading importer, wishing not to be named.

The probe commitee, meanwhile, asked the Customs House (Import), Chittagong to take legal steps for realising evaded duty from Auto Museum and for penalising the company over false declaration. Customs surces in Chittagong said the importer, who in its August 29 letter last year insisted that the declared price was true, is skipping customs hearing under different excuses, let alone paying the penalty.

But when contacted, Auto Museum refuted the customs version, claiming that it submitted its version in written and its officials also attended hearings in person. "We did nothing to violate the import policy of the government, Auto Museum authorities told The Daily Star. "So, we requested the customs to drop charges against us." The matter is however yet to be settled.

The Auto Museum authorities also binned the NBR claim of about Tk. 7.cr duty-dodging, saying it would not exceed TK. 2 crore even as per the customs assessment.

As per the investigation, it could be known that at least 15 Hummer vehicles were imported so far, of which at least seven vehicles were duty paid.

According to sources, Auto Musem already sold five out of six Hummers SUVs to Bashundhara Group, Sagufta NM Housing Ltd, Narayangang-based industry Knit Concern, STS (pvt) Ltd (as confirmed by Ascent Group MD syed Maher Murshed) and a Chittagong businessman.

Rest of the vehicles were imported through duty–free privillege of lawmakers and industries at Export Processing Zones.

According to investgators, the government lost around Tk 211 crore in taxes as at least 303 cars were imported by the lawmakers of the eighth parliament under the duty-free privillege. And around 200 lawmakers did not even import cars but sold their permits to car importers as soon as they got those, prompting the caretaker government to cancel the privilege in April lst year.

Taskforce and police sources said three Hummer vehicles were seized during anti-graft drive. Vehicles of ex-BNP lawmaker Harunur Rashid and businessman Shoaib Akhter Nizam was seized over illegal sale after import. But Shoaib later got back his Hummer, which was seized under the suspicion that it was duty-free purchase. Meanwhile, a blackcoloured Hummer vehicle that was left abadoned in Kakrail was learned to imported by Abdul Alim, another former BNP MP from joypurhat. Police said Alim sold the vehicle to a businessman Mohammad Ali.

Former lawmaker and Islami Oikya Jote Leader Mufti Shahidul Islam and ex-BNP Mp from Savar Dewan Mohammad Slahuddin are among others who imported duty-free Hummer vehicle. Most of the privilleged purchases are learnt to have been sold to other,

Hummer is just one case of under-valuation to dodge customs duty. There are thousand other mind-blowing instances of corruption, Rolls Royce, Mercedes Benz, sophisticated photocopier, contraband cigarettes, electronic goods, duty-free industrial machinery and what not landed in Bangladesh under false declaration or through price-manipulation. And each story of grafts turned few people filthy rich overnight, depriving the government coffer.

GRAFT GOES INSTITUTIONAL AMID LAX NBR WATCH

The Import Scandal

Rampant corruption in the control of imports became institutinalised as the bodies charged with monitoring trade, the National Board of Revenue (NBR) and customs, became partners in the crime, an investigation by the Daily Star can canreveal.

Either through direct involvement or by turning a blind eye to the illegal actions of their colleagues, taxmen and customs officials joined the circle of some businessmen, politicians, and employees of pre-shipment inspection (PSI) firms who manipulated the system at will to enrich themselves at the country's cost. And despite the recent clampdown on corruption the country is still missing out on over Tk 1,000 crore in revenue a year as the PSI Companies continue to allow phoney declarations, under or over invoicing, false inspection and certification of consignments, say business observers and revenue experts.

The banks also have their share in the crime, as they do not effectively deliver their responsibilities entrusted by the central bank to help contain price-manipulation on commodities at the initial level. "The L/C (letter of credit) opening banks can easily do the market-price checking on commodities in consultation with the overseas banks of the suppliers", former NBR chief and Tax Ombudsman Khairuzzaman Chowdhury totd The Daily Star.

Had the L/C opening banks strictly followed the Bangladesh Bank's guidelines for foreign exchange transactions properly, the paractices of under-invoicing to dodge customs duty and over-invoicing to do money laundering would have gone down dramatically, he said. Related officials of all banks should check pricing on commodities including the credit rating of overseas suppliers, but the abun-dance of irrgularities only shows banks are not strictly following the guidelines of the central bank, he observed.

Chairman of Krishi Bank Khondkar Ibrahim Khaled, also a former deputy governor of the Bangladesh Bank, thinks banks are supposed not to be a partner in money laundering, But he said, " Banks are responsible to compare commodity prices on L/C with those in the market. If there is significant difference between declared prices and market prices, then responsibilities lie with banks concerned."

But the ultimate responsibility to turn all these resources into strength against irregularities boils down to NBR, which is also blamed for not ensuring strict PSI rules for qualification of companies.

Thanks to political interference and syndicated lobbying, some crucial provisions in the PSI rules were allegedly relaxed or made tough on several occasions in an effort to influence qualification of some companies with poor records.

The Internal Resources Division is responsible for the PSI rules, secretary of which is also chairman of NBR.

However, some NBR top shots stopped short of accepting their failure in having effective measures to combat the corruption flourished around imports. They watched how devils in NBR and customs join hands with the corruption network to plunder the economy by manoeuvring the PSI system, which was introduced in 2000 against a backdrop of widespread corruption by strong band of customs staff.

"Corruption has assumed an institutional shape in the Chittagong Port Authority and the Customs.... The rule of law and accountability have been almost non-existent here," laments a recent follow-up study by Transparency International Bangladesh on Chittagong port, through which 80 percent of the countrys' import-export takes place.

Instances of open bribery and PSI irregularities have declined to some extent and the speed at which containers are handled has increased sharply following the taskforce clampdown last year on Chittagong port. However business people still claim bribes have to be paid in at least 30 spots for releasing a consignment from the customs and the port.

"Transaction of bribery are still continuing through agents outside the port and customs offices," states the TIB report, adding that "The credibility and performance of the PSI organisation have been put in question due to detection of large numbers of false declaration from among the on-the-spot checks carried out on only 5-6 percent of items."

The customs wing of NBR randomly checks only 10 precent of the PSI-inspected consignments. This is done manually and without any help from modern equipment, let alone sophisticated scanners being used at a majority of ports in the world.

"You can easily guess what a corruption network can do manipulating just a portion of the remaining 90 percent unchecked consingments, bribing people in right places," said a taskforce member involved with a mission to get the Ctg port back on track.

The age-old corruption in the sector is deep-rooted and enjoys the blessings of influential people in government and politics, a reality that discourages even the most honest and efficient NBR offficals from acting against the syndicate or their

corrupt colleagues. Despite years of abuse, the most of punishments handed out so far to a corrupt NBR staff are transfers or suspensions. The blatant display of grafts put NBR and customs in a very embarrassing situation, with a few corrupt officials dominating the PSI matters under different regional banners like Barisal, Comilla, North Bengal and Sylhet groups. Tasked with managing crucial taxmen, some PSI officials used their home district connections to engineer groupings in NBR.

Some PSI companies know well how to play this game in Banlgadesh. On a certain day of every month, the corrupt officials in NBR and customs used to receive envelopes from employees of some pSI companies filled with takas usally amounting to between 50,000 and one lakh, confided PSI bigwigs, wishing not to be namaed. The envelopes ensured the smooth passage of worngly declared or invoiced imports.

Retired NBR bigwigs are as valuable as ones still in service and some PSI companies waste no time hiring them as high-salaried consultants to hold clouts in government machinery.

The Anti-Corruption Commission placed former NBR top-shot ATM Sarwar Hossain, himself in the thick of PSI things for being the all –powerful member of customs, on its list of high profile graft suspects last year, Now on the run, Sarwar was jailed for 8 years in tax evasion case on September 20 last year and for 13 years over illegal wealth on May 15 this year by special anti-graft courts.
While directly not denying grafts by his staff. NBR Chairman Muhammad Abdul Mazid told The Daily Star, ''We're taking disciplinary actions almost every day. NBR will not tolerate any irregularities, not anymore.''

Business observers and anti-corruption campaigners meanwhile feel the government must recruit efficient manpower sufficiently. address weaknesses in screening system and make sure a transparent PSI arrangement is established to rein back the train of corruption.

''Customs people at appraiser level work mannually without computers or internet facilities. How can they crosscheck valuation of different imported goods on the net and cope with the demanding job of policing?'' said a top customs official, who is critical of the slow-paced automation process in NBR.

Renowned economist and staunch campaigner against corruption Professor Muzaffer Ahmad said the guardian of country's revenue is equipped with poor logistics to commbat corruption. ''The area of customs intelligence has to be really strong,'' he said, adding that, "If there is intelligence work, they will have the pre-history of exporter and importer. It will help them do the gate-keeping well."

Despite all these constraints, there have been occasions when NBR has attempted to punish offenders, but such moves have as often as not been always shot down by Litigation. The number of writ petitions in the High Court and appeal cases in the Appellate Division has spiralled due to the detection of false declarations arising from non-transparent and weak PSI arrangements.

Importers file cases with or with our valid grounds when the customs raises any objection against the release of any consignment. "Most of the cases are lodged by debating the certified prices fixed by the pre-shipment company," stated TIB research, adding that, the number of such cases climbed to 10,033 till February last year, blocking revenues of nearly Tk 1,233 till February last year, blocking revenues of nearly Tk 1,233 Crore. The PSI companies could afford to be non-transparent in their activities due to the lack of a PSI audit, Two attempts to set up such a body failed because of litigation and poor response to tenders. As a result, the PSI companies could avoid monthly screening by an audit organization. NBR however has taken a fresh initiative for a third try at PSI audit. Tax Ombudsman Khairuzzaman Chowdhury, meanwhile, said NBR is just not equipped technologically and financially to fight corruption of this level.

Computerisation of NBR apart, he suggests a major strengthening of the valuation department, which is responsible for crosschecking under and over invoicing.

''The valuation department should be given enough authority and funds to carry our intelligence works on commodity prices across the world,'' said Khairuzzaman. ''If that can be done, then price manipulation will go down remarkably.''

NBR Chairman Abdul Mazid said the NBR is in the process of strengthening the valuation department, "We've subscribed to an online wire service package on commodity prices. Automation of the department is also going on smoothly. So, we will be in a better position to man irregularities."

But many observers and business leaders refuse to subscribe to the idea that corruption in imports will be laid to rest if PSI system manipulation is checked. Rather, they feel the structured corruption in customs has to be broken down first in order to contain grafts by PSI companies and importers.

Prof Muzaffer put the onus on the leadership to uproot graft in the institution. "Corruption can filter through every system, But Leadership has to act to ensure a system ful proof. There should be effective parctice of reward and punishment," On the idea of higher salary keeping taxmen out of graft, he observed attractive wage is not a solution to contain corruption in customs. "The authorities can review the performance incentive for customs people and consider hiking it to a realistic level."

PSI SYSTEM OF IMPORTS TO STAY TILL 2009-END

Gou floats tender, warns aspiring companies against lobbying

The mandatory system for pre-shipment inspection of imports is to stay till 2009-end as present contract with three companies expires in August amid uproar over irregularities in imports.

“Let us go for re-tender up to 31 December 2009” states a recent govrnment document obtained by the Daily star. the National Board of Revenue (NBR) floated a tender wednesday, seeking expressions of interest from aspiring PSI agencies.

The government decision to retain the PSI system followed recommendations from a four-member NBR committee, which felt the customs department is not ready yet to take over the job despite the growing call to scarp the inspection system.

There is strong logic to withdraw the PSI system, but reality-wise it should not by done right away, pointed out the committee, suggesting an interim period of one-two years for the phase-out.”

In that case the customs authorities would get enough time to build up the instiutional infrastructure required in absence of the PSI system,” the committee obserrved, the government has also decided to increase the blocks outlining regions of imports from five to six, prescribing provision for stringent punishments to PSI companies for irregularities.

NBR sought proposals from different business chambers and sat with them several times to conclude unanimously that PSI is no permanent system and it should by withdrawn after a provisional period on expiry of the present contracts, read the April 9 document of the Internal Resources Division of the finance ministry.

In Asia, the mandatory PSI system exists only in Bangladesh and Cambodia, with Pakistan discarding the arrangement in late nineties after a brief stint. The voluntary PSI system was introduced in 1992 by then BNP government, and it was made mandatory 8 years later in a bid to help generate revenue by minimising widespread corruption in customs and ending hassle for importers in clearing goods quickly.

"The PSI system is like a caretaker government. It is no permanent solution," NBR chairman Muhammad Abdul Mazid told the Daily star.

He also hoped that the one-year target is quite realistic for his board to take over the charge, adding that it however depends on three ifs to complete capacity building.

His three ifs include sufficient manpower, end to litigation and completion of automation.

Meanwhile, the committee advised NBR to go for all-out drive in capacity the building of the customs during the interim period of two years, recommending it either to renew the present PSI contract or to initiate fresh appointments.

Against a backdrop of controversy surrounding appointment of PSI agencies, the government wants to ensure transparency in the licence awarding process.

PSI agencies this time will be selected in accordance with the procedure set out in the Public Procurement Act, 2006 and the Public Procurement Rules, 2008, and any persuasion will disqualify a contract aspirant.

Different business chambers spoke against rushing back to non-PSI era as the customs department could not yet offer the kind of service businesses require to stay in the race of highly competitive market.

Their worries were echoed in the analysis of the NBR committee, which felt that customs officials became too much dependent on the PSI system, lamenting the facts that no valuation database could be built as yet and the skill and training that require in customs to man corruption of this level is missing.

The committee also stressed effective coordination between stakeholders and the customs authorities before saying bye to the mandatory PSI system after eight years.

The government also reacts at reports of mind-blowing instances of corruption through the PSI system abuse by increasing financial penalties for irregularities in many folds.

In an attempt to discourage PSI companies from the tendency of frequent litigation against customs penalties, the government has also decided to withhold the service charges of related companies till disposal of cases.

"I'm sure these stringent provisions are going discourage many PSI companies to vie for the job in Bangladesh", said a top PSI executive, preferring not to be named.

"The sweeping allegations of irregularities against PSI companies are baseless. It's always not a fact that PSI companies were involved in under-invoicing to help cause reve-nue loss," he said, adding that there are a lot of instances where PSI companies upped the declared prices by importers significantly.

দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

প্রতিবেদন
দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

প্রতিবেদক
মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

প্রকাশের তারিখ
২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

সংবাদপত্র
দৈনিক দৃষ্টিপাত, খুলনা

বর্তমান কর্মস্থল
প্রকাশক, খুলনার চিঠি ও সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রবাহ

দুর্নীতির বিষবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রেখেছে এর সর্বত্র

বিভাগের সর্ববৃহত সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে দুর্নীতির বিষবৃক্ষ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গোটা হাসপাতালটিকে অক্টোপাসের মত গ্রাস করে ফেলেছে। হাসপাতালের প্রধান কর্তা থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত দুর্নীতির মাস্টারে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হলেও এর লাগাম টেনে ধরা যায়নি। রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতার দাপটে এসব দুর্নীতির স্বাক্ষর রেখেছে কিছু সংখ্যক চিকিৎসক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারি। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অসংখ্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে যৌথ বাহিনী বৃহত্তম এ হাসপাতালে কয়েকদফা অভিযান চালিয়ে চলমান পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালায়। যার সুফলও কিছুটা আসতে শুরু করে। অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দুর্নীতি অনুসন্ধানে একাধিক তদন্ত টিম খুলনায় এসে সারেজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। শক্তিশালী ও উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর হাসপাতালের প্রধান দুর্নীতিবাজ কর্তা (তত্ত্বাবধায়ক) ডা. মোঃ হামে জামালকে অপকর্মের বোঝা মাথায় করে এখান থেকে বিদায় নিতে হয়। অপর দুর্নীতিবাজ মেডিকেল কলেজের তৎকালীন প্রধান (অধ্যক্ষ) ডা. এস এম জাফর উল্লাহকেও স্বীয় পদ হারাতে হয়। এছাড়া খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মোঃ রেজাউল করিমও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে তদন্ত কমিটি উল্লেখ করে। সূত্র জানায়, ভুরি ভুরি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বা অঃ/পার-২/ আর-৩৭/৮৩/৯৮৯১৮/১(৬) নং স্মারকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি করা হয় ঢাকার মহাখালী আইইডিসিআরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজী) ডা. মোঃ শুকুর উদ্দিন মৃধাকে। সদস্য ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক (শৃংখলা -১) ডা. মোঃ নুরুল হক মোল্লা ও অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আলমগীর কবির খান। তদন্ত কমিটি গত বছরের ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরেজমিন পরিদর্শন, ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের স্বাক্ষ্যগ্রহণ করে। তদন্ত শেষে গত ৮ নভেম্বর কমিটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর খুমেকের ১৮ জন চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অভিযুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে। যার সূত্র ধরে গত ৩ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোঃ মোজাফ্ফর হোসেনের পক্ষে সহকারি পরিচালক (শৃংখলা-২) ডা. মোঃ আকরাম আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 'বড়লাট' খ্যাত ও কর্মচারিদের মূর্তিমান আতংক এবং তথাকথিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ার্ড বয় শরীফুজ্জামান বিজু, হিসাব রক্ষক শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান সহকারি মাহবুবুর রহমান, সুইপার আক্তার হোসেন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের স্টেনোগ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে থেকে প্রেরিত স্বা অঃ/পার-২/এইচ-৩৯/৮০/৪৬৯৭৩/১(১২) নং স্মারকের আদেশে উল্লেখ করা হয়, হাসপাতালের ভারী যন্ত্রপাতির ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির দায়ে উল্লিখিত কর্মচারিদের সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫'র ১১(১) ধারা মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। এছাড়া তদন্ত কমিটি চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন বিএমএ, খুলনার সভাপতি ডা. মোঃ রফিকুল হক বাবুল, সাধারণ সম্পাদক ও খুমেক'র

সহকারি অধ্যাপক ডা. শেখ মোঃ আখতারুজ্জামান, সহযোগি অধ্যাপক ডা. মতিয়ার রহমান খান এবং জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী) ডা. মোঃ রফিকুল ইসলামও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দেয়া রিপোর্টে উল্লেখ করে এদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের প্রমাণ/সত্যতা পাওয়া গেছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও ওয়ার্ড বয় শরীফুজ্জামান বিজু তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সারাক্ষণ হাসপাতালে বিচরণ করে। এছাড়া সে বহাল তবিয়তে তার নানা অপকর্মও অব্যহত রেখেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্র নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানিয়েছে। খুমেক'র নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. মোঃ গোলাম হোসেনের সাথে যোগসাজস ও মোটা অংকের চুক্তির বিনিময়ে শরীফুজ্জামান বিজু ও অন্য বরখাস্তকৃতরা চাকরিতে পুনর্বহালের তৎপরতা শুর করেছে। এজন্য ডা. গোলাম হোসেন স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করে বরখাস্ত প্রত্যাহারের চেষ্টা করছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এর মধ্যে তিনি বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের স্টেনোগ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লাকে পুনর্বহাল করেছেন বলে জানা গেছে। যে কোন মূল্যে বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। মাঠে নেমেছে কয়েক লাখ টাকার বাজেট নিয়ে। আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে হাসপাতালের আরও অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের জন্য শক্তিশালী তদন্ত কমিটি আসার কথা রয়েছে। কমিটির সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন বাসুদেব আচার্য, আমিনুর রহমান ও ডা. মোঃ আকরাম আলী। ওই কমিটির রিপোর্টের উপরই মূলত বরখাস্তকৃতদের চাকরির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ কারণে তারা কমিটি আসার আগেই বিভিন্ন মহলে তদবির শুরু করেছে। এদিকে দুর্নীতিগ্রস্তরা চাকরিতে পুনর্বহাল হচ্ছে-এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় হাসপাতালের নির্যাতিত কর্মচারিদের মধ্যে অজানা আতংক শুরু হয়েছে। যারা এতদিন তাদের অত্যাচার নির্যাতন ও চাদাবাজির মুখে অসহায়ের মত মুখ বুজে ছিলেন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

দুর্নীতির খতিয়ান দুদক চেয়ারম্যানের হাতে: দুর্নীতিবাজরা আতংকে

বছরের পর বছর ধরে চলে আসা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করার প্রশ্নে জোট বেধেছে প্রতিষ্ঠানটির সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। এ অভিযান সফলের লক্ষ্যে খুমেক'র দুর্নীতির খতিয়ান তুলে দেয়া হয়েছে দুদক চেয়ারম্যানের হাতে। এদিকে, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে দুর্নীতিবাজরা আতংকিত হয়ে পড়েছে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক সুপার ডা. মোঃ হামে জামালের নেতৃত্বে সরকারি এ বৃহৎ চিকিৎসা কেন্দ্রে দুর্নীতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তিনি নিজেই চিকিৎসা সংক্রান্ত ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কোটি টাকার দুর্নীতি করেন। এছাড়া ব্লাড ব্যাংক থেকেও তিনি অবৈধভাবে গ্রহণ করেন প্রায় তিন লাখ টাকা। অপরদিকে, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) খুলনার সভাপতি ডা. রফিকুল হক বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক ডা. শেখ মোঃ আখতারুজ্জামান, মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. এস এম জাফরউল্লাহসহ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত অন্যরা নিয়োগ ও টেন্ডার বাণিজ্য সহ বিভিন্নভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এর বাইরে হাসপাতালের সাধরাণ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাছে মূর্তিমান আতংক ও নাটের গুরু এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের স্ব-ঘোষিত সভাপতি শরীফুজ্জামান বিজু তার সহচরদের মাধ্যমে চাঁদাবাজি ও রোস্টার (ডিউটি বন্টন) পরিচালনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় করেছেন। তিনি হাসপাতালের কথিত কাটিং (বহিরাগত টাউট) সিন্ডিকেটেরও নেতৃত্বে দেন। এছাড়া বিজুর প্রভাবে তার আপন বোন টেইলার (দর্জি) জাহানারা ছবি ও বোনাই (লিলেন কিপার-ধোপা) বদরুদ্দোজা কাজ না করে শুধুমাত্র হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়েই বছরের পর বছর বেতন নিচ্ছেন। এর বাইরেও দুর্নীতিবাজদের দুর্নীতির খতিয়ান-ফিরিস্তি আরো লম্বা। তাছাড়া স্টোর কিপার এবং নার্সদের ঔষুধ চুরির কাহিনী খুলনাবাসীর অজানা নয়। এসব কারণে গত কয়েক বছর ধরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। এর বিষবৃক্ষ শেকড় গাড়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি ইটের ফাঁকে ফাঁকে। পুরো হাসপাতালটি জিম্মি হয়ে পড়ে হাতে গোনা কয়েকজন দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির হাতে। মূলত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ তথা গত বছরের ১/১১'র পরেই এর পটপরিবর্তন শুরু হয়। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতিবাজ চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের হাতে জিম্মি থাকা সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারিরা মুখ খুলতে শুরু করে। যার অংশ হিসেবে দফায় দফায় যৌথ বাহিনীর অভিযান এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর ৬ জন কর্মচারিকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু দুর্নীতির সাথে জড়িত রাঘব বোয়ালদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে দুর্নীতির মূলৎপাটন সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাসপাতালের জোট বাধা কর্মকর্তা-কর্মচারিরা সুযোগ বুঝে গত ৩০ জানুয়ারি নগরীর জিয়া হলের দুর্নীতি বিরোধী মত বিনিময় সভায় দুদক চেয়ারম্যান লেঃ কর্ণেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরীর হাতে দুর্নীতির খতিয়ান তুলে দেন। তিনি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা ও তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এ খবর শুনে দুর্নীতিবাজরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

চাঁদাবাজির মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে লাখ লাখ টাকা

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর ১১০জন কর্মচারীর কাছে 'বিজু' একটি আতংকিত নাম। হাসপাতালের প্রধান থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত সবার ওপরই ছিল তার নিয়ন্ত্রণ। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ বিভিন্নভাবে তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। কর্মচারীরা কেউই চাঁদা না দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। চাঁদা না দেয়ায় অনেক কর্মচারীকে বদলি, আবার কাউকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। এভাবে তিনি মালিক হয়েছেন অঢেল অর্থ-সম্পদের। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাধিক সূত্র ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮৮ সাল থেকে শরীফুজ্জামান বিজু খুমেকে ওয়ার্ড বয় হিসেবে কর্মরত রয়েছেন । দীর্ঘ ২০ বছরেও তাকে এখান থেকে বদলি হতে হয়নি। ফলে তিনি অনেকটা 'আলাউদ্দিনের চেরাগ' হাতে পেয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি সকল দেবতাকে তুষ্ট করে চালিয়েছেন ক্ষমতার অপব্যবহার। চাকরি দিয়েছেন নিজের বোন-বোনাইকে। হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগেই ছিল তার পদচারনা। সূত্র জানায়, বিজু খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের স্ব-ঘোষিত সভাপতি। দীর্ঘ দিন ধরে কোন প্রকার নির্বাচন ছাড়াই তিনি পদটি পৈত্রিক সম্পত্তির মত দখল করে রেখেছেন। গত জোট সরকারের ৫ বছরের জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রভাব ও ক্ষমতা দাপটে বিরচণ করেছেন ধরাকে সরাজ্ঞান করে। ফলে তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি শুধুমাত্র কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নামে চাঁদাবাজির মাধ্যমে আয় করেছেন ৮৮ হাজার টাকা। এছাড়া নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, কর্মচারিদের ডিউটি বন্টন খাতসহ বিভিন্নভাবে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া যে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শরীফুজ্জামান বিজুকে বরখাস্ত করা হয় সে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'স' অদ্যাক্ষরযুক্ত নামের একজন কর্মচারী রাজস্ব খাতের হওয়া সত্ত্বেও বিজুকে ৫শ' টাকা চাঁদা দিতে হয়েছে বলে তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকার করেছেন। 'ন' অদ্যাক্ষর যুক্ত অপর কর্মচারি বলেছেন তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় বরখাস্তকৃত ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ তার বেতন বন্ধ করে দেন। তাকে উৎকোচ না দিলে ছুটি অথবা ডে-অফ পাওয়া যায় না। যৌথ বাহিনী চুরির অভিযোগে বিজুকে গ্রেফতারের পর বিএমএ নেতা ডাক্তার রফিকুল হক বাবলু, ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ ও আকতার হোসেনসহ অন্যরা তাকে হুমকি দিচ্ছে। 'জ' অদ্যাক্ষরযুক্ত কর্মচারী জানান জোট সরকারের শেষ পর্যায়ে তিন কিস্তিতে বিজু ও সুলতান আহমেদ তার কাছে থেকে ৮ শ' টাকা নিয়েছেন। এছাড়া তাকে পাঁচ বছর ধরে মাসে ৩ শ' টাকা করে চাঁদা দিতে হয়েছে। ডা. বাবলুও ঘুষের ভাগ পেতেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপর দিকে 'আ' অদ্যাক্ষরযুক্ত কর্মচারি বলেছেন ১৯৮৮ সালে তিনি এ হাসপাতালে যোগদান করেন । এর মধ্যে ৩ কিস্তিতে বিজু ও অফিস সহকারী মাহমুদুর রহমান তার কাছ থেকে ১ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহণ করেন। এছাড়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে অপর একজন কর্মচারি জানান, শরিফুজ্জামান বিজু হাসপাতাল সংলগ্ন হাসান বাগে নিজস্ব জায়গায় এক তলা বিশিষ্ট ভবনে বসবাস করেন। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে একই স্থানে কর্মরত থাকায় প্রভাব বেড়ে যায়। ফলে সে ও তার সহযোগী আকতার হোসেন ডিউটি বাদ দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সাথে সময় কাটাতেন। প্রতিমাসে তাদেরকে ৩ শ' টাকা করে ঘুষ দিতে হতো। অর্থের বিনিময়ে বিজু ও সুলতান আহমেদ কর্মচারিদের রোষ্টার বন্টন করতেন। বিজুর বিরুদ্ধে কথা বলায় তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন

করা হয়। বিষয়টি ডাক্তার রফিকুল হক বাবলুকে জানানো হলেও তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি। এছাড়া বিজুর নেতৃত্ব হাসপাতালের বড় বড় টেন্ডার নিয়ন্ত্রিত হত বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সূত্র জানায়, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ)'র প্লট বিক্রির জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। প্রায় ৫০ লাখ টাকার টেন্ডারে বিজু অংশ নেন। কিন্তু লটারীতে বাধেনি। হাসপাতালের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারির পক্ষে অর্ধ কোটি টাকার টেন্ডারের অংশ নেয়ার খবরে সবাই হতবাক হয়েছে। এছাড়া বিজুর প্রভাব খাটিয়ে তার বোন জাহানারা ছবি ও বোনাই বদরুদ্দোজা হাসপাতাল চত্বরে ড্রাইভারদের জন্য সংরক্ষিত কোয়াটারে ১৯৯২ সাল থেকে বসবাস করে আসছেন। কিন্তু কোন প্রকার ভাড়া প্রদান করেন না। হাসপাতালের কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নামে উঠানো চাঁদার টাকা ফেরত চাইলে বিজু সংশ্লিষ্টদের জানায়, তাকে যৌথ বাহিনী গ্রেফতার করার পর পুলিশ ও আদালতে এ টাকা ব্যয় হয়েছে। ফলে তা ফেরত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

‘নিয়োগ বাণিজ্য’ অবৈধ অর্থ উপার্জনে অন্যতম হাতিয়ার

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য বিভাগে অবৈধ অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম নিয়োগ বাণিজ্য ও হয়রানিমূলক বদলি। এ পথ অনুসরণ করে এগিয়ে রয়েছেন বিএমএ নেতা ডা. রফিকুল হক বাবলু ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের স্টেনোগ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লা। এ উপায়ে তারা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। করেছেন স্ত্রী ও নিজেদের নামে-বেনামে অঢেল অর্থ সম্পদ। বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য বিভগের অবৈধ অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম ছিলো নিয়োগ বাণিজ্য, হয়রানি, ভুয়া চিকিৎসা সনদ ও শাস্তিমূলক বদলি। ক্ষমতার দাপটে কতিপয় ব্যক্তি এ সুবিধা ভোগ করেছেন। এ সময় অসংখ্য লোককে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে এবং মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে,‘ত’ অদ্যাক্ষরযুক্ত একজন চিকিৎসক তদন্ত দলের কাছে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অভিযোগ করেন, বিএমএ নেতা ডা. রফিকুল হক বাবলুকে সন্তুষ্ট করতে না পারায় ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে তাকে চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি হাসপতালে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। এর মধ্যে ২০০৩ সালে তার বড় ভাই এবং ২০০৫ সালে মেঝ ভাই মারা যান। কিন্তু অনেক দূরে কর্মস্থল হওয়ায় তিনি ভাইদের শেষ দেখা এবং নিজ হাতে দাফন কাফনের ব্যবস্থাও করতে পারেননি। ডা. বাবলুর অবাধ্য হওয়ায় আরো ৫/৬ জনকে এভাবে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। তৎকালিন সময় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. হামে জামাল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে ২ লাখ ১০ হাজার ১৩৯ টাকা অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ‘আ’ অদ্যাক্ষরযুক্ত কর্মকর্তা তদন্ত কমিটির কাছে বলেছেন, তাকেও হয়রানিমূলক ভাবে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের স্ব-ঘেষিত সভাপতি শরীফুজ্জামান বিজু এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও অফিস সহকারী মাহবুব চাঁদা আদায় করেছেন। তদন্ত দল অনুসন্ধানে জানতে পেরেছেন, বিএমএ নেতা ডা. রফিকুল হক বাবলু বেশ কয়েক বছর ধরে জেনারেল হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা হলেও খুলনা শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি নগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর নামে ৫ কাঠা জমির ওপর বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি ক্রয় করেন। এছাড়া প্রতিমাসে তিনি জিপি ফান্ডে ১০ হাজার টাকা করে সঞ্চয় করেন। এর বাইরে তার একটি মেয়ে বেসরকারী মেডিকেল কলেজে পড়ালেখা করে। অথচ তার স্ত্রী গৃহবধূ। ডা. বাবলু বৈধভাবে যে অর্থ আয় করেন তার সাথে সম্পদের সামঞ্জস্যতা নেই । এছাড়া তিনি এ অর্থ-সম্পদের উৎস সম্পর্কে তদন্ত কমিটির কাছে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন বিভাগের পর্যায় নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন বলে তদন্ত কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। বিএমএর অপর নেতা ডা. আখতারুজ্জামান তাকে সহায়তা এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রভাব খাটাতে পারেন বলেও তদন্ত কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। বরখাস্তকৃত হিসাব রক্ষক শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন তৎকালীন সময়ে সিভিল সার্জন অফিসে কর্মরত থাকার সুবাদে অবৈধভাবে নিজের ভাইয়ের ছেলেকে নিয়োগ দিয়েছেন। অপরদিকে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মোঃ ফজলুল করিম ২০০৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর পয /খুবি/ শাখা-২/স্টেনো/টাইপিস্ট/২০০৬/১৮২৭ (৫) নং স্বারকে সিভিল

সার্জন অফিসের কীটকুশলী শেখ আব্দুল ওয়াদুদকে বদলি করেন। কিন্তু পুনরাদেশ ছাড়াই স্টেনো টাইপিষ্ট পদে বিধি বহির্ভূতভাবে অন্যজনকে বহাল করেন। এছাড়া মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডা. এস এম জাফরউল্লাহ একটি আদেশ জারির মাধ্যমে ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদকে হাসপাতালের নির্মাণ কাজ দেখাশুনা ও তদারকির দায়িত্ব দেন। এর মাধ্যমে তিনি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে তদন্ত কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। সুলতান আহমেদের সময় হাসপাতালে কথিত ফ্রি সার্ভিসের প্রসার ঘটে । তাকে চাঁদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মাসের পর মাস বেতন বন্ধ রাখতেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ে কর্মরত স্টেনো গ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লা জোট সরকারের শেষ সময়ের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। তিনি নামে-বেনামে কয়েকটি বাড়ি ও অর্ধশত বিঘার মত জমি ক্রয় করেছেন। একটি ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধি তদন্ত কমিটির জিজ্ঞাসাবাদে জানান, খালিশপুরের পোর্ট হেলথ অফিসের এমএলএসএস পদে ৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে একজন ফরিদ আহমেদের ভাগ্নে। এছাড়া তার বোন রোকেয়াকে খুলনা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে চাকরি দেয়া হয়েছে। তিনি সরকারের ৫ বছরের ব্যবধানে তার গ্রাম চিতলমারী উপজেলার কলিগাতী এলাকায় ৪০ বিঘা জমি ও মাছের ঘের করেছেন। যার মূল্য প্রায় ২৫ লাখ টাকা। নগরীর রায়ের মহল মৌজায় ৫৯১ দাগের ১০ লাখ টাকায় ৭ কাঠা জমি ক্রয় করে ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে বাউন্ডারী ওয়াল, ১ লাখ টাকা ব্যয়ে টিনশেড ঘর, তার স্ত্রী পলি আহমেদের নামে মুজগুন্নী আবাসিক এলাকায় ১৮ নম্বর রোডে ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪ কাঠা জমি, ৪ তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একটি ভবন, শ্বশুর বাড়ি সংলগ্ন স্থানে ৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ২টি বাড়ি, খুলনার শ্মশানঘাট এলাকায় ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন। তিনি নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্য, পদোন্নতি, উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান ও হয়রানিমূলক বদলির মাধ্যমে এসব অর্থ উপার্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান সহকারী মাহাবুব রহমান, হিসাব রক্ষক শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওয়ার্ডবয় শরিফুজ্জামান বিজু, সুইপার সর্দার আকতার হোসেন ও স্টেনোগ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও দুর্নীতিবাজ রাঘব বোয়ালরা রয়েছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সাবেক সুপার ডা. হামে জামাল কর্তৃক ব্লাড ব্যাংক থেকে অবৈধভাবে গ্রহণকৃত ২ লক্ষাধিক টাকা সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন।

‘ভুয়া’ মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যবসা জমজমাট

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভুয়া চিকিৎসা সনদ বাণিজ্য চলছে জমজমাটভাবে । বছরের পর বছর ধরে এ বাণিজ্য অব্যাহত থাকলেও তা বন্ধের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়নি। কতিপয় অসৎ চিকিৎসক এবং কর্মচারিদের সিন্ডিকেট-এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বহাল তবিয়তে। তবে আইওয়াশ হিসেবে হাসপাতালে ইনজুরি সনদ প্রদানের জন্য কথিত বোর্ড গঠন করা হলেও তা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে এ চক্রের হাতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা মেডিকেল সনদ প্রত্যাশী রোগীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, অর্থ ছাড়া খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট পাওয়া কল্পনাপ্রসূত। অর্থ ছাড়া এ হাসপাতাল থেকে আজ অবধি কোন রোগী সনদপত্র পেয়েছেন- এমন নজির নেই। মূলত, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মাধ্যমে চিকিৎসকরা এ বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ কর্মচারি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের সুপার পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা হয় বলে সূত্র দাবি করেছে। সূত্র মতে, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি শরিফুজ্জামান বিজু ও ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ সনদ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের নেতৃত্বে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মচারি ও বহিরাগত দালালদের সমন্বয়ে শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী খলিলুর রহমান খলিল, নিজামুদ্দিন নিজাম, হাসান, নিতাই, পরিমল ও মুরাদের নাম বেশ আলোচিত। দীর্ঘদিন ধরে এরা এ হাসপতালের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত থেকে বহাল তবিয়তে এ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সূত্র জানিয়েছে, জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরিকৃত ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট সিন্ডিকেটের সাথে আবার নগরীর অলি-গলিতে গড়ে ওঠা চিকিৎসক নামধারী কয়েকজন অসৎ ব্যক্তিও জড়িত রয়েছে। এর বাইরে এক্সরে ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টরাও এ সিন্ডিকেটের সাথে সম্পৃক্ত। খুমেক’র একটি সূত্র জানিয়েছে, ইনজুরি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। যার চেয়ারম্যান রাখা রয়েছে এখানকার আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর এম ও) কে। কিন্তু গঠিত বোর্ড শুধুমাত্র কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে এ বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না। যেহেতু বিভিন্ন ঘটনায় আহত রোগীর জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। থানা, আদালত, সংশ্লিষ্ট অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে এ সনদ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সঠিক পথে মেডিকেল সার্টিফিকেট পেতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। ফলে সহজ এবং স্বল্প সময়ে সনদ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে বিকল্প পথ ধরে প্রয়োজন মেটাতে হয়। আর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সিন্ডিকেট সদস্যরা হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা। অবৈধ পথে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট পেতে হলে আড়াই থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর পরিমান ১০ হাজার টাকাও ছাড়িয়ে যায় বলে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সনদ নেওয়ার জন্য কোন অর্থ নেয়া হয়না বলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা দাবি করলেও সিন্ডিকেট সদস্যরা বিষয়টি স্বীকার করেছে। তবে চিকিৎসকরা জানান, থানা বা আদালতের চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ইউনিয়নের সভাপতির পদটি ১৮ বছর ধরে অবৈধ দখলে

নির্বাচন হয় না। কোন কমিটিও নেই। তবুও সভাপতি। তিনিই সব। তার ওপরে উঠার সামর্থ্য(!) নেই কারো। নিজেকে সবকিছুর উর্ধ্বে বলে দাবিদার সহস্যাবৃত্ব এ ব্যক্তির নাম শরীফুজ্জামান বিজু। ১৮ বছর ধরে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতির পদটি দখল করে রেখেছেন। এ ইউনিয়নের নামে কর্মচারিদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হয় নিয়মিত। সবাইকে ‘ম্যানেজ’ করে স্বার্থ হাসিল করা চতুর এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাহাড় জমে গেছে। নারী কেলেংকারী ও চুরি নাটক থেকে শুরু করে বহু অপকর্মের নায়ক তিনি। তার অপকর্মের নীরব স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোটা হাসপাতালটি। হাসপাতাল থেকে বিজু ও তার সহচরদের সবচেয়ে বেশি অবৈধ আয় হয়েছে ডিউটি বণ্টন এবং ইউনিয়ন ও কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নামে তোলা চাঁদার মাধ্যমে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, শরীফুজ্জামান বিজু ১৯৮৮ সালের জুন মাসে ওয়ার্ড বয় হিসেবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকরি পায়। তার পিতার নাম শেখ ইমান আলী। নিয়োগের দু’বছর পর থেকেই কোন প্রকার নির্বাচন ছাড়াই সে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের সভাপতি পদটি দখল করে। দীর্ঘ ১৮ বছরের ইতিহাসে এ ইউনিয়নের কোন নির্বাচন, কমিটি ও সভা কোন সদস্য হতে দেখেনি। এক নায়কতন্ত্র হিসেবে বিজুই এ ইউনিয়নের সদস্য, সভাপতি, কর্মকর্তা, কর্মচারি নিজেই। প্রতিমাসে ইউনিয়নের ১১০ জন সদস্যের কাছ থেকে সে ৫ টাকা হারে চাঁদা তুলে আসছে। ১৮ বছর ধরে উঠানো চাঁদার এ টাকা কোথায় জমা আছে বা কোন খাতে, কীভাবে ব্যয় হয়েছে-তা জানার সাধ্য কারো নেই। বিষয়টি জানতে চাওয়ার অপরাধে তার হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অনেকেই। বিজু, তার সহযোগী ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ ও সুইপার আকতার হোসেনের অপকর্মের বিষয় হাসপাতালের কর্মচারিরা জানিয়েছেন, গত ৫ বছর ধরে বিজুর ভূমিকা ছিলো হাসপাতালের পরিচালক স্টাইলে। সে কখনই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কখনই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস করেনি। হাসপতালে কর্মচারির সংখ্যা কম থাকায় বিভিন্ন কাজে সমস্যা হলেও বিজু কাজ না করেই বেতন নিয়েছে। হাসপাতালের কর্মচারিদের ডিউটি বন্টনের ১৫ দিনকে একটি রোষ্টার হিসেবে ধরা হয়। সে হিসেবে মাসে দুটি এবং বছরে ২৪টি রোস্টার হয়। কর্মচারিদের ১৫ দিন অন্তর বাই রোটেশনে সকাল, বিকাল ও রাতে রোষ্টার বন্টন করা হয়ে থাকে। সুবিধাজনক স্থানে ডিউটি পেতে হলে বিজু ও ওয়ার্ড মাষ্টার রোষ্টার প্রতি ৩ থেকে ৫শ’ এমনকি হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে হয়। অসৎ কর্মচারিরা এ টাকা দিয়ে রোগীদের জিম্মি করে আরো বেশি টাকা আদায় করেন। টাকা না দিলে কষ্টের জায়গায় ডিউটি দেয়া হয়। এর প্রতিবাদ করায় একাধিক কর্মচারি তার রোষানলে পড়ে হয়রানির শিকার হয়েছে। এমনকি অনেককেই রাতের পর রাত একই স্থানে ডিউটি দেয়া হয়েছে। তার পক্ষ না নেয়ায় ওয়ার্ড মাষ্টার আবদুল গফুর ও প্যাকার টিপু সুলতানকে এ হাসপাতাল থেকে অপমান করে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। সে রোষ্টার খাত থেকেই বিজু মাসে আয় করেছে অর্ধ লাখ টাকা। অপরদিকে, গত কয়েক মাস আগে হাসপতালের হিসাব রক্ষণ বিভাগে একটি চুরি নাটক সাজানো হয়। এর নায়কও ছিলো বিজু বলে কথিত রয়েছে। ওই সময় হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, প্রমাণাদিসহ নগদ ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়। ওই ঘটনায় বিজুকে গ্রেফতার করে রিমান্ডেও নেয় পুলিশ। এতকিছুর পরও শুধুমাত্র বিজুকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার চাঁদাবজি ও অবৈধ অর্থের উৎস এবং চুরি নাটক রহস্য উদঘাটন করা হয়নি। ফলে বিজু সব কিছুকে থোড়াই কেয়ার করে বহাল তবিয়তে রয়েছে। এমনিক সে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালানোর সাহস দেখাচ্ছে। যাতে সচেতন মহল হতবাক হয়েছে।

হাসপাতালের জরুরী ও বহির্বিভাগ দুর্নীতির ডিপো

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী ও বর্হিবিভাগটি দুর্নীতির ডিপোতে পরিণত হয়েছে। এ বিভাগ দু'টিতে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনাই যেন নিয়মে রূপ নিয়েছে। বিভাগ দু'টিকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে টাউট, দালাল ও নেশাখোরদের অপতৎপরতা। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড মাষ্টার ও বয়দের নিয়ন্ত্রণেই এসব অপকর্ম অব্যাহত রয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা কোনভাবেই হয়রানির হাত থেকে বাঁচতে পারছেনা। প্রত্যক্ষদর্শী, রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা অভিযোগ করেছেন, বিভাগের বৃহৎ এ হাসপাতালে সব থেকে বেশি অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং হয়রানি জরুরী ও বহির্বিভাগে করা হয়ে থাকে। এ বিভাগ দুটিকে কেন্দ্র করে টাউট, দালাল ও নেশাখোরদের সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের তথাকথিত সভাপতি শরীফুজ্জামান বিজুই এ সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে প্রচার রয়েছে। তার ইশারায় এ বিভাগে যত অনিয়ম সবই হয়ে থাকে। এছাড়া হাসপতালের বহির্বিভাগ ও জরুরী বিভাগে কর্মরত নার্স, ওয়ার্ড মাষ্টার, ওয়ার্ড বয় সুইপার এসব অপকর্মের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অভিযোগ রয়েছে। জরুরী বিভাগে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলেও তার যথাযথ ব্যবহার হয় না। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত না করেই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বড় ধরনের ইনজুরী নিয়ে আসা রোগীদের গুরুত্বসহকারে এ বিভাগে চিকিৎসা প্রদান করা হয় না বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন। অধিকাংশ সময় এ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করেন না। অধিকাংশ রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা ওয়ার্ড বয় ও সুইপার দ্বারা করা হয়। অপরদিকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেশি অর্থ আদায় করা হয় বলে অধিকাংশ রোগী অভিযোগ করেছেন। খুচরা নাই-এ অজুহাত দেখিয়ে টিকিট কাউন্টারে কর্মকর্তারা এ অর্থ হাতিয়ে নেন। পাশাপাশি এ দুটি বিভাগের সামনে বিভিন্ন ওষুধের দোকানের প্রতিনিধি রোগী ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকে। বাকিতে ওষুধ দেয়ার নাম করে তারাও রোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় অতিরিক্ত অর্থ। সূত্র জানায়, বিভাগের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা সহজ-সরল রোগীদের হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন প্রাইভেট চেম্বার ও ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয় প্রথমেই। রোগী ধরার এ ফাঁদের নেপথ্যেও রয়েছে বিজুর কালো হাতের ইশারা। তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের দ্বারা রোগী ভাগিয়ে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক ও চিকিৎসকের কাছ থেকে মোটা অংকের কমিশন পায় এরা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় দীর্ঘদিন থেকে কয়েকটি চিহ্নিত দালাল চক্র এসব অনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা এসব দুষ্ট চক্রের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত এবং সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বিষয়গুলো তাদের গোচরে এসেছে। অচিরেই এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দক্ষিণ জনপদের মানুষের অতি প্রয়োজনীয় এই হাসপাতালটির এসব অনিয়ম উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরী ভিত্তিতে দেখা দরকার বলে সচেতন মহলের অভিমত।

দালাল ও মেডিকেল প্রতিনিধিদের অপতৎপরতা অব্যাহত

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি রোগী ধরার ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে দালাল ও মেডিকেল প্রতিনিধিদের অপতৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এদের হাতে এখানে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ হাসপাতাল থেকে প্রায় দু'বছর আগে দালাল ও মেডিকেল প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলেও তা বাস্তবে রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হিসেবে দালাল ও মেডিকেলের প্রতিনিধিদের সাথে খোদ হাসাপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জড়িত থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে এ হাসপাতালটিকে দালাল মুক্ত করা যাচ্ছেনা। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রায় দু'বছর আগে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 'দালাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সাথে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদেরও হাসপাতালে প্রবেশের ওপর সময় বেধে দেয়া হয়। কিন্তু সে নিয়ম অনিয়মে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসকদের আগ্রহ থাকার কারণেই মূলত এটি বাস্তবায়ন হচ্ছেনা বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। কারণ হিসেবে সূত্র জানিয়েছে, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের আয়ের একটি বড় অংশ আসে এ খাত থেকে। বর্তমানে সকাল দশটা বাজার আগেই হাসপাতালের নব-নির্মিত ভবনের সামনে জড়ো হয় শতাধিক মোটর সাইকেল। বিভিন্ন কোম্পানীর মেডিকেল প্রতিনিধিরা ডাক্তারদের সাথে গিয়ে আলাপচারিতার মধ্যে সময় কাটান। রোগীরা বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়না। এক পর্যায়ের মেডিকেল প্রতিনিধিদের ভিজিট দেয়া শেষ হলেই শুরু হয় ডাক্তারদের বাড়ি ফেরার তাড়া। দুপুর গড়িয়ে যাবার সাথে সাথেই তাদের দেখা যায় না হাসপাতাল বাউন্ডারীতে। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন। কিন্তু কোন ফল হচ্ছেনা। খুমেক হাসপাতালের সামনে রয়েছে বিশ্বাস, উদয়ন, কম-প্যাথ:, সুরক্ষা, পপুলার ও নাহীদ ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এবং মোমেনা ক্লিনিক নামের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে মোমেনা ক্লিনিকটি এক সময় নাহার ক্লিনিক করার পর আবার তা মোমেনা করা হয়। এখানকার অধিকাংশ ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারেরই কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। কোনটির রেজিস্ট্রেশন থাকলেও তা নেই পূর্ণাঙ্গ। একটি ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের রেজিষ্ট্রেশন থাকলেও নেই এক্স-রে করার অনুমতি। হাসপাতাল এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, হাসপাতালের সামনের নাম সর্বস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানের জন্য নির্ধারিত 'দালাল' বাহিনীর হাতে রোগীরা কীভাবে জিম্মি থাকে তার বাস্তব চিত্র। বর্হিবিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে নামার সাথে সাথেই যখন রোগী বা রোগীর লোক গন্তব্যের দিকে রওনা হয়, তখনই 'তিন বাহিনী'র হাতে ধরা পড়তে হয় তাদেরকে। প্রথমে মেডিকেল প্রতিনিধিদের হাতে দিতে হবে স্লিপটি। কি কি ওষুধ কোন ডাক্তার লিখেছেন তা না দেখা পর্যন্ত স্লিপগুলো ছাড়া হয়না। এর পর রয়েছে ডায়াগনষ্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানের 'দালাল'। স্লিপটি হাতে নিতেই ভাই বা বোন সম্বোধন করে পরীক্ষার জন্য নেয়া হয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। কখনও হাসপাতালের ডাক্তার একজন কর্মচারীকে ডেকে তার সাথে রোগীটি পাঠিয়ে দেন বাইরে। রোগীকে বলা হয়, ওর সাথে যান। সামনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিয়ে আসুন। কর্মচারীটি রোগী নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষমান দালালের হাতে ধরিয়ে দিয়ে যান। এর পর দিন বা সপ্তাহ শেষে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের কাছে চলে যায় পার্সেন্টটেন্স্ টাকা। আর 'দালাল' নামক ঐসব লোকদের জন্য রয়েছে আরও একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্টন্স্। এছাড়া সামনের ওষুধের দোকানগুলোর জন্যও নির্ধারিত থাকে আলাদা 'দালাল'। তাদেরও কাজ প্রায় একই। রোগীটি

ডাক্তার দেখিয়ে নামার সাথে সাথেই স্লিপটি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হয় নির্ধারিত ওষুধের দোকানের দিকে। এছাড়া খুমেক হাসপাতালে কোন নতুন রোগী ভর্তি হলে তার পেছনেও লাগানো থাকে দালাল শ্রেণীর লোক। খুমেক হাসপাতালের সামনের ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ওষুধের দোকানের দালালরা হাসপাতালের সকলের কাছেই পরিচিত। তাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তাদের হাসপাতাল অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ হয় দু'বছর আগে থেকেই। যে কারণে তারা হাসপাতাল বাউন্ডারীতে থাকলেও অনেক সময় ভিতরে যেতে পারে না। ফলে ভিতর থেকে কর্মচারীরা রোগী নিয়ে এসেই হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। এভাবেই চলছে ডাক্তার, কর্মচারী, মেডিকেল প্রতিনিধি, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার আর ওষুধের দোকানীদের যৌথ ব্যবসা। মেডিকেল প্রতিনিধিদের মন রক্ষায় অনেক সময় যেমন ডাক্তারদের লিখতে হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ওষুধ, তেমনি পার্সেন্টটেন্স্ পেতে দিতে হয় বিভিন্ন পরীক্ষা। আবার ডাক্তার এবং দালালদের পার্সেন্টটেন্স্ পয়সা ওঠাতে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ওষুধের দোকানগুলোও নিয়ে থাকে অতিরিক্ত পয়সা। এসব ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে দ্রুত গতিতে দেয়া হয় বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট। দ্রুত রিপোর্ট দেয়ার জন্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সীল-প্যাড থাকে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকদের কাছে। নিজেরাই রিপোর্ট লিখে তড়িঘড়ি করে রোগীকে বুঝ দিয়ে বিদায় করে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা এ ব্যবসা চালিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্টদের কোন মাথা ব্যথা নেই। যেহেতু ডাক্তারদের সাথে এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অলিখিত চুক্তি রয়েছে সেহেতু তারাও এগুলো বন্ধে কার্যত কোন ভূমিকা রাখেন না বলে সূত্র দাবি করেছে।

চলছে ঔষধ ও অপারেশন সরঞ্জাম চুরির মহোৎসব

ঔষধ ও অপারেশন সরঞ্জাম চুরির বিষয়টি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুর্নীতিতে নতুন সংযোজন এনেছে। করেছে নতুন মাত্রা যোগ। সাধারণ ওর্য়াড, কেবিন এবং অপারেশন থিয়েটার থেকেই এ ওষধ চুরি হয়ে থাকে। তবে অন্যদের চেয়ে সেবিকার কাজে নিয়োজিত নার্সদের বিরুদ্ধেই-এ অভিযোগটি বেশি। এদিকে, বৃহৎ এ হাসপাতালে সরকারি বরাদ্দকৃত ৮৫ প্রকার ওষধের মধ্যে ৫৪ ধরনেরই সরবরাহ নেই। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধিকাংশ নার্স বছরের পর বছর একই স্থানে কর্মরত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে উৎকোচের বিনিময়ে 'ম্যানেজ' করে তারা এ সুযোগ পেয়ে থাকে। দু' একজন ছাড়া অধিকাংশ নার্সই কোন না কোনভাবে ওষধ চুরির সাথে জড়িত রয়েছে। এরা মফস্বল এলাকা থেকে আসা সহজ-সরল রোগী ও তাদের স্বজনদের ভুল বুঝিয়ে, বিভ্রান্ত করে ওষধ চুরি করে থাকে। কেবিন এবং ওয়ার্ডে ডিউটির ফাঁকেই চলে ওষধ চুরির ধান্দা। এ কারণে রোগীর লোকজন বাইরে থেকে ক্রয়কৃত ওষধ একই সাথে বের করতে চায়না। কারণ নার্সদের কাছে ওষধ চলে গেলে তা ফেরত পাওয়া যায় না বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। নার্সরা দুর্ব্যবহারও করে থাকে রোগী ও তাদের স্বজনদের সাথে। এর বাইরে অপারেশন থিয়েটারে ডিউটির সুযোগ পেলে সেখান থেকে দামী ওষধ এবং অপারেশন সরঞ্জাম চুরির সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা যে যেভাবে পারে রোগীর পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত মালামাল নিজের মনে করে লুকিয়ে ফেলে। কোন কোন রোগী ওটিতে প্রবেশের আগেই সমুদয় ওষধ বুঝে নেয়া হয়। কিন্তু তার পরেও ওটি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভিতর থেকে আসতে থাকে একাধিক স্লিপ। রোগীর লোক তখন উপায়ন্তর না পেয়ে বাধ্য হয়েই সেগুলো কিনে দেন। কিন্তু ওটি থেকে ওষুধ ফেরত দেয়ার নজির নেই বললেই চলে। এর আগে কয়েকদফায় নার্সদের ব্যাগ তল্লাসী করে ওষুধ এবং অন্যান্য মালামাল চুরির ঘটনা হাতে-নাতে ধরা পড়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার হয়নি। এর নেপথ্যে কথিত কর্মচারি ইউনিয়নের নেতা বিজুসহ অন্যদেরও কালো হাত কাজ করে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, এ হাসপাতালে চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের বদলী হলেও নার্সদের সহজে হয়না। কোন কোন নার্স একাধারে এ প্রতিষ্ঠানে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কর্মরত রয়েছেন। সে সুবাদেই জুনিয়র এবং সিনিয়র নার্সরা হাসপাতালটিকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সম্পদগুলোও নিজের মত ভেবে ব্যবহার করে। হাসপাতালের ষ্টোর থেকেও ওষধ চুরির ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। ষ্টোর থেকে ওয়ার্ডে যেসব ওষধ দেয়া হয় তারও যথাযথ ব্যবহার না করে সেগুলো বাইরে পাচার হয় নার্স বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাধ্যমে। কয়েক মাস আগে খুমেক হাসপাতাল থেকে ওষধ পাচারের সময় হাতে-নাতে এক নার্স ধরা পড়ে। কিন্তু সিবিএ নেতা বিজু ও তার সহযোগিরা মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে পুরো ঘটনা ধামাচাপা দেয়। পরে কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেও তা সরকারী ওষধের পরিবর্তে দেখানো হয় দোকানের কেনা ওষুধ হিসেবে। ফলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এভাবে নার্স-কর্মচারীদের যোগসাজসে খুমেক ও জেনারেল হাসপাতালে চলছে ওষধ চুরির মহোৎসব। সূত্র জানায়, নার্স-কর্মচারিদের সাথে কয়েকটি ওষধের দোকানের চুক্তি রয়েছে। নগরীর হেরাজ মার্কেট ও হাসপাতালের সামনের দোকানগুলোর সাথে তাদের চুক্তি মোতাবেক বিক্রি করা হয় চোরাইকৃত ওষধ। অনেকের সাথে কোন কোন ক্লিনিক বা ডায়াগনষ্টিক সেন্টারেরও যোগাযোগ রয়েছে। আর এভাবেই সরকারী

হাসপাতালের পাচারকৃত এসব ওষুধ বিক্রি হয় ওষুধের দোকানে। এদিকে, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ৮৫ প্রকার ওষুধের মধ্যে ৫৪ আইটেমেরই সরবরাহ নেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৮ প্রকার ট্যাবলেট, ৩ ধরনের ক্যাপসুল, ৪ ধরনের সিরাপ, ৬ ধরনের চোখেরর ড্রপ, ৬ প্রকার মলম, ১৫ আইটেমের ইনজেকশন ও দু'ধরনের অন্যান্য ওষুধ। একদিকে চুরি অন্যদিকে সরবরাহ না থাকায় যে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকারি এ হাসপাতালের জন্ম হয়েছিল সেটি চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।

দুর্নীতি তদন্তে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অব্যাহত, লাগামহীন দুর্নীতি তদন্তের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিবকে প্রধান করে উচ্চ পর্যায়ের গঠিত এ তদন্ত কমিটির আজ খুমেকে আসার কথা রয়েছে। কমিটি আজ ও আগামীকাল সরেজমিনে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করবে বলে সূত্র জানিয়েছে। অপরদিকে, হাসপাতালে চুরি নাটক, মামলা ও খালাসের নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। হাসপাতালের প্রধান কর্তা থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত দুর্নীতির মাষ্টারে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হলেও এর লাগাম টেনে ধরা যায়নি। রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতার দাপটে এসব দুর্নীতির স্বাক্ষর রেখেছে কিছু সংখ্যক চিকিৎসক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারি। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অসংখ্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে যৌথ বাহিনী বৃহত্তম এ হাসপাতালে কয়েকদফা অভিযান চালিয়ে চলমান পট পরিবর্তনের চেষ্টা চালায়।

যার সুফলও কিছুটা আসতে শুরু করে। এ অবস্থাকে সামনে রেখে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব বাসুদেব আচার্যকে সভাপতি করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-৩) মোঃ আমিন উল আহসান এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আকরাম আলী। তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঢাকায় এক বৈঠকে দুর্নীতির বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী গত ১৪ জানুয়ারী পকউ/উ-২/বিবিধ-২০/০৭/১০ নং স্মারকে হাসপাতালের বর্তমান সুপার গোলাম হোসেন বরাবর নোটিশ প্রেরণ করেন। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতি তদন্তের লক্ষ্যে আগামী ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী তদন্ত কমিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করবে। এ সময় হাসপাতালের সাবেক সুপার ও বর্তমান বরখাস্তকৃত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকর্তৃক পরিচালিত সিডিসি'র উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. মোঃ হামে জামাল (কোর্ড নং ৩২৯৩২) কর্তৃক ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত কোটি টাকা দুর্নীতিরও তদন্ত হবে। সে লক্ষ্যে হাসপাতাল সুপারের কার্যালয়ে সকাল ১১টায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকতে হবে। এদিকে নোটিশ পাওয়ার পর খুমেক হাসপাতালের সুপার ডা. মোঃ গোলাম হোসেন অপর এক নোটিশে তদন্ত কমিটির কাছে স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্য চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিসহ ১৪ জনকে তাগিদ দিয়েছেন। তবে তদন্ত কমিটি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আরো এক সপ্তাহ পরে আসবেন বলে অসমর্থিত একটি সূত্র জানিয়েছে। এদিকে, হাসপাতালের হিসাব রক্ষণ অফিস চুরি নাটকের মাধ্যমে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের ঘটনার নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সূত্র জানিয়েছে, হাসপাতালে চুরির ঘটনায় সুপার বাদি না হয়ে অন্যজনকে বাদি করা হয়। এ অবস্থায় বর্তমান সুপার অবৈধ সুবিধা নিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে দিয়ে বিজুর পক্ষে আদালতে স্বাক্ষ্য দেয়া হয়। ফলে বিজু খালাস পায়। অথচ সরকারী অর্থ উদ্ধারের জন্য তিনি কোন দক্ষ আইনজীবির পরামর্শ নেননি। বর্তমানে বিজুর বরখাস্তাদেশ প্রত্যাহারের জন্য সুপার স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছেন। কমিটির সদস্যরা সবাই বিজুর লোক বলে সূত্র জানিয়েছে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাসপাতালের ডায়েট (খাদ্য) শাখার এক লোকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি ফাঁস হলে

গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। সুপার ডা. গোলাম হোসেন এর আগে বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকায় তাকে কয়েক বছর ধরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করে রাখা হয়। তিনি চাকরিতে যোগদান করে আবারও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন বলে সূত্রটি দাবী করেছে। এর আগে ভুরি ভুরি অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১২ আগষ্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্বা অঃ/পার-২/আর-৩৭/৮৩/৯৮৯১৮/১(৬) নং স্মারকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি করা হয় ঢাকার মহাখালী আইইডিসিআরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভাইরোলজী) ডা. মোঃ শুকুর উদ্দিন মৃধাকে। সদস্য ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (শৃংখলা-১) ডা. মোঃ নূরুল হক মোল্লা ও অধিদপ্তরের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আলমগীর কবির খান। তদন্ত কমিটি গত বছরের ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সরেজমিন পরিদর্শন, ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের স্বাক্ষ্যগ্রহণ করে। তদন্ত শেষে গত ৮ নভেম্বর কমিটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর খুমেকের ১৮ জন চিকিৎসক ও কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অভিযুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে। যার সূত্র ধরে গত ৩ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোঃ মোজাফ্ফর হোসেনের পক্ষে সহকারী পরিচালক (শৃংখলা-২) ডা. মোঃ আকরাম আলী স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 'বড়লাট' খ্যাত ও কর্মচারীদের মূর্তিমান আতংক এবং তথাকথিত চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ার্ড বয় শরীফুজ্জামান বিজু, হিসাব রক্ষক শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান সহকারী মাহবুবুর রহমান, সুইপার আক্তার হোসেন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক'র কার্যালয়ের ষ্টেনো গ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত স্বা অঃ/পার-২/এইচ-৩৯/৮০/৪৬৯৭৩/১(১২) নং স্মারকের আদেশে উল্লেখ করা হয়, হাসপাতালের ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির দায়ে উল্লিখিত কর্মচারিদের সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫'র ১১(১) ধারা মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এছাড়া তদন্ত কমিটি চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন বি এম এ, খুলনার সভাপতি ডা. মোঃ রফিকুল হক বাবলু, সাধারণ সম্পাদক ডা. মোঃ আখতারুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মতিয়ার রহমান খান এবং জুনিয়র কনসালট্যান্ট (সার্জারী) ডা. মোঃ রফিকুল ইসলামও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দেয়া রিপোর্টে উল্লেখ করে এদের বিরুদ্ধে উথাপিত অভিযোগের প্রমাণ/সত্যতা পাওয়া গেছে। চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও ওয়ার্ড বয় শরীফুজ্জামান বিজু তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সারাক্ষণ হাসপাতালে বিচরণ করে। এছাড়া সে বহাল তবিয়তে তার নানা অপকর্মও অব্যাহত রেখেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী একাধিক সূত্র নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানিয়েছে। খুমেক'র নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. মোঃ গোলাম হোসেনের সাথে যোগসাজস ও মোটা অংকের চুক্তির বিনিময়ে শরীফুজ্জামান বিজু ও অন্য বরখাস্তকৃতরা চাকরিতে পুনর্বহালের তৎপরতা শুরু করেছে। এজন্য ডা. গোলাম হোসেন স্থানীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করে বরখাস্ত প্রত্যাহারের চেষ্টা করছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। এর মধ্যে তিনি বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক'র কার্যালয়ের ষ্টেনোগ্রাফার ফরিদ আহমেদ মোল্লাকে পুনর্বহাল করেছেন বলে জানা গেছে।

৬৬ লাখ টাকার দুর্নীতি ধামাচাপা দিতেই চুরি নাটক!

খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাবেক সুপার ডা. হামে জামালের ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ৬৬ লাখ টাকা দুর্নীতি ধামাচাপা দিতেই চুরি নাটক(!) সাজানো হয়। এ নাটকের মাধ্যমে এমএসআর যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত ফাইলপত্র গায়েব করা হয়েছে। যাতে করে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সুপারের বিশ্বস্ত তিন সহযোগীকে। যার অংশ হিসেবে চুরির ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলেও কোন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির গতকাল খুমেকে আসার কথা থাকলেও তা পেছানো হয়েছে। একাধিক সূত্র জানায়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চুরি নাটক, মামলা ও খালাসের নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। খুমেক হাসপাতালের ডা. হামে জামাল হাসপাতালের সুপার হিসেবে যোগদান করার পর থেকে তিনি বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিভিন্ন খাত থেকে তিনি প্রায় ৬৬ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এরমধ্যে তিনি ক্রয় কমিটির সভাপতি হিসেবেই অধিকাংশ অর্থ আত্মসাৎ করেন। সূত্র মতে হাসপাতালের চিকিৎসার সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য এসআর এন্টারপ্রাইজ ও সাইফুল ইসলাম ট্রেড লিংক নামক দুই প্রতিষ্ঠানকে ডা. হামে জামাল কার্যাদেশ প্রদান করেন। সে মোতাবেক তারা মালামাল সরবরাহও করে। কিন্তু এর মধ্যেই থেকে যায় বিশাল ঘাপলা। সূত্র জানায়, মালামাল যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে, তার চেয়ে কয়েকগুন বেশি দেখানো হয়েছে। এসআর এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক সরবরাহকৃত দুটি সিলিং লাইট (ওটি লাইট) ক্রয় করা হয়েছে সাড়ে ৫ লাখ টাকায়। অথচ এর বাজার মূল্য মাত্র ৫৮ হাজার টাকা। এখানে আত্মসাৎ করা হয়েছে ৪ লাখ ৯২ হাজার টাকা। এছাড়া সাইফুল ইসলাম ট্রেড লিংক কর্তৃক সরবরাহকৃত লারিং গ্যাসকোপ ক্রয় বাবদ ১ লাখ ১০ হাজার ৩'শ টাকা, দুটি ইসিজি মেশিন ক্রয় বাবদ ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ৩ টি এ্যানেসথেশিয়া মেশিন ক্রয় বাবদ ৪৯ হাজার ৫'শ টাকা, ৩টি ডায়াথার্মি মেশিন ক্রয় বাবদ ৭ লাখ ৩৫ হাজার টাকা এবং দু'টি ৪৪ বৈঃ জেনারেটর ক্রয় বাবদ আত্মসাৎ করা হয়েছে আরও ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন খাত থেকে তিনি মোটা অংকের অর্থ আত্মসাত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের এ্যানেসথেশিয়া চিকিৎসক ডা. শেখ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ডা. একেএম রবিউল ইসলাম, ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম, ডা. মল্লিক মনিরুজ্জামান এবং ডা. আ ন ম ফজলুল হক পাঠান স্বাক্ষরিত এক পত্রে বলা হয়, সরবরাহকৃত মালামাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যবহারের অনুপযোগী এবং অত্যন্ত নিম্নমানের। তার পরও তিনি মালামালগুলো পরিবর্তন না করে পাল্টা অভিযোগকারী চিকিৎসক ডা. একেএম রবিউল ইকবালকে অন্যত্র বদলীর পাশাপাশি অন্যদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেন। এসব ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এজি অফিস থেকে পৃথক তিনটি তদন্ত কমিটি তদন্ত সম্পন্ন করেছে। তদন্ত কমিটিকে সুপার ডা. হামে জামাল প্রভাবান্বিত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযোগ তার দুর্নীতির সম্পর্কে দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ তদন্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ তদন্তে তার সকল দুর্নীতি ফাঁসের আশংকা দেখা দিয়েছে। ফলে তিনি বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পন্থা বের করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী হাসপাতালের হিসাব বিভাগে চুরি নাটক সাজানো হয়। এর মাধ্যমে হাসপাতালের বিভিন্ন খাতের ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা লুটের পাশাপাশি পূর্বের

মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় ফাইলপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। নাটক বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অযথা বিভিন্ন অফিসের তালা এবং আলমারীও ভাঙ্গা হয়। এ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সুপারের বিশ্বস্ত স্টোর কিপার মোঃ ইমদাদুল ইসলাম, অফিস সহকারী সরদার মাহাবুবসহ তিনজনকে। তাদের যোগসাজশেই সুপার ডা. হামে জামাল এ ঘটনার জন্ম দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে পরবর্তীতে শরীফুজ্জামান বিজুকে ওই মামলায় গ্রেফতার করা হলেও বর্তমান সুপারের সাথে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে কৌশলে তাকে রক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির গতকাল খুমেকে আসার কথা থাকলেও তা পেছানো হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কমিটি আসবেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ডা. হামে জামাল সিভিল সার্জন থাকাকালে স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নেন। এ কাজে ব্যবহার করেন একাউনটেন্টকে।

সম্প্রসারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় থমকে পড়েছে

দুর্নীতি, অনিয়ম ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি ৫শ' শয্যায় উন্নীত হতে পারছে না। হাসপাতালের সম্প্রসারণে এ বিষয়গুলোই এখন সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে । ফলে অর্থ বরাদ্দ হলেও উন্নয়ন কাজে ব্যয় না হয়ে তা চলে গেছে দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের পকেটে। অপরদিকে, প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও দীর্ঘ প্রায় ৬ বছরেও এটি রাজস্ব খাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। খুলনাবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৮৮ সালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আড়াইশ' শয্যায় চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এর সাথে মেডিকেল কলেজ যুক্ত হলে এর নামকরণ করা হয় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। খুলনা বিভাগ ছাড়াও এখানে পটুয়াখালী, বরগুনা, মাদারীপুর, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা থেকে রোগীরা চিকিৎসা নিতে আসে। শয্যার বাইরে এখানে ভর্তি হওয়া রোগীদের বারান্দায় মেঝেতে চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু তাদের কোন রকম ওষুধপত্র দেয়া হয় না হাসপাতাল থেকে। এটি আড়াইশ শয্যা হলেও প্রায় সময় অতিরিক্ত রোগী ভর্তি থাকে। হাসপাতালটি প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকা দিয়ে নির্মিত হলেও বিভিন্ন জটিলতার কারণে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছেনা। ওষুধ ও পথ্য খাতেও বরাদ্দ বাড়েনি। বৃহৎ এ হাসপাতালে উন্নতমানের চিকিৎসা না থাকায় জটিল রোগে আক্রান্তরা ঢাকা ও দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নেয়। সূত্র জানায়, এরশাদ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে হাসপাতালটিকে ৫শ' শয্যায় উন্নীত করার ঘোষণা দেয় হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ ও ৯৬ সালেও অনুরূপ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। সর্বশেষ ২০০০ সালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি ৫শ' শয্যায় উন্নীত করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রায় ৪২ কোটি টাকার একটি পিপি পাঠানো হয়।

কিন্তু তাও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি এবং অনিয়মের কারণে আলোর মুখ দেখেনি। এ হাসপাতালে বর্তমানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম নেই। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি। রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ইসিজি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই মেশিন এবং কার্ডিও রেডি থেরাপী, সাইক্রিয়াটি ও বার্ণ ইউনিট নেই। অন্যান্য মেশিনের মধ্যে যাও আছে তার মধ্যে বেশির ভাগই থাকে বিকল। এছাড়া সুইপারদের মধ্যে রাজনীতি ঢুকে যাওয়ায় হাসপাতালটি ঠিকমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও করা হয় না। বিশেষ করে সুইপার সরদার আক্তার হোসেন, ওয়ার্ড বয় শরীফুজ্জামান বিজু, ওয়ার্ড মাষ্টার সুলতান আহমেদ সহ তাদের সহচরেরা কাজ না করেই প্রতি মাসে বেতন গ্রহণ করে আসছে। হাসপাতালে কর্মরত অধিকাংশ চিকিৎসকই বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করে থাকেন। তারা হাসপাতালে চিকিৎসার চেয়ে রোগীদের ক্লিনিকেই যেতে উৎসাহী করেন। ফলে হাসপাতালটি অনেকটা ইমেজ সংকটে পড়েছে। ক্ষুন্ন হচ্ছে ভাবমূর্তি। এ অবস্থায় হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়ন থমকে দাঁড়িয়েছে। এদিকে, হাসপাতালের বরখাস্তকৃত ভারপ্রাপ্ত প্রধান সহকারি স্বাস্থ্য ও সমাজ সেবার নামে খুমেক চত্বরে একটি গ্যারেজ করেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকাসহ হাসপাতাল, কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউটের প্রায় সহস্রাধিক স্টাফ কর্তৃক বছরে দু'বার চিকিৎসা বিষয়ক বই ক্রয় বাবদও হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া ডায়েট (খাদ্য) ক্লার্ক আমিনুর রহমান আমিন হাসপাতালে তথাকথিত কর্মচারি কল্যাণ সমিতির নামে মাসে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেছেন। তিনি ডিউটি বাদ দিয়ে আরো একজন কর্মচারিকে সাথে নিয়ে চাঁদার-এ টাকা রশিদ দিয়ে কালেকশন করে থাকেন। অথচ, সমিতির কোন রেজিস্ট্রেশন নেই। এছাড়া তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে হাসপাতাল কোয়ার্টারে ফ্রি বসবাস করছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রশ্ন জন্ম দিয়েছে।

Justice delayed, justice denied

Report
Justice delayed,
Justice denied

Reporter
Emran Hossain

Publication Date
11 November, 2009

Newspaper
The Daily Star

Current Employment
Staff Reporter
bdnews24.com

Justice delayed, justice denied

The Daily star investigation reveals how corruption and the manipulation of the legal system stops justice dead in its track for 16 years

- Over 2000 children killed by toxic paracetamol between 1980-92
- Corruption sabotaged the criminal cases
- Never-ending High Court stay orders prevent cases coming to trial
- Families kept in heart-breaking wait for justice in one of the worst ever crimes
- One case reopens today upon Star inquiry; one company was not even prosecuted, two other cases stuck in stays, another acquitted.

Manufacturers of adulterated paracetamol syrups, which caused the deaths of as many as two thousand children sixteen years ago from fatal kidney disease, have escaped punishment due to an extraordinary combination of corruption and mismanagement in the Directorate of Drug Administration (DDA) and other government agencies, an investigation by the Daily Star reveals.

In December 1992, chemical analysis proved that paracetamol syrups manufactured by five companies -- Adflame Pharmaceutical Ltd, Polychem Laboratories Ltd, BCI (Bangladesh) Ltd, Rex Pharmaceutical, and City Chemical and Pharmaceutical Works Ltd -- contained a lethal chemical diethylene glycol.

The taste on the drugs were above suspicion; using newly installed gas chromatography equipment, they were conducted by the government's own drug testing laboratory under direct supervision of an expert consultant from the World Health Organization (WHO). The results of subsequent independent testing undertaken laboratories in the US and obtained by the Daily Star -- confirmed the results.

Yet the High Court was persuaded in 1994 to order a temporary halt to criminal proceedings against the owners, directors, and managers of four of those companies on the basis of a circular published by DDA containing highly misleading information suggesting that Bangladesh had no adequate test facilities.

Moreover, in relation to the cases involving Polychem Laboratories and BCI Bangladesh, at no time in the last 15 years has DDA taken any action to correct the High Court's mistaken impression about the tests, and argue for the stay orders to be vacated. Remarkably, as a result, criminal proceeding against the

defendants from those two companies have been stopped for 15 full years.

The cases involving two other companies have fared no better. While the High Court stay of proceedings relating to Adflame Pharmaceutical was vacated two years ago - 13 years after it had been initially imposed - the Dhaka Drug Court promptly lost all the papers, and the public prosecutor remained unaware that the proceedings could actually continue.

It was only after The Daily Star informed the public prosecutor earlier this month of the new legal situation, and a massive four day hunt finally resulted in the discovery of those files, that the judge of the drug court scheduled today for reopening the proceedings.

The case against the owners of Rex Pharmaceutical is the only one of the four cases that resulted in a trial while City Chemical and pharmaceutical was never even prosecuted.

In November 2003, the judge acquitted the two defendants of Rex Pharmaceutical, questioning the integrity of the chemical tests. The court ruling however shows that the court was not informed of how the tests had been undertaken and the role of WHO in ensuring their accuracy. Moreover, the court was also not told that the law in fact did not permit it to question the accuracy of the tests. But DDA never appealed against the acquittal.

The decision in 1992 by DDA not to prosecute City Chemical and Pharmaceutical, although its syrup also tested positive for diethylene glycol, raises further questions about the government agency. At that time a director of the company was Khondker Mahtabuddin Ahamed who was the father-in-law of Barrister Abdus Salam Talukdar. Talukdar was the then secretary general of the erstwhile ruling party BNP and also its minister for local government and rural development. There appears no other explanation for Khondker Mahtabuddin Ahmed escaping prosecution, than this political connection.

HUNDREDS OF DEATHS

This remarkable story of corporate killing and impunity started in the early 1980's when significant numbers of young children were being admitted with serious kidney problems to Dhaka PG Hospital, now known as Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Hospital. The cause of the renal failures was not known, and most of the children died. When, in 1986, Dhaka's Shishu Hospital opened up a new nephrology ward, it also became inundated with children suffering from similar unexplainable renal failures.

The problem was even faced by Bangabhaban Medical Clinic, which provided health care to the president's and prime minister's staff and their family members, where about 20 children died. One of those who died from a kidney failure was a year and a half old Tanvir Ahmed whose father worked as an office assistant in the president's house.

"I cried, and begged the doctors to save the life of my child. I could not save him. I lost such a wonderful boy," Tanvir's mother, Peyara Begum, told The Daily Star. Another who died the same way was seven-year old son of Rakhal Chandra Barua, a chauffeur in the prime minister's pool. "The doctors told me that he died from a kidney failure. I could not understand why he died so fast, I buried my child with my own hands, when it should have been the other way around," he said.

A Scottish specialist, sent by WHO in 1988 to try and find out the cause, left Bangladesh after two month none the wiser. It is estimated that a total of 2,700 children died in unexplained circumstances from kidney failures between 1980 and 1992.

It was Dr. Hanif -- now a professor in Dhaka Shishu Hospital -- who finally worked out in the early 1990's that the cause must be adulterated paracetamol syrups, where the harmless diluents propylene glycol had been replaced with the toxic diethylene glycol, a much cheaper chemical but deadly if swallowed.

With DDA failing to organise tests of paracetamol syrups, Dr Hanif was himself forced to send a sample of the syrup used in both Shishu hospital and Bangabhaban clinic -- Adflame's 'Flammodol' -- for testing in the US. With the results showing that the sample had tested positive for diethylene glycol, Hanif wanted to publicise the situation immediately but was advised by his hospital authorities that more evidence was required. He therefore sent further samples to the US.

The results took a long time coming, and feeling the matter was of urgent public importance, in November 1992 Dr Hanif told a press conference of the results, and provided other evidence that suggest other paracetamol syrups were also contaminated.

GOVERNMENT TESTING

With the issue on the front page of newspapers, DDA was forced to take immediate and forceful action. It sent 135 samples of syrups to the government run Bangladesh Drug Laboratory (BDL) to be tested under the supervision of a WHO consultant, SK Roy .

As BDL it self did not have a gas chromatograph, Roy contacted Essential Drug Company Limited (EDCL) where the equipment had just been installed. "Roy came over to visit the laboratory and to check if the laboratory equipment was appropriate," recalled Anisul Islam, EDCL's then managing director, adding " During the tests, Mr. Maleque , the head of BDL and Dr Jakaria , his assistant at BDL, were present along" with WHO's Roy.

Shafiqur Rahman, the deputy manager of EDCL at the time, also remembers what happened, "These three men themselves conducted the test. They just used the equipment in our laboratory. It was totally under their supervision."

The results of the tests were known a few weeks later on December 3, 1992, with five brands being tested positive for containing 10 to 20 percent diethylene glycol.

However, just two days later, the erstwhile director of DDA Mukhlesur Rahman [now deceased] did something inexplicable - with serious consequences for the subsequent prosecution. He published a circular which stated, "As there is no appropriate arrangement in the government laboratory for detecting Diethylene Glycol in Paracetamol Syrup, samples of some of these brands have been sent abroad in November 1992 with the help of the WHO."

This statement was highly misleading as it suggested that BDL could not undertake proper tests in Bangladesh. In fact, Mukhlesur Rahman knew perfectly well that accurate tests had just been completed by BDL under WHO supervision using the right equipment.

Abul Khair Chowdhury, an assistant of DDA who in 1992 was a drug superintendent responsible for the investigation and prosecution of the three Dhaka cases, admitted to The Daily Star that he could find no reason why the circular stated that the tests could not be done effectively in Bangladesh. "I don't know why the notification was issued. The notice should not have contained this clause," he said.

CRIMINAL CASE FILED

Under public pressure on December 19, 1992, on the basis of the government laboratory tests, Abul Khair filed criminal complaints with the Dhaka Drug Court against directors and managers of three of the companies -- Adflame, Polychem, and BCI Bangladesh -- alleging that they had manufactured 'adulterated' and 'substandard' drugs. The offence allows the court to sentence a convicted person to 'rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years.' A similar complaint was made by an erstwhile drug superintendent Tomas Ak Biswas with the Mymensingh Drug Court against Rex Pharmaceutical owners.

Following the courts' summons most defendants surrendered and obtained bail, although some did abscond. The drug courts then issued charge sheets involving a total of 17 defendants.

The non-absconding defendants in each of the four cases then filed petitions with the High Court seeking stay of the criminal proceedings. The director of DDA had himself provided the companies with the perfect loophole. The defendants argued that since DDA had itself admitted in its December 1992 circular that Bangladesh did not have appropriate facilities to test diethylene glycol, the test results undertaken by BDL could not be used as a basis for prosecution.

Without being informed of the nature of the testing, this argument must have appeared to the High Court judges highly plausible -- and it is hardly surprising that in each case, the judges issued a rule upon the government to come and

explain why the cases should not be set aside. The order stated that 'pending' disposal of the rule, all criminal proceedings should be stayed'.

If that was not enough, DDA then did a further thing that muddied the legal waters. Against each defendant Abul Khair filed an additional more serious case under the Special Powers Act (SPA) 1974. The problem with filing an additional case, however, is that the law in Bangladesh does not allow a person convicted or acquitted for one offence, to be subsequently prosecuted for a separate offence involving the same set of circumstances. This meant that as soon as either of the two cases had resulted in an acquittal or conviction, the other case would have to be scrapped.

BCI BANGLADESH, POLYCHEM LABORATORIES

All of the drug court cases were stayed in mid 1994; it was now the job of the Attorney General's Office and DDA to argue that the stays should be vacated. Since those proceedings were taking place in the context of deaths of thousands of children, one would have expected the Attorney General's Office and DDA to make strenuous attempts to schedule a date for a High Court hearing to prove that tests for diethylene glycol could be done -- and were in fact done -- successfully in Bangladesh.

However, nothing like that happened. Over a fifteen year period no action was taken to get the cases restarted. Till today, the High Court orders, which stayed the criminal proceedings against nine defendants, remain in place, unchallenged.

We asked Abdul Khair, the DDA complainant in both those cases, to explain his total lack of activity over a 15 year period. He said, "I did not know that the cases were stayed until you told me about it. I never heard any information like this. No notice ever came to me." He did not accept any responsibility for his lack of action saying during that period of time he kept being transferred to different parts of the country.

ADFLAME

The case against the six defendants from Adflame Pharmaceutical has always been the strongest. Its syrup had been used at both Shishu hospital and the Bangabhaban clinic where hundreds of children had died. Moreover Flammodol had tested positive for diethylene glycol not only in the government tests but in two separate tests in two different US laboratories organised by Dr Hanif -- one in early 1991 and again in late 1992.

In March 2007, the ruling that had stayed the criminal proceedings came up for final hearing at the High Court. No lawyer for the defendants was present. Justices Sharif Uddin Chaklader, and Sheikh Abdul Awal ruled, "The offence disclosed is a very heinous offence as it relates to the life of infants who were

treated at different hospitals. It is a crime against society as such the trial should be held to find out whether the allegations are true or not. We find no substance in this rule." The criminal proceedings could now restart - 13 years after being stayed.

On October 5, 2007 the High Court sent the court orders and relevant papers back to the Dhaka Drug Court. They were received by Abdul Haque , a court clerk. He however did not inform anyone in the court, and placed the papers among the pile of 'disposed' files. Neither the judge nor the public prosecutor knew that criminal proceedings could now start again. DDA by then had long forgotten about the cases.

The drug court only came to know about the 2007 High Court order three weeks ago when The Daily star told the public prosecutor about it. Immediately the judge asked to see the cases papers, but for four days the papers could not be found.

"It was a mistake," Abdul Haque told The Daily Star. Another court clerk was less generous. He said, "It cannot be a mistake. There must be something else involved. There is no other way that the papers could otherwise be found among the disposed off files."

The judge has now fixed today for restarting the trial. The current status of the Special Powers Act case against Adflame directors is not known.

REX PHARMACEUTICAL

The case against the two owners of Rex pharmaceutical in the Mymensingh Drug Court is the only one that resulted in a trial.

In June 1998-- with the drug court case stayed by the High Court-- the two defendants obtained a discharge order from the additional sessions judge in relation to the charge under SPA 1974. The court ruled since the defendants were already being prosecuted under the Drug Ordinance, they could not be the prosecuted under SPA.

However, it appears that the prosecutor did not inform the judge that he could only discharge the case, if the defendants had already been acquitted or convicted for an offence-- and the drugs offence case there was far from making it to trial, let alone acquittal or conviction. the government failed to appeal against the discharge order.

The drug court case however still remained. In August 2002 - after eight years of inaction-- the High Court vacated the stay order. Justices Hassan Ameen and Tariq-ul-Hakim ruled, "The question as to whether the case in question had been filed on the basis of chemical examination by analysts from the Central Drug Laboratory is a matter to be decided at the time of final hearing of the case...." It is not known why the High Court dealt with this case so much more quickly than

the other three cases that had been stayed.

The case papers were then sent back to the Mymensingh Drug court and the criminal trial restarted against the two defendants. After hearing the evidence, Judge Shahiduzzaman acquitted the two men. "It is found the chemical examination of the seized paracetamol syrup was not properly done, "the court rule the judgment also stated," The accrued person have already faced a trial before a competent court over the self- same occurrence and now they are facing the trial again."

The Daily Star however uncovered serious flaws in the evidence given at the trial. There was no evidence given at the trial about the role of WHO in supervising the quality of the tests; the report produced by WHO consultant SK Roy, which The Daily Star has seen, was not even shown to the court. The judge suggested that since the tests results had not mentioned that the test had been done at EDCL, questions were raised about the result; yet the prosecutor did not inform the judge that it was no requirement for the test result document itself to state where the tests had taken place. The key question was whether the test had been done by analysts from the government's drug testing laboratory on suitable equipment. And about this, there is no doubt-- but this was not made clear to the judge.

The prosecutor also did not inform the court that the Drug Act 1940 did not allow the government laboratory report to be questioned, since it states that a test result signed by a government analyst should be considered `conclusive'. The only exception to this would be if the defendant had written to DDA questioning the test itself, within 28 days of receiving the results—something that had not happened in this case.

In addition, the prosecutor again failed to inform the drug court judge about what the law says about a 'second trial' in connection with an already adjudicated occurrence. The judge stated that the two defendants were now facing a second trial relating to the self-same occurrence-- suggesting that this was an additional reason to acquit the defendants. However, the judge was not informed that the Criminal Procedure Code states that 'discharge of the accused'-- which is what happened to the defendants in relation to the case under SPA-- did not constitute 'acquittal'. The case before the drug court was therefore not a 'second trial'.

CITY CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL

City Chemical and Pharmaceutical was one of the five Companies whose Paracetamol syrup, Paracit, was found to have diethylene glycol. The syrup not only tested positive in the analysis done in Bangladesh, but also in those independently done in the US. The test results, under-taken at the State Laboratory Institute in Massachusetts stated `Batch 14' of paracit, manufactured in 19-91 test positive for diethy love glycol.

When we asked Abul Khair why he did not prosecute City Chemical in 1992, he repeatedly denied that the company was connected to paracetamol adulteration. He claimed that all the companies that were found positive for adulteration were prosecuted. “None were spared,” he said.

The families of those who died feel totally let down by the government. On being told by The Daily Star how the justice system dealt with the companies, Rakhal Chandra Barua, the father of seven-year old Bablu who had died 19 years ago said, “I am amazed how such types of cases remain unattended for such a long time. What else can I do except shedding tears as I am just a poor employee at Bangabhaban.”

Peyara Begum, the mother of a year and a half old Tanvir, said, “This is the state of justice in our country. We want punishment for those involved in the incident. We want them hanged or jailed.”

খুলনায় অবৈধ পাঠ্য বইয়ের কারবার

প্রতিবেদন
খুলনায় অবৈধ পাঠ্য বইয়ের কারবার

প্রতিবেদক
মুহাম্মদ নূরুজ্জামান

প্রকাশের তারিখ
১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে
২৮ ডিসেম্বর ২০০৯

সংবাদপত্র
দৈনিক অনির্বান, খুলনা

বর্তমান কর্মস্থল
প্রকাশক, খুলনার চিঠি ও
সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রবাহ

নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে বই'র দোকানগুলোতে নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ অননুমোদিত সহায়ক পুস্তকের মজুদ

আসন্ন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে খুলনার বিভিন্ন বই'র দোকানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্য পুস্তকের মজুদ গড়ে তোলা হয়েছে। এ সকল বই নগরী ও জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গছিয়ে দিতে প্রকাশক ও শিক্ষকদের মধ্যে জোর তৎপরতা চলছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৮০ সালে সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল নোট-গাইড সহ অননুমোদিত সহায়ক বই নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাশ করে। কিন্তু এ আইনের সঠিক কোন প্রয়োগ না থাকায় এক শ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ নিম্নমানের অননুমোদিত সহায়ক পুস্তক (বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা, ইংরেজি গ্রামার, বাংলা দ্রুত পঠন, ইংরেজি র‌্যাপিড রিডার) প্রকাশ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গছিয়ে দিয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এর সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক সমিতির দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তারাও জড়িত থেকে নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত রয়েছে।

এদিকে ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত এক পত্রে নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ অননুমোদিত সহায়ক পুস্তক পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তি না করা এবং বাজারজাত বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়।এ নির্দেশ বাস্তবায়ন শুরু হলে টনক নড়ে অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ীদের। তারা বেকায়দায় পড়ে যায়। শুরু হয় বিকল্প পথ খোঁজার পালা। যার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো: আবু তাহের সরকারের নির্দেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রীট পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু আদালত আবেদনটি খারিজ করে দেন। এ প্রেক্ষিতে আবারও সমিতির পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা হলে প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত ৩ সদস্যের বেঞ্চ তা খারিজ করে আইনটি বহাল রাখেন।

সূত্র জানায়, আইনটি বহাল থাকায় ঢাকার অনুপম গাইড, জুপিটর গাইড, ইন্টারনেট , বর্নমালা, লেকচার, গ্যালাক্সি, হাসান বুক ডিপোর জননীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ বইগুলো খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা সহ মফস্বল এলাকার দোকানে পাঠিয়ে দেয়। গত এক সপ্তাহ পূর্বে খুলনার আজিজিয়া ও নূর লাইব্রেরী, পাঠকপ্রিয় লাইব্রেরী, আলফা বুক হাউজ, হাসান বুক ডিপো, হেলাতলার সালেহিয়া লাইব্রেরী, বই বিচিত্রাসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ এসব বই'র মজুদ গড়ে তুলেছে। বইগুলো নগরীর ক্লে রোড, আজিজিয়া লাইব্রেরী, ৪৭নং কেডি ঘোষ রোডের মোল্লা ম্যানশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা, হেরাজ মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, ৮৬ নং কেডি ঘোষ রোডের বই দোকানগুলোর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা এবং ওই ভবনের সামনে অবস্থিত সমবায় ব্যাংক ভবনের দ্বিতীয় তলায় গোডাউন ভাড়া নিয়ে প্যাকেটজাত করে রাখা হয়েছে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সময় এবং সুযোগমত এসব নিষিদ্ধ বই মফস্বল এলাকার দোকানগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রায় অর্ধ কোটি টাকার নিষিদ্ধ বই এসব গোডাউনে মজুদ আছে বলে স্থানীয় সূত্র দাবি করেছে।

সূত্র মতে, বিক্রেতারা প্রশাসনের ঝামেলা এড়াতে নিষিদ্ধ বইগুলো দোকানের কাউন্টারে রাখছেন না। নতুন শিক্ষাবর্ষের বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর পর পরই এগুলো প্রকাশ্যে বিক্রি শুরু হবে। এরই অংশ হিসেবে নিষিদ্ধ বই'র স্যাম্পল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো এমনকি পোস্টার ছাপিয়ে প্রচারণা চলছে বেশ জোরেশোরে। নিষিদ্ধ নোট-গাইড অননুমোদিত, সহায়ক পুস্তক পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভুক্তির জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে দেনদরবার করা হচ্ছে। নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন কোন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করতে অসাধু ব্যবসায়ীরা ইতোমধ্যে ঘরোয়া বৈঠকও করেছেন বলে সূত্রের দাবি।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং আজিজিয়া নূর লাইব্রেরীর মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, খুলনায় নিষিদ্ধ পুস্তকের মজুদ হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই।

সংবাদ প্রকাশের পর রাতের আঁধারে মজুদকৃত নোট-গাইড বই সরিয়ে ফেলা হয়েছে

'নতুন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে খুলনা মহানগরীর বই'র দোকানগুলোতে 'নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ অননুমোদিত সহায়ক পুস্তকের মজুদ' শিরোনামে গতকাল দৈনিক অনির্বাণে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়েছে অসাধু বই ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের ঝামেলা এড়াতে তারা ভিন্ন পথ খুঁজছেন। পাশাপাশি তারা মজুদকৃত অবৈধ বই রাতের আঁধারে সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছেন।

অবৈধ বই বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানান, নগরীর আজিজিয়া ও নূর লাইব্রেরী, পাঠকপ্রিয় লাইব্রেরী, আলফা বুক হাউজ, হাসান বুক ডিপো, হেলাতলার সালেহিয়া লাইব্রেরী, বই বিচিত্রাসহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ এসব বই'র মজুদ গড়ে তোলে ব্যবসায়ীরা। বইগুলো নগরীর ক্লে রোডস্থ আজিজিয়া লাইব্রেরী, ৪ নং কেডি ঘোষ রোডের মোল্লা ম্যানশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা, ৪৭ নং কেডি ঘোষ রোডের তৃতীয় তলা, হোটেল গুলশানের দ্বিতীয় তলা, হেরাজ মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, ৮৬ নং কেডি ঘোষ রোডের বই দোকানগুলোর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা এবং ওই ভবনের সামনে অবস্থিত সমবায় ব্যাংক ভবনের দ্বিতীয় তলায় গোডাউন ভাড়া নিয়ে প্যাকেটজাত করে রাখা হয়।

এদিকে, ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এ খবর পত্রিকায় প্রকাশ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রশাসনের ঝামেলা এড়াতে তারা ঠেলাগাড়ী, ট্রাক ও ভ্যানসহ বিভিন্ন বাহনে করে এসব বই সরিয়ে নিতে শুরু করে। অবৈধ বইগুলো নিয়ে দৌলতপুর ও খালিশপুর, নিজ মালিকানার অন্য দোকান এবং বাড়িসহ নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, নগরীর পাঠকপ্রিয় লাইব্রেরীর মালিক মোখলেসুর রহমানের বাড়ি খালিশপুরের চিত্রালী বাজার এলাকায়। তিনি বাড়ি ঘেষে একটি বইয়ের দোকান করেছেন। যার নাম দিয়েছেন 'বাংলাদেশ বই ঘর'। কেডি ঘোষ রোডস্থ হোটেল গুলশানের দ্বিতীয় তলার গোডাউন থেকে সরিয়ে, বইগুলো এ দোকানে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বই বিচিত্রা'র মালিক সুলতান আহমেদ বসবাস করেন দৌলতপুরের আড়ংঘাটা এলাকায়। তিনি দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শামীম হোটেলের পাশে একই নামে আরও একটি দোকান করেছেন। বর্তমানে তার পুত্র রবিউল ইসলাম দোকান দু'টি পরিচালনা করছেন খুলনার গোডাউন থেকে তাদের বইও সরিয়ে সেখানে নেয়া হয়েছে বলে সূত্র দাবি করেছে। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বই সরানোর কাজ চলেছে গতকাল।

এদিকে, অবৈধ বই মজুদের সুনির্দিষ্ট তথ্য সাংবাদিকের হাতে কিভাবে গেল-তা নিয়ে রীতিমত ভাবনায় পড়েছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। তারা বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে খোঁজ খবরও নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

নোট-গাইডসহ অননুমোদিত সহায়ক বই নিষিদ্ধ হলেও স্টিকার-লিফলেট ছেপে প্রচারণা চলছে জোরেসোরে

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্যপুস্তক নিষিদ্ধ হলেও স্টিকার-লিফলেট ছেপে প্রচারণা চলছে জোরেসোরে। নগরী থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে সাটা নানা রংয়ের এসব প্রচারপত্র নজর কাড়ছে সবার। এ ক্ষেত্রে অসাধু বই ব্যবসায়ীরা আইন-আদালতের ওপর সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, যা আইনের ভাষায় আদালত অবমাননার শামীল। এতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উভয় সংকটে পড়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আদালত নোট-গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্যপুস্তক নিষিদ্ধ করেছে আইনের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ অবৈধ বইগুলোর প্রচার-প্রচারণা বন্ধ হয়নি।

বরং অসাধু ব্যবসায়িরা পোস্টার স্টিকার লিফলেটসহ নানা প্রচারপত্র ছেপে জোরেসোরে প্রচারণা চালাচ্ছে। নগরী ও জেলার স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার, দর্শনীয় স্থানসহ বিভিন্ন জায়গায় সেঁটে দিয়েছে। পত্রিকায়ও ছাপা হচ্ছে এর বিজ্ঞাপন, যা দেখে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। সরেজমিনে বিভিন্ন স্থানে সাঁটা ইন্টারনেট সিরিজের স্টিকারের বক্তব্য তুলে ধরা হলো-মাদার্স পাবলিকেন্স'র সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে নো টেনশন, আছে ইন্টারনেট গাইড। ভালো ফলাফলের জন্য সকল শ্রেণীর ইন্টারনেট গাইড পড়ুন। একইভাবে হাসান বুক ডিপোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান জননী পাবলিকেশন্সের স্টিকারে লেখা রয়েছে 'তোমরাই আগামীর ভবিষৎ, জননী সিরিজের বই পড়, মেধাবী হয়ে জীবন গড়'। তাদের স্টিকারে এ ধরণের ৪টি বই'র ছবিও শোভা পাচ্ছে। এর বাইরে গ্যালাক্সি, জুপিটরসহ বিভিন্ন গাইড ও নোট বই'র বিজ্ঞাপনও জাতীয় এবং স্থানীয় পত্রিকায় দেয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন, খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অচিন্ত কুমার দাস বলেন, যেহেতু আদালত নোট-গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক বই নিষিদ্ধ করেছে, সেহেতু এর উৎপাদন, বাজারজাত ও বিক্রি কার্যক্রম বন্ধ। সুতরাং পোস্টার, স্টিকার-লিফলেট ছেপে প্রচারণা চালানোর কোন সুযোগ নেই। আইন লঙ্ঘন করা আদালত অবমাননার শামিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন এ ব্যাপারে বলেন, সরকার নিষিদ্ধ করার পরও যারা এ ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য আগামী দু'এক দিনের মধ্যে মিটিং ডেকে সদস্যদের জানিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল নোট-গাইডসহ অননুমোদিত সহায়ক বই নিষিদ্ধ করে সরকার একটি আইন পাশ করে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে বই না আসলেও খুলনার বাজারে নকল বই'র ছড়াছড়ি

আসন্ন শিক্ষাবর্ষের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে এখনও কোন শ্রেণীর বই বিক্রির অনুমতি না দেয়া হলেও খুলনার বাজারে নকল বই'র ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বোর্ডের বই 'হুবহু নকল' করে বাজারে ছেড়েছে। বইগুলো খুলনা মহানগরী ও উপজেলার বিভিন্ন দোকানে উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহ থেকে এসব বই খুলনায় আসতে শুরু করে। এদিকে, অনুমোদনহীন প্রতারক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের এ ধরনের অপকর্মের ফলে প্রকৃত ব্যবসায়িরা বিপাকে পড়বেন বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন। অন্যদিকে, সরকারও মোটা অংকের রাজস্ব হারাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'র একটি সূত্র জানান, সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করবে। এর বাইরেও ওই সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই'র প্রয়োজন হলে বাজার থেকে (বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে) তা ক্রয় করতে পারবে। এজন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি'র) পক্ষ থেকে প্রাইভেট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে শর্তানুযায়ী অনুমতি দেয়া হয়।যে কারণে শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানই এসব বই প্রকাশ ও বাজারজাত করার বৈধতা অর্জন করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোন প্রতিষ্ঠানকে বিক্রিযোগ্য বই ছাপার অনুমোদন দেয়নি। এরপরও বাজারে এসব বই'র ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা গেছে। সরকারকে মোটা অংকের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ঢাকার কয়েকজন অসাধু প্রকাশক এ ধরনের বই প্রকাশ করে বাজারে ছেড়েছেন। যা ইতোমধ্যে রাজধানী ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন শহর, নগর ও গ্রাম-গঞ্জের মফস্বল এলাকায় পৌঁছে গেছে। সরেজমিনে গত কয়েকদিন নগরীর কেডি ঘোষ রোডস্থ বই মার্কেটসহ বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখা যায়, ২০১০ শিক্ষাবর্ষের একাধিক বই প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি ও অংক; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা; ৬ষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণীর বোর্ড প্রকাশিত বই পাওয়া যাচ্ছে। নিউজপ্রিন্ট ও নিম্নমানের সাদা কাগজে ২০০৮-০৯ সালে মুদ্রিত বোর্ড বই'র নকল বই শুধুমাত্র কভার সহ আংশিক পরিবর্তন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। নকল বইগুলো বোর্ড নির্ধারিত মূল্যের চেয়েও অতিরিক্ত মূল্য মুদ্রিত করে বিক্রি হচ্ছে।

নগরীর বুক সেন্টার থেকে ক্রয়কৃত তৃতীয় শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই' এ পুনর্মুদ্রণ ২০০৯ সালের আগস্ট মাস লেখা থাকলেও কভারের পেছনে '২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য' উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বইটিতে কোন প্রকাশক ও পরিবেশকের নাম-ঠিকানা উল্লেখ নেই। বইটির মূল্য ৩৪ টাকা লেখা থাকলেও প্রকৃত মুদ্রিত মূল্য হওয়ার কথা ৩১ টাকা।

কেডি ঘোষ রোডের শুভেচ্ছা বুক ডিপো থেকে ক্রয়কৃত তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইটি'র পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৯ লেখা আছে। বইটির মুদ্রনে শুধুমাত্র ইসলাম প্রেস উল্লেখ থাকলেও ঠিকানা উল্লেখ নেই। মূল্য ২৭ টাকা লেখা আছে। অথচ, বোর্ড প্রকাশিত বই'র মূল্য ২৪ টাকা বলে জানা গেছে।

একই দোকান থেকে ক্রয়কৃত তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বইটি'র পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০০৮ লেখা আছে। কিন্তু কভারের পেছনে লেখা হয়েছে ২০১০ শিক্ষাবর্ষ । মুদ্রনে ঠিকানা দেয়া হয়েছে রাহান প্রিন্টার্স, ৪/৬ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০। এভাবে বই কিনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রতারিত হলেও তা দেখার কেউ নেই। এ ব্যাপারে খুলনা জেলা প্রশাসক এন এম জিয়াউল আলম বলেন, এ ধরনের অভিযোগ তিনিও পেয়েছেন। এসব অবৈধ বই বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনির্বাণে সংবাদ প্রকাশের পর নগরীতে র‍্যাবের অভিযানে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ১৫ হাজার কপি নিষিদ্ধ বই উদ্ধার: গ্রেফতার ১: দু'টি মামলা দায়ের সমিতির সাধারণ সম্পাদকই মূল হোতা

আসন্ন শিক্ষাবর্ষকে সামনে রেখে খুলনার বিভিন্ন বই'র দোকানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্য পুস্তকের গড়ে তোলা মজুদে এবার হাত দিয়েছে র‍্যাব। উদ্ধার করা হয়েছে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ১৫ হাজারেরও বেশি কপি নিষিদ্ধ পাঠ্য বই। গতকাল বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমান আদালতের নেতৃত্বে র‍্যাব এ অভিযান চালায়। তবে খোদ বাপুস খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদকের গোডাউন থেকে 'নিষিদ্ধ বই উদ্ধার হওয়ায় তিনিই নিষিদ্ধ বই বিক্রি সিন্ডিকেটের মূল হোতা' বলে প্রশাসন ধারণা করছে। নিষিদ্ধ বই মজুদের সাথে জড়িত থাকার ঘটনায় ওয়াহিদুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে । এ ঘটনায় দু'টি লাইব্রেরীর বিরুদ্ধে পৃথক দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র‍্যাব-৬'র সূত্রে জানা গেছে, উচ্চ আদালত থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল নোট গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্যপুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও খুলনার মার্কেটে প্রকাশ্যে এ ধরনের বই বিক্রি চলছে মর্মে দৈনিক অনির্বাণে ধারাবাহিক ভাবে সংবাদ প্রকাশ হয়। যার সূত্র ধরে গতকাল খুলনা জেলা প্রশাসনের আরডিসি মোঃ জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত সদর থানা সংলগ্ন কেডি ঘোষ রোডের বই মার্কেটে অভিযান চালায়। অভিযানে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোঃ শোয়েব র‍্যাবের নেতৃত্ব দেন।

অভিযান চলাকালে ভ্রাম্যমান আদালত স্থানীয় মোলা ম্যানশনের দ্বিতীয় তলায় নূর ও আজিজিয়া লাইব্রেরীর গোডাউনে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিষিদ্ধ বই'র বিশাল মজুদ দেখতে পান। এর মধ্যে প্রজাপতি প্রকাশনীর সপ্তম শ্রেণীর একের ভিতরে সব, লেকচার প্রকাশনীর কৃষি শিক্ষা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর একের ভিতরে সব এবং নিম্ন মাধ্যমিক গণিত সমাধান বই উল্লেখযোগ্য। এখান থেকে ২৭ বস্তা (চট প্যাকেট) বই উদ্ধার করা হয়। এ লাইব্রেরী দু'টির মালিক বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন।

এদিকে, একই ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত জাহাঙ্গীর লাইব্রেরীর গোডাউন থেকেও অনুরূপ গ্যালাক্সী প্রকাশনীর হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানের ২০ বস্তা নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করা হয়। এ লাইব্রেরীর মালিক আলমগীর হোসেন।

এদিকে, ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে খবর পেয়ে কেডি ঘোষ রোডের বই মার্কেট থেকে ৩টি ভ্যানযোগে ৩০ বস্তা নিষিদ্ধ বই পাচার করে নগরীর শিরোমনিতে অবস্থিত সাইদুল ইসলামের মালিকানাধীন মোক্তার লাইব্রেরীতে নেয়া হচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে শিববাড়ি মোড়ে ভ্যান ৩টি আটক করে।

এ সময় ভ্যান চালক আফজাল হোসেন, আসলাম হোসেন ও মিজানুর রহমানকে আটক করা হয়। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

খুলনা সদর থানা পুলিশ সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে নূর লাইব্রেরির সেলসম্যান ওয়াহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় এসআই সাইদ বাদী হয়ে নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০/৩ ধারায় দু'টি মামলা দায়ের করেছেন।

ভ্রাম্যমান আদালতের নেতৃত্বদানকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিল্লুর রহমান অভিযানের ব্যাপারে বলেন, উদ্ধারকৃত বই'র সংখ্যা আনুমানিক ১৫ হাজার যার আনুমানিক মূল্য ৭ লাখ টাকা অভিযুক্তদের তাৎক্ষনিকভাবে গ্রেফতার করা না গেলেও তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের মামলা দায়ের করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনই খুলনার 'নিষিদ্ধ বই বিক্রি সিন্ডিকেটের মূল হোতা'। এর সাথে সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তার সম্পৃক্ততাও রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে এ অবৈধ ব্যবসা অব্যাহত রেখেছে বলেও সূত্রটি দাবি করেছে।

নিষিদ্ধ বই বিক্রির ভিন্ন কৌশল নিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি বাপুস সম্পাদক আমজাদ হোসেনের

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইডসহ এসসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন সহায়ক পাঠ্যপুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া উচ্চ আদালতের নির্দেশের ১৩ দিন পর ঘুম ভাঙ্গে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখার। সমিতির পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই প্রকাশ, মজুদ ও বিক্রি বন্ধ করতে সদস্যদের জরুরী নোটিশও দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন । কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। খোদ তার গোডাউন থেকেই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করে ভ্রাম্যমান আদালত। অন্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নিজেই এ অবৈধ কারবার চালিয়ে যাওয়ার সংশ্লিষ্টরা একে 'জরুরী নোটিশ' কাহিনী(!) বলে মন্তব্য করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতি এম এম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের আপিল বিভাগ বেঞ্চ 'সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কোন গাইড বা নোট বই বিক্রি করা যাবেনা' মর্মে গত ৯ ডিসেম্বর রায় দেন। রায়ে বলা হয়, এর পর থেকে কেউ সরকারের অনুমোদন ছাড়া গাইড বই বা নোট বই প্রকাশ করলে বা বিজ্ঞাপন দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।

যুগান্তকারী এ রায়ের পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট বই প্রকাশ-মজুদ ও বাজারজাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আগেই প্রকাশ করা প্রায় ৬ কোটি টাকার বই রায়ের পরপরই ব্যবসায়ীরা ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেয় । যার বড় একটি অংশ খুলনা মহানগরী এবং ৯টি উপজেলার বিভিন্ন দোকানে পৌঁছে যায়। আদালতের আদেশকে লঙ্ঘন করে খুলনার ব্যবসায়ীরা নিষিদ্ধ এ বই প্রকাশ্যে বিক্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

এদিকে, গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক অনির্বাণে 'খুলনায় অবৈধ পাঠ্য বই'র কারবার' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর জেলা প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে। গত ২২ ডিসেম্বর এনডিসি আলীমুর রাজিবের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই দিনই (২২ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখা নিষিদ্ধ নোট-গাইড বই প্রকাশ, মজুদ ও বিক্রি বন্ধ করতে সদস্যদের জরুরী নোটিশ দিতে বাধ্য হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন স্বাক্ষরিত নোটিশের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো - 'এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট বাপুস, খুলনা জেলা শাখার সম্মানিত সকল সদস্যের সদয় অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল নোট, গাইড বই প্রকাশ, বিতরণ ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখিত শ্রেণীর নোট, গাইড বই প্রকাশ, মজুদ, বিতরণ ও ক্রয়-বিক্রয় দন্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং সমিতির পক্ষ থেকে উল্লেখিত শ্রেণীর নোট, গাইড বই প্রকাশ মজুদ বিতরণ ও ক্রয়-বিক্রয় না করার জন্য

বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, এরপরও যদি সমিতির কোন সদস্য নিষিদ্ধ নোট, গাইড বই প্রকাশ, মজুদ, বিতরণ ও ক্রয়-বিক্রয় করার দায়ে সরকারি প্রশাসন কর্তৃক অভিযুক্ত হন বা অপরাধমূলক আচরণ করে শাস্তিযোগ্য হন, তবে সমিতি কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।' সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে, বৃহস্পতিবার র‌্যাব ও ভ্রাম্যমান আদালত খুলনার বই মার্কেটে অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি খুলনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন'র মালিকানাধীন মোল্লা ম্যানশনের দ্বিতীয় তলায়, নূর ও আজিজিয়া লাইব্রেরীর গোডাউন থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে মজুদ থাকা বিপুল পরিমাণ বই আটক করে। একই সময় সমিতির সহ-সভাপতি ও জাহাঙ্গীর লাইব্রেরীর মালিক আলমগীর হোসেন'র গোডাউন থেকেও অনুরূপ গ্যালাক্সি প্রকাশনীর হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান বই'র ২০ বস্তা নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করা হয়। যে কারণে নিষিদ্ধ বই বিক্রি বন্ধে দেয়া সমিতির নোটিশকে অন্য বই বিক্রেতারা ভিন্ন কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

বাপুস'র সভাপতি সম্পাদক ও ট্রেজারারসহ ১০ কর্মকর্তাই নিষিদ্ধ বই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে

বাংলাদেশ পুস্তক পরিবেশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস) জেলা শাখার সভাপতি আবুল কাশেম সরকার, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও ট্রেজারার ঈসা রুহুল্লাহসহ ১০ কর্মকর্তাই খুলনায় নিষিদ্ধ বই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে। দফায় দফায় এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে নিষিদ্ধ বই উদ্ধার হওয়ায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে, মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে নগরীতে আবারও নিষিদ্ধ নোট গাইড ও নিম্নমানের আনুমানিক ৫০ লাখ টাকা মূল্যের বই উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ভ্রাম্যমান আদালতের নেতৃত্বাধীন র‌্যাব ডাক বাংলা ও নিউ মার্কেট এলাকার দু'টি ট্রান্সপোর্টে অভিযান চালিয়ে এই বই উদ্ধার করে। এদিকে অভিযান আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা গতকাল বই দোকানগুলো বন্ধ করে রাখে।

র‌্যাব-৬'র একটি সূত্র জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিল্লুর রহমানের ভ্রাম্যমান আদালত নগরীর ডাক বাংলা বেবী স্ট্যান্ড সংলগ্ন অগ্রণী ট্রান্সপোর্ট ও নিউ মার্কেট সংলগ্ন সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে অভিযান চালায়। এ সময় অগ্রণী ট্রান্সপোর্ট থেকে বাপুস খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনের প্রতিষ্ঠান নূর লাইব্রেরীর, ট্রেজারার ইসা রুহুল্লার মালিকানাধীন সালেহিয়া লাইব্রেরী, যুগ্ম সম্পাদক মোখলেসুর রহমানের মালিকানাধীন পাঠকপ্রিয় লাইব্রেরীর নামে আসা অনুপম, টেলিগ্রাম ও আল-ফালাহ সিরিজের ১৭০ বস্তা নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করে।

অপরদিকে, র‌্যাব সদস্যরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের নিউ মার্কেট শাখায় অভিযান চালায়। এখান থেকে মাদানী, পেঙ্গুইন, লেকচার, কালাম প্রকাশনী, ওয়েস্টার্ণ, নবপুঁথি ঘর, মুজাহিদ প্রকাশনী, বর্ণমালা, পাঞ্জেরী, এডভান্স, আল-ফালাহ, প্যারাডাইস সিরিজের ১০০ বস্তা নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করে। বইগুলো বাগেরহাটের আদর্শ, ঘোষ ব্রাদার্স ও আবু হেনা মোস্তফা বইঘর, খুলনার শিরোনামনির মুক্তা লাইব্রেরী, কেডি ঘোষ রোডের পাঠকপ্রিয়, আজিজিয়া , জাহাঙ্গীর, জননী বুক ডিপো, প্রীতি, মাদ্রাসা, আলফা বুক হাউজ, সোহেল বুক ডিপো ও দৌলতপুরের ইসলামিয়া লাইব্রেরীর নামে বুকিং করা হয়েছিল। উদ্ধারকৃত বই'র মূল্য আনুমানিক ৫০ লাখ টাকা হতে পারে বলে র‌্যাবের সূত্র জানিয়েছেন।

বই উদ্ধারের পাশাপাশি আজিজিয়া লাইব্রেরীকে ৩৫ হাজার টাকা, নূর লাইব্রেরীকে ২৫ হাজার টাকা সোহেল বুক ডিপো লাইব্রেরীকে ১০ হাজার টাকা, জননী ডিপো লাইব্রেরীকে ১০ হাজার টাকা, জাহাঙ্গীর লাইব্রেরীকে ৫ হাজার টাকা, ঘোষ লাইব্রেরীরকে ১০ হাজার টাকা, মোল্লা লাইব্রেরীকে ২৫ হাজার টাকা আদর্শ লাইব্রেরীকে ১০ হাজার টাকা এবং ফেমাস লাইব্রেরীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসব জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভ্রাম্যমান আদালত থেকে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে । ভ্রাম্যমান আদালতের নেতৃত্বদানকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিল্লুর রহমান জানান, উদ্ধারকৃত বই নদীতে ফেলে নষ্ট করা হয়েছে।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ পুস্তক পরিবেশক ও বিক্রেতা সমিতি (বাপুস) জেলা শাখার সভাপতি আবুল কাশেম সরকার, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও ট্রেজারার ঈসা রুহুল্লাহসহ ১০ কর্মকর্তাই খুলনায় নিষিদ্ধ বই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে। নগরীর কেডি ঘোষ রোডে সভাপতি আবুল কাশেম সরকারের হাসান বুক ডিপো নামক একটি দোকান রয়েছে । তিনি এ দোকানের আড়ালে জননী ও লেকচার সিরিজের নিষিদ্ধ বই প্রকাশ করে দেদারছে ব্যবসা করে আসছেন । তিনি খুলনাঞ্চলের কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতেও সরবরাহ করেন বলে জানা গেছে। সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনই খুলনার 'নিষিদ্ধ বই বিক্রি সিন্ডিকেটের মূল হোতা'। তিনি আজিজিয়া ও নূর লাইব্রেরী মালিক। দু'টি দোকান এবং সমিতির প্রভাবশালী পদে থেকে তিনি বহাল তাবিয়তে এ অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ট্রেজারার ইসা রুহুল্লাহ তার মালিকানাধীন সালেহিয়া লাইব্রেরীর আড়ালে নিজেই প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বই প্রকাশ করে বাজারজাত করছেন। ঈসার ভাই সুফিয়া লাইব্রেরীর মালিক মাওলানা ইয়াহিয়া মাদ্রাসা শিক্ষক হওয়ার সুবাদে এ অঞ্চলের মাদ্রাসাগুলোর অবৈধ সকল বই তিনিই সরবরাহ করেন। যুগ্ম সম্পাদক মোখলেসুর রহমান তার মালিকানাধীন পাঠকপ্রিয় লাইব্রেরীর ব্যানারে জুপিটর ও লেকচার পাবলিকেশন্সের নিষিদ্ধ নোট-গাইডসহ অননুমোদিত বই'র ব্যবসা করছেন। খালিশপুরে বাংলাদেশ বই ঘর নামে তার আরও একটি দোকান রয়েছে। অপর যুগ্ম সম্পাদক রবিউল ইসলাম প্রীতি প্রকাশনী ও দৌলতপুরে বই বিচিত্রা নামে আর ও একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন । তার ছোট ভাই ও পিতা সুলতান আহমেদ এ ব্যবসার অংশীদার। সমিতির সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন জাহাঙ্গীর লাইব্রেরীর মালিক। তিনি গ্যালাক্সি পাবলিকেশন্স'র এজেন্ট। তার গোডাউন থেকে উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ বই ছোট চালানের একটি অংশ বলে সূত্র জানিয়েছে। অপর যুগ্ম সম্পাদক বোরহান উদ্দিন লাভলু বুক সেন্টারের মালিক। তিনি ঝলক ও গ্লোরীসহ বিভিন্ন প্রকাশনীর নিষিদ্ধ বইও বিক্রি করেন। সমিতির সদস্য রতন ভৌমিক আলফা বুক হাউজের মালিক। তিনি ইন্টারনেট ও টেলিগ্রাফ সিরিজের অবৈধ বই বিক্রি করেন।

অপরদিকে, খুলনার পাইকগাছার কপিলমুনি এলাকায় সমিতির সদস্য যুগল কিশোরদে সারদা লাইব্রেরী এবং ঢাকায় কপোতাক্ষ ও রাসেল প্রকাশনী নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি কপোতাক্ষ সিরিজের বিভিন্ন নোট-গাইড প্রকাশ করে অবৈধ বই'র রমরমা ব্যবসা অব্যাহত রেখেছেন। এ ব্যবসার সাথে সমিতির আরও কয়েকজন সদস্যের সম্পৃক্ততাও রয়েছে। তার দীর্ঘদিন ধরে এ অবৈধ ব্যবসা অব্যাহত রেখেছে বলে সূত্রটির দাবি।

নিষিদ্ধ বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে ত্রিমুখি সিন্ডিকেটের মধ্যে ঘুষ বাণিজ্য শুরু

সরকার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল নোট, গাইডসহ সহায়ক নিম্নমানের বই প্রকাশ, বিতরণ এবং এর-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বসে নেই খুলনার ত্রিমুখি সিন্ডিকেট। থেমে নেই তাদের অবৈধ অর্থ আয়ের কৌশল। এ সিন্ডিকেট বিভিন্ন স্কুলে নিম্নমানের নিষিদ্ধ বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যেই খুলনা মহানগরী ও জেলার বিভিন্ন স্থানে এ সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে টাকার অংক নিয়ে শুরু হয়েছে দরকষাকষি। ফলে নোট, গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন বই নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অকার্যকর হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, ব্যবসায়ীরা তাদের হেফাজতে বই'র আরও মজুদ আছে বলে স্বীকার করে নিষিদ্ধ নোট-গাইড সরিয়ে নিতে ১৫ দিন সময় চেয়েছেন। এজন্য তারা জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন । তবে স্থানীয় প্রকাশকদের অবৈধ ভাবে প্রকাশিত বই'র ব্যাপারে তারা নিরব ভূমিকা পালন করছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বিভিন্ন স্কুলে নিষিদ্ধ বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার জন্য শিক্ষক সমিতি, বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সমন্বয়ে ত্রিমুখি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। শিক্ষক সমিতি এবং বই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রভাব বিস্তার করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ম্যানেজ করে তাদের প্রকাশিত নিষিদ্ধ ও নিম্নমানের বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করছে। এতে একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সমিতির নেতারা মোটা অংকের ডোনেশন (ঘুষ) পাচ্ছেন, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও নিম্নমানের অতিরিক্ত মূল্যের বই শিক্ষার্থীদের গছিয়ে দিয়ে লাখ লাখ টাকার অবৈধ বাণিজ্য করছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, খুলনা ভিত্তিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আজিজিয়া ও নূর লাইব্রেরী, হাসান বুক ডিপো ও জননী লাইবেরী, কপিলমুনির সারদা লাইব্রেরীও তাদের। সহযোগি প্রতিষ্ঠান ঢাকার রাসেল পাবলিকেশন্স ও কপোতাক্ষ প্রকাশনী, নব পুঁথিঘর, বর্ণমালা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, জাকের প্রকোশনী এবং বাংলাদেশ বুক সেন্টারসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরের মত এবারও তাদের নিষিদ্ধ ও নিম্নমানের নোট-গাইড, বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ইংরেজি গ্রামার, দ্রুত গঠন, ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার, সাধারণ জ্ঞান ও ওয়ার্ড বুকসহ সহায়ক বই স্কুলে তালিকাভুক্ত করতে এলাকা ভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগ করেছে। মূলত এজেন্টরাই সমিতির নেতাদের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সাথে মোটা অংকের চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। ইতোমধ্যে তারা বিভিন্ন স্কুলে বই'র স্যাম্পলও (সৌজন্য কপি) পাঠিয়েছে। এদিকে, খুলনা মহানগরীর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচ আর এইচ প্রিন্স আগাখান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা প্রি-ক্যাডেট স্কুলসহ নগরীর বেশ কয়েকটি স্কুল নিষিদ্ধ বই তালিকাভুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য স্কুলও এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য স্কুলও এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পথে বলেও সূত্রের দাবি।

অপরদিকে কপিলমুনির সারদা লাইব্রেরী, খুলনার পাইকগাছা ও কয়লা উপজেলা, আজিজিয়া লাইব্রেরী এবং হাসান বুক ডিপো রূপসা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চলছে অন্য উপজেলাগুলোতেও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার শেষ প্রক্রিয়া। এজন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে রীতিমত দর কষাকষিও শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় নোট, গাইডসহ এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন বই নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অকার্যকর হওয়ার এনসিটিবি'র অনুমোদিত সকল বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও খুলনাঞ্চলের কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে জননী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে পাঠ্য তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে । ডুমুরিয়া উপাজেলার প্রতিভা কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ৮টি, তৃতীয় শ্রেণীর ৮টি, ৪র্থ শ্রেণীর ৮টি এবং সাউথ ডুমুরিয়া (এবিসি) কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীর ৮টি বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার সবগুলোই নিষিদ্ধ ও নিম্নমানের। একই তালিকায় জননী সিরিজের পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা গাইড, জননী বলপেন ও জননী খাতার প্রচারও করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা মহানগরীর বাগমারাস্থ সোনামনি কিন্ডার গার্টেনসহ আরও কয়েকটি স্কুলে এসব বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। স্কুলগুলোর অধ্যক্ষ'র বরাত দিয়ে এ তালিকা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এদিকে, দৈনিক অর্নির্বানে অবৈধ বই নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা তাদের হেফাজতে অবৈধ বই'র আরও মজুদ আছে বলে স্বীকার করেছেন। নিষিদ্ধ এসব নোট-গাইড বই সরিয়ে নিতে সময় চেয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর বাপুস খুলনা জেলা শাখার সভাপতি আবুল কাশেম সরকার জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশাসনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহনের চলমান অভিযান আগামী ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হোক। কারণ নিষিদ্ধ বই সরিয়ে ফেলতে সময়ের প্রয়োজন। তবে সভাপতির নিজের প্রতিষ্ঠান হাসান বুক ডিপো ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান জননী পাবলিকেশন্স, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিষ্ঠান আজিজিয়া ও নূর লাইব্রেরী এবং কোষাধ্যক্ষের প্রতিষ্ঠান সালেহিয়া লাইব্রেরী, একজন সদস্যের সারদা লাইব্রেরী ও তার সহযোগী আশংকা করছেন অনেকেই। অভিযোগ আছে, গত শিক্ষাবর্ষে নগরীর জিলা স্কুল, মডেল স্কুল, ফাতিমা উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট জোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়, ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এইচ আর এইচ প্রিন্স আগাখান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেন্ট জেভিয়ার্স মাধ্যমিক বিদ্যালয় রেভাঃপলস উচ্চ বিদ্যালয়, সোনাডাঙ্গা প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং রোটারী স্কুলসহ অধিকাংশ বেসরকারি স্কুল নিম্নমানের গ্রামার ব্যাকরণ ও রচনাসহ অননুমোদিত বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে। আর এ সকল বই শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করতেও বাধ্য করা হয়।

অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকার প্রতিষ্ঠান ঢাকার কপোতাক্ষ ও রাসুল প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সমিতির অন্যান্য কর্মকর্তার পরিবেশিত এনসিটিবি'র অনুমোদনবিহীন কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও মাদ্রসার বই'র ব্যাপারে তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ বই'র ব্যাপারে তাদের অবৈধ অর্থ বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে খুলনার জেলা প্রশাসক এন এম জিয়াউল আলম বলেন, উচ্চ আদালত যেখানে এসব বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেখানে সময় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং অভিযান অব্যাহত থাকবে। এছাড়া নিষিদ্ধ বই তালিকাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের হালচাল

প্রতিবেদন
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের হালচাল

প্রতিবেদক
এ এইচ এম আহসান উল্লাহ

প্রকাশের তারিখ
১১ জুলাই ২০১০ থেকে ২২ জুলাই ২০১০

সংবাদপত্র
দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ
বার্তা সম্পাদক

অর্থ বরাদ্দের অভাবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরটি অকার্যকর হবার পথে।

বছরে মাত্র সাড়ে ৯ লাখ টাকার জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের জেনারেটরটি চালানো যাচ্ছে না। এর জ্বালানি খরচ সরকারিভাবে বরাদ্দ নেই। যে কারনে দীর্ঘ সাড়ে ৩ বছর জেনারেটরটি হাসপাতালের একটি কক্ষে পড়ে আছে। বিশাল আকারের এই জেনারেটরটি এত দীর্ঘ সময় বন্ধ অবস্থায় থাকায় এটি এখন নষ্ট হওয়ার পথে। ইতিমধ্যে জেনারেটরটির দুটি ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে। এমন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর থাকার পরও বিদ্যুৎ চলে গেলে হাসপাতালে রোগীরা যে কি নিদারুণ কষ্টে দিন কাটায় তা না দেখে অনুভব করা যাবে না।

চাঁদপুর জেলায় সর্ববৃহৎ হাসপাতাল ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল। যার শুরু ১০ শয্যা থেকে। এরপর ক্রমান্বয়ে আসতে আসতে এখন এটি ২৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। বিশাল ভবন ও আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এই হাসপাতালটিতে এখন শুধু চাঁদপুর জেলাই নয় পার্শ্ববর্তী শরীয়তপুর জেলার অনেক মানুষও এই হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়। যে কারণে হাসপাতালটিতে প্রতিনিয়ত রোগীর চাপ থাকে। ২৫০ শয্যার হলেও হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে রোগী ভর্তি থাকে ৩শ থেকে সাড়ে ৩শ। বহির্বিভাগে রোগী হয় ৮শ' থেকে ১হাজার। প্রতিদিন হাজার বারশ' মানুষের পদচারণা থাকে এই হাসপাতালে।

সরকারি এই হাসপাতালের জন্য ২০০৭ সালে উচ্চ ক্ষমতাসপন্ন একটি জেনারেটর সরকারিভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়। জেনারেটরটি চালানোসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকও নিয়োগ দেয়া হয়। হাসপাতালের অভ্যন্তরে গণপূর্ত বিভাগের একটি জরুরি সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এই দপ্তরটি হাসপাতালের বিদ্যুৎ বিভাগ দেখাশোনা করে। বিদ্যুতের কোনো সমস্যা হলে এরা সেসব সমস্যা সারিয়ে দেয়। এই দপ্তরে লোক রয়েছে ৫ জন। রুটিন ডিউটি তাদের। জেনারেটর চালানোর দায়িত্বও তাদের। এই গণপূর্ত জরুরি সেবা কেন্দ্রের দায়িত্বশীলরা বললেন, জেনারেটরটি এতই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এর দ্বারা পুরো হাসপাতাল ভবনের বিদ্যুৎ চালানো সম্ভব। এটি ডিজেল চালিত। এটি চালাতে ঘন্টায় কমপক্ষে ১৫ লিটার ডিজেল লাগে। ডিজেলের বর্তমান বাজার মূল্য প্রতি লিটার ৪৪ টাকা। এক ঘন্টা এই জেনারেটরটি চালাতে লাগে ৬শ ৬০ টাকার ডিজেল। দৈনিক গড়ে যদি ৪ ঘন্টা চালাতে হয় তাহলে লাগবে ২ হাজার ৬শ ৪০ টাকার ডিজেল। এ হিসেবে মাসে লাগবে ৭৯ হাজার ২শ' টাকার ডিজেল। বছরে এর পরিমান গিয়ে দাঁড়ায় ৯ লাখ ৫০ হাজার ৪শ টাকা। এই বরাদ্দ সরকারি ভাবে নেই। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই জ্বালানির জন্য বরাদ্দ চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার পত্র দিয়েছে। কিন্তু কোন সাড়া মেলেনি।

বর্তমানে বিদ্যুতের চরম সঙ্কট চলছে। এখন দিনে কমপক্ষে ৫/৬ ঘন্টা লোডশেডিং হয়। এই লোডশেডিংয়ের আওতায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালও পড়ে। তখন যে হাসপাতালে রোগীদের কি করুণ অবস্থা হয় তা না দেখে অনুভব করা যাবে না। এমনও অবস্থা হয়েছে যে, রোগীর অপারেশন চলছে, এমন সময় লোডশেডিং। তখন রোগী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকে। লোডশেডিংকালে হাসপাতালে স্বাভাবিক চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে গরমের মধ্যে চরম দুর্ভোগে থাকে রোগীরা। বছরে মাত্র সাড়ে ৯ লাখ টাকার জন্যে হাসপাতালের এই করুণ দশা। অথচ সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয়, দুর্নীতি ও লুটপাট হয়। জনস্বার্থে এই সামান্য টাকা বরাদ্দ হয় না। কয়েক লাখ টাকার এত দামি জেনারেটরটিও বন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, আপদকালিন অপারেশন থিয়েটারের কাজ চালানোর জন্যে মতলব হাসপাতাল থেকে তারা ছোট একটি জেনারেটর এনে জরুরি অপারেশনের কাজ কিছু দিন চালিয়েছে। এখন তারা একটি নতুন জেনারেটর কিনেছে জরুরি অপারেশনের কাজ চালানোর জন্যে। এটার দ্বারা প্যাথলজি বিভাগের কাজ চালানোর চিন্তা-ভাবনাও তাদের রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, জেনারেটর জ্বালানির জন্যে বরাদ্দ চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহু লেখালেখির পর গেল অর্থ বছরের শেষ দিকে দেড় লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে ছোট জেনারেটরটি চালনো যাবে।

হাসপাতালের এই দুর্ভোগ লাঘব করতে বড় জেনারেটরটি চালাতে এর জ্বালানির টাকা বরাদ্দ দিতে সরকারের সংশিষ্ট মহলের কাছে চাঁদপুরবাসী জোর দাবি জানিয়েছে।

প্রায় কোটি টাকার নৌ অ্যাম্বুলেন্সটি এখন নিলামে বিক্রির অপেক্ষায়
সরকারি অর্থ শ্রাদ্ধ হওয়ার এক নমুনা

'সরকারকা মাল দরিয়া মে ঢাল' এই প্রবাদ প্রবচনটি বেশ পরিচিত। সরকারি অর্থ যখন অপচয় হয় বা অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় হয় তখন এই প্রবাদ বাক্যটি চলে আসে। দেখা গেছে যে, অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ পেতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়, আবার অনেক সময় লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে সেটি অবশেষে হিমাগারে চলে যায়। আর অপ্রয়োজনীয় খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। অপচয়, অপব্যয় এবং লুটপাট হয় সরকারি অনেক অর্থ। এমনি এক অপচয়ের নমুনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রায় কোটি টাকা মূল্যের নৌ অ্যাম্বুলেন্স।

২০০৭ সালে বিগত তত্ত্বাবদায়ক সরকারের সময় সরকারি মূল্যে ৯৩ লাখ টাকার একটি নৌ অ্যাম্বুলেন্স চাঁদপুর সদর (তৎকালিন) হাসপাতালের জন্যে আনা হয়। এটি হাসপাতালের জন্যে প্রয়োজন আছে কি না বা এটি যে আনা হচ্ছে সেটির কিছুই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জানা ছিলো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এটি পুশিং সেল হিসেবে দেখছে। উপর মহলে তদবির করে সেখান থেকে বরাদ্দ পাস করে আনা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এটির প্রয়োজন আছে কি না তা জানার কোন তোয়াক্কা সংশ্লিষ্টরা করেনি। এর দ্বারা শুধু সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারই লাভবান হয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হচ্ছে নৌ অ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে, কিন্তু এটি চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যে লোকবলের প্রয়োজন তার পদ সৃষ্টি এখনো এই হাসপাতালে হয়নি। এই অ্যাম্বুলেন্সটি অকটেন চালিত। ঘন্টায় প্রায় ৬০ লিটার অকটেন ব্যয় হবে। এত ব্যয় বহুল অ্যাম্বুলেন্সটি চালানোর ব্যয়ভার কোত্থেকে যোগান দেয়া হবে তারও কেনো জবাব নেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। সরকারিভাবে তো জ্বালানির বরাদ্দ নেই- ই। তাছাড়া এটি রাখার জন্যে যে নির্দিষ্ট একটি স্থানের প্রয়োজন আছে সেটিও নেই। এই নৌ অ্যাম্বুলেন্সটি চাঁদপুরে আনার পর থেকে সিভিল সার্জন র্কাযালয়ের সামনে খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। একদিনের জন্যেও এটি ব্যবহার করা হয়নি। ধূলা-বালুর স্তর পড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে জ্বলে এটির আয়ু এখন প্রায় শেষের দিকে। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদ জানান, এটি ফেরৎ নেয়ার জন্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অনেক লেখালেখি করা হয়েছে। কিন্তু কোন সাড়া মেলেনি। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত এটি কেজি হিসেবে নিলামে বিক্রি করতে হবে- এমন প্রশ্ন এখন সচেতন মহলের কাছে। একেই বলে সরকারি অর্থ শ্রাদ্ধ হওয়ার নমুনা।

‘আমার প্রয়োজন আমিই জানি না, তদবির করে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে আসা হয়’

অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ভারে এক রকম ন্যুব্জ হয়ে আছে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল। কর্তৃপক্ষ জানেন না, অথচ তাদের জন্যে চলে আসে অনেক মূল্যবান সামগ্রী। ঠিকাদাররা সামগ্রীগুলো এনে হাসপাতালে ফেলে রেখে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর নিয়ে চলে যায়। এতটুকুই জানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রাপ্ত সামগ্রীগুলো প্রতিস্থাপন করা, ব্যবহার করা সম্পর্কে তাদের কাছে কোন ব্যাবস্থা নেই। এমন কিছু মূল্যবান সামগ্রী হাসপাতালের ভেতরে বছরের পর বছর পড়ে আছে।

হাসপাতাল ভবনের মূল গেইটের (কলাপসিবল গেইটের) ভেতরে অনেক দিন যাবৎ বড় দু'টি কার্টুন পড়ে থাকতে দেখা যায়। কার্টুন দু'টি কিসের এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদের কাছে। তিনি জানান, কার্টুন দুটি এভাবে একই স্থানে অনেক দিন যাবৎ পড়ে আছে। বিস্তারিত বলার জন্যে তিনি স্টোর কিপারকে ডাকলেন। স্টোর কিপার বললেন, আমি এখানে (হাসপাতালে) আসার আগেই এই কার্টুন দুটি হাসপাতালের ভেতরে পড়ে রয়েছে। আগের স্টোর কিপার ফারুক সাহেব থাকতেই এইগুলো এসেছে তাও প্রায় তিন বছর হবে। কার্টুন দু'টিতে রয়েছে একটি ৪০ কিলোওয়াটের জেনারেটর ও আরেকটি হচ্ছে অটোক্ল্যাভ মেশিন, যেটি দিয়ে যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক বলেন, এগুলো আমাদের এখানকার জন্যে আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সেটি না জেনেই উপরে তদবির করে এগুলো নিয়ে এসেছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার।

নামে আড়াইশ' শয্যা, কাগজপত্রে ২শ' শয্যার
তৃতীয় ও চতুর্থশ্রেণী চলছে ৫০ শয্যার জনবল দিয়ে

চাঁদপুর জেলার সর্ববৃহৎ সরকারি হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল বলা হলেও কার্যত এটি এখনো ২শ' শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর সদর হাসপাতাল। হাসপাতালের অবকাঠামো ও লোকবলসহ সবদিক দিয়ে এখনো এটি ২শ' শয্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এমনকি হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী চলছে ৫০ শয্যার জনবল দিয়ে। আড়াইশ শয্যার প্রশাসনিক অনুমোদনই এখনো মিলেনি। সরকারি চিঠিপত্র আসছে এখনো ২শ' শয্যার চাঁদপুর সদর হাসপাতাল নামে।

২০০০ সালের ২৫ নভেম্বর তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম চাঁদপুর সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ২শ' শয্যায় উন্নীত করণের ভিত্তিফলক স্থাপন করেন। এটি ছিলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাঁদপুর সফরকালে প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। এরপর শুরু হয় ২শ' শয্যার হাসপাতালের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ। নির্মাণ শেষে ২০০5 সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চাঁদপুর সফরকালে ২শ' শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর সদর হাপতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তখন থেকে এটি ২শ' শয্যার হাসপাতাল হিসেবে চলছে। হাসাপাতালের অবকাঠামো, ১ম শ্রেণীর চিকিৎসকসহ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মঞ্জুরকৃত পদ এখনো ২শ' শয্যার জনবল হিসেবে যা থাকার কথা তার অর্ধেক জনবল বর্তমানে হাসপাতালে কর্মরত আছে। তবে ১০ জন চিকিৎসককে সদ্য নিয়োগ দেয় হয়েছে। যদিও তারা এখনো কাজে যোগদান করেননি। সহসাই তারা যোগদান করবেন বলে আশাবাদী হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক।

২৫০ শয্যা হিসেবে এই হাসপাতালে মোট জনবলের সংখ্যা হবে ৩শ' ৬৫ জন। আর বর্তমানে এই হাসপাতালে মঞ্জুরকৃত পদের সংখ্যাই হচ্ছে ১শ' ৮৯টি। যা ২শ' শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ১৮৯ জনের মধ্যেও কর্মরত আছে মাত্র ৯৫ জন। শ্রেণীভিত্তিক এর সংখ্যা হচ্ছেঃ প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসক ৬৩ জনের মধ্যে কর্মরত ২২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা তথা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ৪ জনের মধ্যে সবই শূন্য পদ, তৃতীয় শ্রেণীর ৯৩ জনের মধ্যে কর্মরত ৫৬ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ২৯ জনের মধ্যে কর্মরত আছে ১৭ জন। এর বাইরে ১০ জন চিকিৎসককে সদ্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জনবল অবস্থা। ৫০ শয্যার জনবল দিয়ে চলছে এই দু'টি শ্রেণীর কাজ। ২শ' শয্যার হাসপাতালে সুইপার থাকার কথা ৩৫ জন। তার মধ্যে বর্তমানে আছে মাত্র ৫ জন।

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদ জানান ২৫০ শয্যা বলা হলেও এটি এখনো ২শ' শয্যা হিসেবেই গণ্য। সরকারি চিঠিপত্র এখনো ২শ' শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর সদর হাসপাতাল নামেই আসছে। যেমন গত ৩১/০৫/২০১০ তারিখ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি চিঠি আসে সেখানেও লেখা রয়েছে ২শ' শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর সদর হাসপাতাল। তাহলে এটি আড়াইশ শয্যা নাম হলো কিভাবে এমন প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বাবধায়ক বলেন ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে

বলা হয় এটি এখন থেকে আর ২শ' শয্যা নয়, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চাঁদপুর নামে নামকরণ হবে। তবে এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিলো ভালোই। সেটি হচ্ছে ২৫০ শয্যা করা হলে এখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা যাবে। ঘোষণার পর এক বছর পার হয়ে গেলেও এখানো এটি কার্যত ২শ' শয্যা হিসেবেই আছে। তাহলে কি ২৫০ শয্যার ঘোষণা খুশি করানোর জন্যে? হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ চাঁদপুরবাসীর দাবি হাসপাতালের অবকাঠামো ও জনবলসহ সব দিক দিয়ে এটিকে কার্যত ২৫০ শয্যার করা হোক। একই সাথে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হোক।

ডাক্তাররা প্রতিদিন গড়ে ডিউটি করেন দু'ঘন্টা ॥ দু' চারজন ব্যতিক্রম

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে ডাক্তারদের খেয়াল খুশি মতো। যার যখন সময় হয় হাসপাতালে আসেন। আবার যখন মন চায় চলে যান। আগমন প্রস্থানের যে নির্ধারিত সময়সূচী আছে তার প্রতি অনেকেরই কোনো তোয়াক্কা নেই। প্রতিদিন গড়ে তিন ঘন্টা হাসপাতালে অবস্থান করেন ডাক্তাররা। এর মধ্যেও প্রায় এক ঘন্টা সময় দেন বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাক্ষাৎ দেয়া, খোশগল্প ও বিভিন্ন প্যাথলজি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রিপোর্ট দেখে। যেগুলোর সাথে ডাক্তাররা জড়িত আছেন। সর্ব সাকুল্যে হাসপাতালের রোগীদের পেছনে ডাক্তাররা সময় দেন গড়ে দু' ঘন্টা। গত এক সপ্তাহ হাসপাতাল অঙ্গনে অবস্থান করে এমনই চিত্র দেখা গেছে। তবে দু' একজন ডাক্তার আছেন এর ব্যতিক্রম। তারা মোটামুটি সময়সূচী অনুযায়ী হাসপাতালে ডিউটি করেন। তাদের চেম্বারে প্রচুর রোগীর ভিড়ও লেগে থাকে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালে ডাক্তারদের ডিউটির সময় সূচী হচ্ছে সকাল ৮টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত। বাস্তবে দেখা গেছে ডাক্তাররা গড়ে তিন ঘন্টা হাসপাতালে থাকেন। এর মধ্যে দু' ঘন্টা সময় দেন রোগীদের পেছনে। দেখা গেছে সকাল ৮টা থেকে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও ১০টার আগে অধিকাংশ ডাক্তারই আসেন না। এই বিলম্বে আসা অনেকের ১১টা পর্যন্ত গড়ায়। অথচ তখন শত শত রোগী ডাক্তরদের চেম্বারে অপেক্ষায় থাকে। সকাল সাড়ে আটটা নয়টা থেকেই হাসপাতালে রোগীরা আসতে থাকে। টিকেট কেটে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় থাকে কাঙ্ক্ষিত ডাক্তারের জন্যে। ডাক্তার সাহেব তার সময় মতো চেম্বারে আসেন। অবশ্য এর আগে তিনি প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখেন। হাসপাতালে এসে রোগীর দীর্ঘ লাইন দেখে তখন ডাক্তার সাহেবের মাথা গরম হয়ে যায়। মিনিটে দু' জন করে রোগী দেখা শুরু করেন। কোনো রোগীর ভালোভাবে রোগ ও পরামর্শ সম্পর্কে জানতে চাইলে তখন ডাক্তার সাহেব রোগীর সাথে খারাপ আচরণ করেন। এরই মধ্যে যদি প্রাইভেট চেম্বার থেকে কল আসে তখন হাসপাতালে রোগী রেখেই চলে যান। এরপর দুপুর ১২টার পরপরই শুরু হয় ডাক্তারদের হাসপাতাল ত্যাগ করার প্রতিযোগিতা। ঔষধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাক্ষাতের জন্যে স্থানীয়ভাবে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেয়া হলেও ১২টার আগেই রিপ্রেজেন্টেটিভরা ডাক্তারদের চেম্বার দখল করে বসে থাকে। এতো গেলো ডাক্তারদের হালহকিকত।

এবার যদি বহির্বিভাগের রোগীদের টিকেট কাউন্টারের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে সেখানে ভোগান্তির চরম দৃশ্য দেখা যায়। ৮টা পর থেকে হাসপাতালে রোগী আসতে শুরু করে। টিকেট কাউন্টারের সামনে রোগীর ভিড় বাড়তে থাকে। অথচ তখনো কাউন্টার খোলা হয় না। ৯টার পর সাড়ে ৯টা - ১০টার আগে টিকেট কাউন্টার খোলা হয় না। আর তখন প্রচুর রোগীর ভিড় জমে যায়। অথচ সকাল ৮টা থেকে টিকেট কাউন্টার খোলার কথা। গতকাল পৌনে ১০টায় টিকেট দেয়া শুরু হয়। সাড়ে ৯টা - ১০টার দিকে টিকেট দেয়া শুরু করলে রোগীরা তখন আউটডোরের ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে লাইন ধরে। আউটডোরের ডাক্তাররা বিষয়ভিত্তিক ডাক্তারের কাছে রেফার করে। আর তখন ডাক্তাররা ওয়ার্ডে রাউন্ডে থাকে। রোগীরা সেখানে গিয়েও লাইনে অপেক্ষায় থাকে।

অথচ ডাক্তারদের সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ওয়ার্ডে রাউন্ড দেয়ার কথা। ডাক্তাররা হাসপাতালে আসেনই ১০টার পর। এসে ওয়ার্ডে রাউন্ডে যান। রাউন্ড শেষ করে চেম্বারে আসেন ১১টা থেকে সাড়ে ১১টায়। চেম্বারে এসে দেখেন রোগীর দীর্ঘ লাইন। অল্প সময়ে কিছু রোগী দেখেন। ১২টার পর তাদের হাসপাতাল ত্যাগ করার তাড়া শুরু হয়। তবে কয়েক জন ডাক্তার আছেন এর ব্যাতিক্রম। তিনজন নারী ডাক্তারের চেম্বারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীর দীর্ঘ লাইন থাকে। তাদেরকে মোটামুটি সময় অনুযায়ী চেম্বারে এসে রোগি দেখতে দেখা যায়। এছাড়া ৩-৪ জন পুরুষ ডাক্তারকেও হাসপাতালে সকাল ৯টার পর থেকে তাদের চেম্বারে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ডাক্তার হাসপাতালে আসা যাওয়ার বেলায় এমন অনিয়মের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদের কাছে জানতে চাইলে তিনি তার কথায় এক রকম অসহায়ত্ব প্রকাশ করলেন।

চাঁদপুর পিডিবি'র অসহযোগীতায় হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম

বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে ২৫০ শয্যা (মূলত ঃ ২শ' শয্যা) বিশিষ্ট চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা কর্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। হাসপাতালের পিক আওয়ারে গড়ে দুই ঘন্টাও বিদ্যুৎ থাকে না। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হাসপাতালের পিক আওয়ারে যাতে ওই এলাকায় লোডশেডিং না দেয়া হয় এমন অনুরোধপত্র দেয়ার পরও কোনো কাজ হয়নি। চাঁদপুর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) অনুরোধ রক্ষা করেনি। চাঁদপুর জেলার সর্ববৃহৎ হাসপাতালের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগেনি চাঁদপুর পিডিবির। তাদের এমন অসহযোগিতায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষসহ জেলাবাসী হতবাক।

বিদ্যুতের চরম সঙ্কটের কারণে এখন দিনের প্রায় অর্ধেক সময় বিদ্যুৎ থাকে না। এটি জাতীয় সমস্যা। বিগত কয়েক বছর বিদ্যুতের উৎপাদন তো বাড়েনি। কিন্তু চাহিদা তো প্রতিদিন বাড়ছে। সে কারণে লোডশেডিং এখন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। হাসপাতাল এলাকাও এর বাইরে থাকার কথা নয়। তবে হাসপতালে যেহেতু মানুষের জীবন মৃত্যুর খেলা চলে সেটির ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা থাকা প্রয়োজন। হাসপাতালের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থান তো আর অন্য কিছু হতে পারে না। সকল ভিভিআইপি এলাকার উর্ধ্বে থাকবে হাসপাতাল অঙ্গন। কিন্তু না বাস্তবে এর বিপরীত।

জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ছাড়াও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা থেকে অনেক জটিল ও মুমূর্ষ রোগীদের নিয়ে আসা হয় চাঁদপুর জেলা সদর হাসপাতালে। কারো অপারেশন প্রয়োজন কারো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় যদি হাসপাতালে বিদ্যুৎ না থাকে তখন চরম ভোগান্তি তে পড়তে হয় রোগী ও ডাক্তারদের। দেখা গেছে যে অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচার চলছে এমতাবস্থায় বিদ্যুৎ চলে যায়। তখন রোগী জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে। এমন চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রায়ই পড়তে হয় রোগীদের। এক্ষরে প্যাথলজি এসবই বিদ্যুতের উপর নির্ভর। এছাড়া বিদ্যুৎ চলে গেলে ডাক্তাররাও অন্ধকার রুমে রোগী দেখতে পারেন না। এসব মানবিক সমস্যার বিষয় বিবেচনা করে হাসপতাল কর্তৃপক্ষ চাঁদপুর পিডিবিকে অনুরোধপত্র লিখেছিলেন যাতে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হাসপাতালে লোডশেডিং না দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অস্ত্রোপচার ও বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয়। চাঁদপুর পিডিবি তো এই অনুরোধ রক্ষা করেইনি উপরন্ত লোডশেডিংয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

হাসপাতালের একজন ডাক্তার বললেন, একদিন একজন রোগীর পেটে অস্ত্রোপচার চলছে। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেছে। তখন চাঁদপুর পিডিবি'র নির্বাহী প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয় হাসপাতালে বিদ্যুৎ দেয়ার জন্যে। নির্বাহী প্রকৌশলী একজন মানুষের জীবন মৃত্যুর কথা বিবেচনা না করে তিনি সাফ জবাব দিলেন, আমার কিছুই করার নেই, আপনারা বিকল্প ব্যবস্থা করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছেঃ চাঁদপুর পিডিবি আমাদের অনুরোধ যেহেতু রাখলেন না, তাহলে এটা তো

অন্ততঃ তিনি করতে পারবেন যে, দিনের এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত হাসপাতাল এলাকায় লোডশেডিং থাকবে। তাহলে অন্তত আমরা ওই সময়ে অস্ত্রোপাচারের মতো স্পর্শকাতর কাজে হাত দিতাম না। এছাড়া হাসপাতালকে লোডশেডিং মুক্ত রাখার জন্যে ডাক্তারদের পক্ষ থেকে একটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো যে চাঁদপুর শহরের নতুন বাজার জোনে যে ক'টি ফিডার থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হচ্ছে, সবকটি ফিডার থেকে একটি করে সংযোগ হাসপাতালে দেয়া হলে তখন এক বা একাধিক ফিডার বন্ধ হলেও হাসপাতাল লোডশেডিং মুক্ত থাকবে। এই প্রস্তাবও বিদ্যুৎ বিভাগ শুনেনি। হাসপাতালের তত্ত্বাধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদ জানান আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ। আগামী ২৯ জুলাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাঁদপুর আসছেন। তার কাছে আমরা বিষয়টি উত্থাপন করবো। আমাদের বিশ্বাস, তিনি এর একটি বিহিত ব্যবস্থা করবেন।

বেশ ক'টি বিভাগের এখনো অনুমোদনই মিলেনি

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্যে যেসব বিভাগ থাকা প্রয়োজন সে সবের মধ্যে বেশ ক'টি বিভাগ চাঁদপুর জেনারেল (জেলা সদর) হাসপাতালে নেই। এমনকি এসব বিভাগের অনুমোদনও মিলেনি। এছাড়া কিছু বিভাগ চালু রয়েছে আংশিকভাবে।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্যে যেসব বিভাগ চালু থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে ফিজিওথেরাপী ইউসি তথা জরুরি প্রসূতি সেবা ও রেডিওথেরাপী বিভাগ রয়েছে। চাঁদপুর জেলা সদর হাসপাতালকে ২৫০' শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল বলা হলেও এখানে এখনো এসব বিভাগ চালু হয়নি। এমনকি এসব বিভাগের এখনো দাপ্তরিক অনুমোদনও মিলেনি। এছাড়া মেডিসিন সার্জারী ও গাইনী বিভাগ দুটি করে ইউনিট থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছে একটি করে।

জেলার সর্ববৃহৎ হাসপাতালে অতি প্রয়োজনীয় এ বিভাগগুলো চালু না থাকায় রোগীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিশেষ করে ফিজিওথেরাপী ও জরুরি প্রসূতি সেবা বিভাগ চালু না থাকায় শহরে নাম সর্বস্ব কিছু প্রাইভেট ক্লিনিকে এ দুটি বিভাগের রমরমা ব্যবসা চলছে। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে জরুরি প্রসূতি সেবা ও থেরাপীর নামে রোগীদের সাথে করা হয় প্রতারণা।

এ ব্যাপারে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ নূর মোহাম্মদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন হাসপাতালে তো ২৫০ শয্যার প্রশাসনিক অনুমোদনই এখনো মেলেনি। এছাড়া রয়েছে অবকাঠামোর সঙ্কট। ২৫০ শয্যার অনুমোদন মিললেই এসব বিভাগের অনুমোদনও মিলবে এবং প্রয়োজনীয় লোকবলও নিয়োগ দেয়া হবে। তখন আর তেমন সমস্যা থাকবে না।

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদন
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদক
মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন

প্রকাশের তারিখ
২৫ অক্টোবর ২০১০ থেকে
২০ ডিসেম্বর ২০১০

সংবাদপত্র
শীর্ষ কাগজ

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক মানব কণ্ঠ
স্টাফ রিপোর্টার

National Housing Authority
জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

ঘুষ, দুর্নীতি, জাল-জালিয়াতি, অনিয়ম ও লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, দোকান বরাদ্দ, জমির ইজারা, বিকল্প প্লট বরাদ্দ, বাড়ির নকশা ছাড়, বদলি বাণিজ্য, চিঠি ইস্যু, নকশা প্রণয়ন, লে-আউট প্ল্যান, নামজারির অনুমোদন সবকিছুতেই ঘুষ। পদে পদে ঘুষ। টেবিলে টেবিলে ঘুষ। ঘুষ ছাড়া কোন ফাইল নড়েনা। সব অনিয়মই এখানকার নিয়ম। অনেক সময় ঘুষ দিয়েও কাজ হয়না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কর্মকর্তাদের টেবিলে ফাইল আটকে থাকে। এই সব ফাইলের কোন তদারকিও নেই। কতদিন ধরে কর্মকর্তাদের টেবিলে এই ফাইল পড়ে থাকবে তারও কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। ঘুষ-দুর্নীতি আর চরম ভোগান্তির অপর নাম জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে এখানকার দালাল, কর্মকর্তা-কর্মচারী সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। দালাল, কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে খোদ চেয়ারম্যান পর্যন্ত এই ঘুষের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। তাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে সংঘবদ্ধ দালাল কর্মকর্তা কর্মচারী সিন্ডিকেট। সব কাজের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। ঘুষ দুর্নীতি করেই তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এখন কোটি টাকার মালিক। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে সাধারণ লোকজনের চরম হয়রানি, ঘুষ বাণিজ্যসহ নানা অনিয়ম নিয়েই আমাদের অনুসন্ধানী ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

ঘুষ-দুর্নীতির আখড়া জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

৩০ ধাপে ঘুষ বাণিজ্য

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে প্লট বরাদ্দসহ যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে নিয়ম অনুযায়ী চেয়ারম্যান, সদস্য ভূমি, পরিচালক, উপ-পরিচালক, প্রকৌশল বিভাগসহ কমপক্ষে দশ টেবিল পর্যন্ত ফাইল ঘুরে আসতে হয়। এই একটি ফাইল ঘুরে আসতে সময় লাগে কয়েক বছর। তাও তদবির জোরে, ঘুষ দিলে। অন্যথায় বছরের পর বছর সেই ফাইল কর্মকর্তা নয়, কর্মচারীর টেবিলে পড়ে থাকে। খোঁজ খবর নেয়ার প্রয়োজনীয়তাও নাই কারো। তাই প্রত্যেক ফাইলকে ঘিরে তদবির চলে ঘুষখোর সিন্ডিকেটের। লুকোচুরি নয়, প্রকাশ্য ঘুষের লেনদেন হয় এখানে। ঘুষ ছাড়া ফাইলে একটি সইও হয়না। নিয়মানুযায়ী দশ টেবিলের স্থলে ঘুষ দিয়ে ফাইল নিয়ে যেতে হয় ৩০ টেবিলে। ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধানের নামে এসব ফাইল কর্মকর্তাদের টেবিলে টেবিলে চালাচালি করা হয়। প্রত্যেক টেবিলে প্রতি ফাইল দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার, দুই হাজার, পাঁচশ ও একশ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায় করা হয়। এক ফাইল

যতবার টেবিলে আসবে ভুক্তভোগীকে ততবারই ঘুষ দিতে হয়। এসব ফাইলকে ঘিরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে দৈনিক কয়েক লাখ টাকার ঘুষের লেনদেন হয়। ঘুষ ছাড়া কাজ আদায় কোনভাবেই সম্ভব নয়। ঘুষ আদায়ের জন্য দালাল তো আছেই। অধিকাংশ সময় কর্মকর্তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা নিজেরাই দালাল সেজে তদবির করে থাকে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিস ঘুরে এই চিত্র দেখা গেছে। ঘুষ দুর্নীতি আর পদে পদে ভোগান্তির শিকার হলেও সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটের অনৈতিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে নারাজ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভুক্তভোগী জানান, মিরপুর-২ নম্বর সেকশনের চ ব্লকে অবস্থিত মূল প্লটের পাশে পৌনে এককাঠা খন্ড জমি বরাদ্দের জন্য তিনি একটানা তিন বছর ধরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের টেবিলে টেবিলে ঘুরছেন। নিয়মানুযায়ী এই জমি পাওয়ার কথা থাকলেও ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েও গত তিন বছরে তিনি বরাদ্দ বুঝে পাননি। ঠুনকো অজুহাত দেখিয়ে তার কাছে থেকে ঘুষ আদায় করতে তিন বছরে প্রায় চারবার তার আবেদন পত্র বাতিল করা হয়। ঘুষ দিয়ে তিনি বরাদ্দ প্রক্রিয়ার বাতিল ফাইল আবার চালু করেন। পদে পদে হয়রানির শিকার এবং বাজার মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য জমা দিয়েও সেই ভুক্তভোগী এখনো খন্ড জমি বুঝে পাননি।

অভিযোগে জানা যায়, তিন বছর আগে পৌনে এককাঠা খন্ড জমি বরাদ্দের জন্য ওই ভুক্তভোগী চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন জানান। প্রায় চারবার তার আবেদনপত্র বাতিল করে দেয়ার পর এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে তিনি ফাইলটি পুনঃচালু করেন। চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করার পর আবেদনটি পাঠানো হয় ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের দপ্তরে। ওই দপ্তরে তার কাছে থেকে বড় অংকের ঘুষ নেয়া হয়। এরপর এটি পাঠানো হয় পরিকল্পনা, নকশা ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগে। সেখানে ঘুষ দেয়ার পর মাঠ পর্যায়ের জন্য প্রতিবেদনর জন্য পাঠানো হয় মিরপুর সার্কেলের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে। ওই ভুক্তভোগী জানান, মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে গিয়ে ঘুষ দিয়েও তিনি চরম হয়রানির শিকার হন। প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য তাকে নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলীদের খন্ড জমিতে নিয়ে যেতে হয়। পরবর্তীতে প্রতিবেদন সংগ্রহের এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাকে মিরপুর সার্কেল অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত প্রায় এক লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এরপর শুরু হয় সেগুনবাগিচাস্থ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আরেকদফা হয়রানি ও ঘুষ বাণিজ্য। রিপোর্টটি জমা দেয়া হয় ঢাকা সার্কেল ২ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়ে। এরপর তার ফাইলটি একে একে মেম্বার প্রকৌশল, মেম্বার প্ল্যানিং হয়ে ঘুরে আসতে ওই সব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর একাধিক টেবিলে তাকে ঘুষ দিতে হয় আরো প্রায় তিন লাখ টাকা। চলতি বছরের রমজান মাসে এটির নকশা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় চেয়ারম্যানের টেবিলে। সেখানে তার কাছ থেকে নেয়া হয় ক্যাশ এক লাখ টকা। এখন তার ফাইলটি চেয়ারম্যানের অনুমোদন হয়ে ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ পরিচালক একে এম টিপু সুলতানের টেবিলে গিয়ে আটকে আছে। অভিযোগে প্রকাশ, ওই টেবিলেও তাকে মোটা অংকের ঘুষ দিতে হবে। তারপর সেটি বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। আর বোর্ড সভায় চেয়ারম্যানসহ যারা থাকবেন তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট অংকের ঘুষ দিয়ে ফাইল অনুমোদনে আগে ভাগেই রাজি করিয়ে নিতে হবে। ঘুষ দিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বোর্ড সভায় অনুমোদন দেয়া হবে তার ফাইলটির। এরপর ভূমি ও

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে ফি জমা দিয়ে তাকে আদেশ জারি সংক্রান্ত পত্র নিতে হবে। সর্বশেষ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেও তাকে কর্মচারীদের বিভিন্ন টেবিলে ঘুষ দিতে হবে। তাপর হয়ত তার হয়রানির অবসান ঘটবে। স্বপ্নের কাঙ্খিত খন্ড জমি তার অনুকূল আসবে। এভাবে ঘুষ দিয়েও সেই জমি পেতে তার আর কত বছর লাগতে পারে তারও নিশ্চয়তা নেই। জমি বরাদ্দ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত পদে পদে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে এভাবেই চলছে ঘুষ দুর্নীতির মহোৎসব।

মোরাদ হোসেনের বেপরোয়া দুর্নীতি

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং দুর্নীতিবাজ অফিসারের নাম মোঃ মোরাদ হোসেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি চেয়ারম্যানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। ২০০৭ সালের ১৩ নভেম্বর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড হিসেবে যোগদান করেন। তদবিরের জোরে সেই থেকে আজ অবধি তিনি একই পদে বহাল আছেন। এই অফিসে এক পদে টানা তিন বছর থাকার সুযোগ এর আগে আর কারো হয়নি। বহুবার তার বদলি আদেশ হয়েছে, কিন্তু অদৃশ্য ইশারায় তা আবার ঠেকেও গেছে। তিনি নির্দ্বিধায় ঘুষ খান আবার চাকরির সুবিধার্থে উপর মহলে ঘুষও দেন। অফিসে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি আছে। প্লট বরাদ্দসহ এই অফিসের সব কাজে তার একক নিয়ন্ত্রণ। তার সই ছাড়া এখানকার কোন ফাইল নড়েনা। ঘুষ নিয়ে আদালতের আদেশ অমান্য করে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্লট বিকল্প বরাদ্দ দেয়ার নজিরও আছে। এই অফিসে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠেছে একটি সংঘদ্ধ শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অফিসের অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ কর্মকার্তা-কর্মচারী তার এই সিন্ডিকেটের সদস্য। এই অফিস ছাড়াও চট্টগাম,বরিশাল, সিলেট, রাজশাহীসহ বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসেও সিন্ডিকেটের ডালপালা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ও এখানকার সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মী। যারা তার এই সিন্ডিকেটের বিরোধিতা করবেন তাদের কোন কারণ ছাড়াই বদলি করে শাস্তি দেয়া হয়। একইভাবে তার অধীনস্থ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও কথায় কথায় বদলি করা হয়। আবার মোটা অংকের টাকা নিয়ে একই পদে বদলি করে নিয়ে আসার রেকর্ডও আছে তার ঝুলিতে। মোরাদ হোসেনের গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুরে। তিনি এখন নিজেকে শেখ হেলালের আত্মীয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক বলে পরিচয় দেন।

অভিযোগে জানা যায়, চাকরিতে যোগদানের পর হতে এই তিন বছরে ঘুষ দুর্নীতি করে মোরাদ হোসেন নামে বেনামে এখন একশ' কোটি টাকার মালিক। গত তিন বছরে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তার নিয়ন্ত্রণে একাধিক বোর্ড সভা করে কমপক্ষে একশ' এর উপরে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বিকল্প বরাদ্দ দিয়ে দেন। এসব প্লট বিকল্প বরাদ্দের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে একধিক মামলাও রয়েছে। এসব মামলায় বিকল্প প্লট বরাদ্দে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়। কিন্তু কে শুনে কার কথা। আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চেয়ারম্যানকে ঘুষ দিয়ে দুর্নীতিবাজ মোরাদ হোসেন বোর্ড সভা ডেকে এসব প্লট বিকল্প বরাদ্দ দিয়ে দেন। আর এসব বোর্ড সভা অনুষ্ঠান নিয়েও তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আছে। প্রায় এগারজন সদস্য উপস্থিত থাকার বিধান থাকলেও তার অনুগত দুই তিন জন ছাড়া আর কাউকে রাখা হয়না।

জানা যায়, চট্টগ্রাম হালিশহর বি ব্লকের এক নম্বর রাস্তার ট্রেড স্কুল সংলগ্ন ছয় নম্বর প্লট ১৯৯৯ সালে যথানিয়মে বরাদ্দ দেয়া হয় মাছুম রেজা নামের এক ব্যক্তিকে। তার মত জামিলুর রহমান, এবাদ উল্লাহসহ আরো প্রায় ৪৩ জনকে ১৯৯৮/৯৯ সালে যথা নিয়মে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয় হালিশহর জি ব্লক, বি ব্লক ও ফিরোজশাহ কলোনিতে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৯ তম বোর্ড সভায় ঢাকা অফিসে টাকা জমা দেয়ার জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তদের চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড হিসেবে যোগদানের পর ৫০ তম বোর্ড সভা ডেকে আগের বোর্ড সভায় কিস্তির টাকা জমা নেয়া সংক্রান্ত আদেশ স্থগিত করে দেন। এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মোঃ মাছুম রেজাসহ ৪৩ প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি চেয়ারম্যান, সচিব, মেম্বার ল্যান্ড মোরাদসহ ছয় কর্মকর্তাকে আসামী করে হাইকোর্টে পৃথক তিনটি রিট করেন। এসব মামলায় ২০০৮ সালে ৯ জুন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। উচ্চতর আদালতের এই আদেশ অমান্য করেই ঘুষ নিয়ে মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের নেতৃত্বে চেয়ারম্যনসহ অন্যদের ম্যানেজ করে পরবর্তী ৬৯ তম বোর্ড সভা ডেকে এসব প্লট থেকে বিকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়। এভাবে প্রতিমাসে বোর্ড সভা করে ঘুষ নিয়ে বিকল্প বরাদ্দ অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী মাছুম রেজার পক্ষ থেকে বিষয়টি জানিয়ে আদালতের আদেশ মেনে বিকল্প বরাদ্দ থেকে বিরত এবং দুর্নীতিবাজ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ৩ মার্চ চেয়ারম্যান বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। কিন্তু চেয়ারম্যান অভিযোগের তদন্ত না করে মোরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত এই মোরাদ হোসেনকে দায়িত্ব দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ৪৩ জন সাধারণ ব্যক্তি প্রায় বার বছর ধরে একটি প্লটের মালিক হবেন এ আশায় এখনো ঘুরছেন কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে। মোরাদ হোসেন ও তার সিন্ডিকেটের অপকর্মে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ঘুষ দুর্নীতির বাসা বেঁধেছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন শীর্ষ কাগজকে জানান, এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। এসব অভিযোগকে তিনি মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও উল্লেখ করেন।

প্লট হস্তান্তরে ঘুষ বাণিজ্য

জহিরুল ইসলাম নামের এক প্রবাসীর সঙ্গে পরিচয় হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি প্রতিদিন একবার হলেও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ অফিসে আসেন। আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, মিরপুর সেকশনে গৃহায়নের বরাদ্দপ্রাপ্ত শামসুদ্দিন নামের এক ব্যক্তির কাছে থেকে প্লট কিনেন। এই প্লট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যখনি তিনি দেশে আসেন তখন থেকে তাকে এখানে নিয়মিত আসতে হয়। তিন মাস আগে তিনি শুধুমাত্র প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করতে দেশে আসেন। ২৫ অক্টোবরের মধ্যে তার প্রবাসের কর্মস্থলে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো কাজই শেষ হয়নি। তাই তাকে নির্ধারিত সময় বাড়িয়ে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ফ্লাইট বাতিল করতে হয়। এরপরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার কাজ শেষ হয় কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অভিযোগে জানা যায়, প্লট কেনা সংক্রান্ত চেয়ারম্যানের অনুমতিসহ যাবতীয় কাজে প্রায় এক বছর ধরে তাকে এখানে আসতে হচ্ছে। মাঝখানে বিদেশ চলে গেলে তার ফাইলটিও হিমাগারে চলে যায়। দেশে ফিরে ঘুষ দিলে আবারও ফাইলটি চালু করা হয়। তিনি জানান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিটি পদে পদে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করতে হচ্ছে। নথিপত্র সবকিছু ঠিকঠাক থাকার পরও ঘুষ দিয়েও যথাসময়ে এখানে কোন কাজ হয়না। নিজে উপস্থিত থেকে সব করতে হচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করেন, চেয়ারম্যানের অনুমতি, তারপর চিঠি ইস্যু, বিক্রেতাকে অফিসে হাজির করা, সেখান থেকে মিরপুর সার্কেলে সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত, এই রিপোর্ট নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে আনা, সেখান থেকে চিঠি ইস্যু বিভাগে নথিভুক্ত করা, সংশ্লিষ্ট কাজে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণ পর্যন্ত গিয়ে তার ফাইলটি আটকে আছে। এসব কাজ আদায়ে তাকে পদে পদে ঘুষ দিতে হয়েছে। তার চেয়েও বেশি হয়েছে ভোগান্তি। এ পর্যন্ত তাকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। কিন্তু এখনো তার কাজ বাকি আছে। এ অবস্থায় কাজ শেষ করে বিদেশ যেতে পারবেন কিনা নাকি কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে আগের মত চলে যেতে হয় এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন।

এভাবে প্রবাসী জহিরুল ইসলামের মত কত প্রবাসী হয়রানির শিকার হচ্ছেন তার কোন হিসাব নেই। আর তার বিপরীতে সাধারণ লোকজনের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়।

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারী ও সিন্ডিকেট

চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে অফিস পিয়ন পর্যন্ত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘ ৩ বছর ধরে একই পদে বহাল থাকার সুবাদে মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের নেতৃত্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে সংঘবদ্ধ এই সিন্ডিকেট। মোরাদ হোসেনের এই সিন্ডিকেটে রয়েছেন তার সাবেক পিএস শামসুল হুদা, পরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলী, উপ পরিচালক একে এম টিপু সুলতান, আল মামুন মোর্শেদ, ঢাকা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকৌশলী ওয়াহিদ আজহার, ঢাকা ডি-১ এর নির্বাহি প্রকৌশলী কাজী আবু হানিফ, চিঠি ইস্যু কক্ষের অফিস সহকারী শামসুল হক, মিরপুরের উচ্চমান সহকারী বনিক বাবু, ঢাকা সার্কেলের পিয়ন পাটোয়ারীসহ এই অফিসের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী। একেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর টেবিলে এখন ফাইলের স্তুপ। ঘুষ নিয়ে তারা নিজেরাই এসব ফাইলের তদবির করেন। নিজেদের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক সমঝোতা। ঘুষ না দিলে উপরে নিচে কেউ কাজই করেন না। খোদ চেয়ারম্যান পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ হওয়ায় ভুক্তভোগীদের অভিযোগে কোন কাজ হয়না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা শীর্ষ কাগজকে জানান, এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। কোন ফল হায়না। বরং নালিশ করার অভিযোগে উল্টো ভুক্তভোগীকে আগের চেয়ে দ্বিগুণে ঘুষ দিতে হয়। এই সিন্ডিকেটের দাপটের কাছে সাধারণ লোকজন কর্যত অসহায়।

দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যানের বদলি

নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সম্প্রতি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন মিয়াকে গত সপ্তায় বদলি করা হয়। জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে হঠাৎ করে বদলি করায় সাধারণ লোকজনের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসলেও তদবিরবাজ ও সিন্ডিকেট সদস্যরা অসন্তুষ্ট হন। অসন্তুষ্ট হন তিনি নিজেই। যোগদানের এক বছরের মধ্যে তিনি নামে বেনামে শত কোটি টাকার মালিক। ভাইয়ের সুবাদে তার ছোট ভাইও ব্যাপক টু পাইস কামিয়েছেন। বিদায়ের শেষ দুই দিনে তিনি অসংখ্য ফাইলে সই করে যান। এসব ফাইলের মধ্যে তার ছোট ভাইও দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের ঘুষ তদবিরের ফাইলের সংখ্যা বেশি। বিদায়ের আগের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তার দপ্তরে একাধিক ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এসময় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অফিসে তার ছোট ভাইকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। তবে তার শেষ চেষ্টা সফল হয়নি। তিনি

ঘুষ নিয়ে অস্থায়ীভাবে প্রায় ৩০ জনকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করেন। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে প্রতি ফাইলে এক লাখ থেকে ক্ষেত্রভেদে ১০ লাখ পর্যন্ত ঘুষ নেয়ার অভিযোগ আছে। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক পরিচয়ে দাপটের সঙ্গে তিনি বদলি বাণিজ্য, ফাইল আটকে দেয়া, আবেদন পত্র বাতিল করাসহ নানা অপকর্ম করে গেছেন।

আলোচিত নাম 'জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ'

পদে পদে ঘুষ। টেবিলে টেবিলে ঘুষ। ঘুষ ছাড়া কোন ফাইল নড়ে না। অনেক সময় ঘুষ দিয়েও কাজ হয় না। ঠুনকো অজুহাতে এখানকার দালাল কর্মকর্তা-কর্মচারী সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। দালাল, কর্মচারী থেকে শুরু করে খোদ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন পর্যন্ত এই ঘুষের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। তাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে সংঘবদ্ধ দালাল কর্মকর্তা কর্মচারী সিন্ডিকেট। সব কাজের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে।

এ সময়ের বহুল আলোচিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিককালে এখানকার ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম নিয়েই এই আলোচনা। আলোচনা চলছে সরকারি মহলেও। জাতীয় গৃহায়নে দুর্নীতির খবর নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিদায়ী চেয়ারম্যানের দুর্নীতি ও লুটপাট অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তার কারণে সেবাখাতের মত এই প্রতিষ্ঠানে এখন দুর্নীতি বাসা বেধেছে। এখানে অনিয়মই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, দোকান বরাদ্দ, জমির ইজারা, বিকল্প প্লট বরাদ্দ, বাড়ির নকশা প্রণয়ন ও ছাড়, চিঠি ইস্যু, লে-আউট প্ল্যান, নামজারির অনুমোদান, বন্ধক অনুমতি, রেজিস্ট্রেশন, দান হেবা অনুমতি, বিক্রয় অনুমতি, ভাঙা ও পুনর্নির্মাণ, খেলাপী কিস্তির টাকা জমা, নিম্নমান বাড়ি বরাদ্দ, আম মোক্তারনামা, আধাপাকা টিনশেড বাড়ি বরাদ্দ, নামজারি অনুমতিসহ সব কাজেই চলছে নজিরবিহীন দুর্নীতি। জাতীয় গৃহায়নের আলোচিত দুর্নীতি নিয়ে আমাদের এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

ঘুষ দুর্নীতি ঃ সরেজমিন দু'দিন

বিদায়ী চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের রেখে যাওয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে জাতীয় গৃহায়নে জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়ে চলেছে। প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, দোকান বরাদ্দ, জমির ইজারা, বিকল্প প্লট বরাদ্দ, বাড়ির নকশা ছাড়, বদলি বাণিজ্য, চিঠি ইস্যু, নকশা প্রণয়ন, লে-আউট প্ল্যান, নামজারির অনুমোদন সবকিছুতেই প্রকাশ্যে আদায় করা হাচ্ছে ঘুষ। পদে পদে ঘুষ। টেবিলে টেবিলে ঘুষ। ঘুষ ছাড়া কোন ফাইল নড়ে না। ঘুষ দিয়েও কাজ হয় না। ঠুনকো অজুহাতে এখানকার দালাল কর্মকর্তা কর্মচারী সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। দালাল, কর্মচারী থেকে শুরু করে খোদ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন পর্যন্ত এই ঘুষের লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। তাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে সংঘবদ্ধ দালাল কর্মকর্তা-কর্মচারী সিন্ডিকেট। সব কাজের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। ঘুষ-দুর্নীতি করেই তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এখন কোটি টাকার মালিক। গত ৪ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর দু'দিন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে গিয়ে প্রকাশ্য ঘুষ দুর্নীতির এই চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, জাতীয় গৃহায়নের নতুন চেয়ারম্যান এম এ হান্নান ছাড়া তার অধীনস্থ সহকারী হতে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত সকলে এই দুর্নীতি ও অবৈধ ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। একই পদে তিন বছরের বেশি সময় ধরে আসীন দুর্নীতির বরপুত্র মেম্বার ল্যান্ড

মোরাদ হোসেন উপ-পরিচালক একে এম টিপু সুলতান, ঢাকা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এটি এম ওয়াহিদ আজহার, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপসচিব মোঃ হুমায়ুন কবির, সমন্বয় ও উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রফুল চন্দ্র ভৌমিক, প্রকৌশল ও সমন্বয় বিভাগের সদস্য খন্দকার আকতারুজ্জামান, একই বিভাগের পরিচালকসহ অধিকাংশ কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থ কর্মচারীরা প্রত্যেকটি কাজে প্রতিটি ফাইলে প্রকাশ্যে ঘুষ আদায় করছেন। এসব অফিসের অধিকাংশ কর্মকর্তা কর্মচারীদের দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। জাতীয় গৃহায়নের প্রত্যেক কর্মকর্তার অফিসে কর্মচারী ও দালালের ভিড়ে সাধারণ ভুক্তভোগীরা অসহায় ছিল। গত ৪ নভেম্বর গৃহায়ন অফিসের রেকর্ড রুম ও ইস্যু শাখায় জনসাধারণকে বেশি হয়রানির শিকার হতে দেখা গেছে। ঘুষ দেয়া ছাড়া ফাইল কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে তাও জানার সুযোগ নেই কারো। ঘুষ না দেয়ায় ইস্যু শাখায় মিরপুর থেকে আসা এক কলেজ শিক্ষিকাকে চরম হয়রানি করা হয়। একশ' টাকা ঘুষ দেয়ার পর তার ফাইলটি খুঁজে বের করতে হয় তাকেই। এ অফিসের বিধানও নাকি এটি। প্রতিবাদ করায় অনেককে শাখার দায়িত্বরত শামসুল হকের ধমক খেতে হয়েছে। গত ১১ নভেম্বর জাতীয় গৃহায়ন অধিদফতরে ঘুরে দেখা গেছে, কর্মকর্তা কর্মচারীদের টেবিলে টেবিলে অসংখ্য তদবির ফাইল। প্রত্যেকটি থেকে স্বাভাবিক নিয়মে ঘুষ আদায় ছাড়াও বাড়তি ঈদ বকশিশ আদায় করা হয়। ঈদ বকশিশ না দেয়ায় ফাইল নিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে দালাল কর্মচারীরা তর্কাতর্কি করতেও দেখা গেছে।

নামজারিতে দুর্নীতি

দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটকে ম্যানেজ করে মোটা অংকের বিনিময়ে যে কেউ ভুয়া দলিল দেখিয়ে নামজারি করে অন্যের প্লট হাতিয়ে নিতে পারে। এমন ঘুষ দুর্নীতি ও অনিয়মের নজির সৃষ্টি করেছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। টাকা দিয়ে এখানে সব কিছুই করা যায়। ঘুষ দিয়ে একজনের নামজারি অন্যজন কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে অহরহ ভুয়া দলিলে নামজারির ঘটনা ঘটছে। এই নামজরি দিয়েই ভূমিদস্যুরা প্রকৃত বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রহীতার অজান্তে পুরো প্লটটিই লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে জবর দখল করছেন। পরে সেই প্লট বিক্রিও করে দিচ্ছেন। নামজারির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান থাকলেও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে তা মানা হচ্ছে না। দলিল আসল না নকল তাও এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় না। আসল দলিল ছাড়া সার্টিফাই দলিল দিয়েও অন্যজনের প্লটের নামজারি কেটে নেয়া হচ্ছে। ফলে ভুয়া নামজারি দিয়ে একজনের প্লট অন্যজন হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব ভুয়া নামজারির প্রতিকারও পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে আবেদন করে প্রকৃত প্লট মালিকরা কোন সুফল পাচ্ছে না। সমস্যা জিইয়ে রেখে দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট বছরের পর বছর ধরে প্রতারিত প্লট গ্রহীতাদের হয়রানি করে আসছেন। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এসব ভুয়া নামজারির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে প্রতারিতদের মামলা মোকদ্দমা দায়েরে বাধ্য করছেন। ফলে মামলার রায় ঘোষণার আগে আইনি জটিলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারকরা জবরদখলে রাখা প্লটটি নিয়ে বাণিজ্য করতে পারে।

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে চট্টগ্রামের শেরশাহ হাউজিংয়ে ভুয়া দলিলে নামজারি করে বাড়ির কেয়ারটেকার কর্তৃক ১৯৬১ সালে বরাদ্দপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির প্লট জবর দখলের ঘটনাও ঘটেছে। এতে প্রতারিত প্লট মালিকের পক্ষে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে ঘটনা জানানো হলে এক পর্যায়ে জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। পরে অফিস থেকে নোটিশ দিয়ে প্রতারক কেয়ারটেকারের নামজারি বহাল রাখার আদেশ দেয়া হয়। একই সঙ্গে কেয়ারটেকারের জবরদখল থেকে প্লটটি উদ্ধার করে তা মালিককে বুঝিয়ে দেবার আদেশও দেয়া হয়। পরবর্তীতে সেই আদেশ পালন করা হয়নি। মাত্র এক সপ্তা'র ব্যবধানে বড় অংকের ঘুষ দিয়ে অফিস আদেশটি স্থগিত করে রাখা হয়। পরবর্তীতে অফিস থেকে উভয় পক্ষকে শুনানিতে ডাকা হয়। শুনানির দিন জবরদখলকারী উক্ত প্রতারকের পক্ষে সাবেক এক আমলা ও প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় পরিচয়ে এক ব্যক্তিকে সরাসরি তদবির করতে দেখা গেছে। শুনানির পর্যায়ে রেখে এখন বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ ধরনের অনিয়মের মধ্য দিয়ে চলছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সকল কার্যক্রম।

অভিযোগে জানা যায়, চট্টগ্রামের বায়েজিদ এলাকার বাসিন্দা ওসমান নামের এক ব্যক্তি ১৯৬১ সালে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম হাউজিং এস্টেটের অধীনে শের শাহ হাউজিংয়ের ২৬ নম্বর প্লটটি যথানিয়মে বরাদ্দ নেন। ১৯৬২ সালের ৮ জানুয়ারী ১২৪ নম্বর রেজিষ্টার্ড দলিল মূলে এই প্লটের মালিক হন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হতে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করে উক্ত প্লটটিতে দ্বিতীয় তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। এরপর হতে ওসমান তার পরিবার নিয়ে ভোগ দখলে ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে মিরসরাই এলাকার সুফি তাজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ঘর ভাড়া দেয়া হয়। উক্ত সুফি পীর বলে নিজেকে পরিচয় দিতেন। ১৯৭৩ সালে উক্ত বাড়িটি ভুলবশত সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করলে প্লটের মালিক ওসমান আবেদন করে পরে অবমুক্ত করিয়ে নেন। এসময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরী করতেন। চাকরির সুবাদে সপরিবারে তিনি ঢাকায় থাকলেও সময় সময় তার স্ত্রী পুত্ররা বাড়িতে থাকতেন। প্লটের মালিক ওসমান ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলামকে বিশ্বাস করতেন বলে সেখানে একটি খানকা স্থাপনের অনুমতিও দেন। এসময় ওসমানের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনার কারণে বেশির ভাগই দেশের বাইরে থাকতেন। পরবর্তীতে অনেকেই সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসও করা শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে ওসমান মারা যান। তার স্ত্রী মারা যান ১৯৯৫ সালে। দু'জনেই মারা যাবার পর তাদের বড় পুত্র হায়দার হোসেন বিদেশ থেকে এসে সহায়-সম্পত্তি বুঝে নেন। ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলামকে বাড়িটি মৌখিকভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি আবারো বিদেশে চলে যান। ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলাম প্লটের মালিক ওসমানের মৃত্যুর প্রায় ১৪ বছর পর প্লটটি আত্মসাৎ করতে চক্রান্ত শুরু করেন। ওসমানের ছেলে-মেয়ের বিদেশে বসবাসের সুযোগ নিয়ে তিনি ১৯৭৪ সালের সময় দেখিয়ে ওসমান থেকে ওই সম্পত্তি ক্রয় করেছে মর্মে একটি ভুয়া দলিল সৃজন করেন। অথচ সে সময় প্লটের মালিক ওসমান সরকার খাদ্য মন্ত্রণালয়ে চাকরি করতেন। ওসমানের মৃত্যুর ১৪ বছর পর তার স্বাক্ষর জালিয়াত করা ভুয়া দলিল উপস্থাপন করে গোপনে ১৯৯৮ সালে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে প্লটটি তার নামে নামজারির আবেদন করেন। অথচ ১৯৭৪ সালে এই দলিল সৃজনের কথা বলা হলেও এত দীর্ঘ বছরেও ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলাম জাতীয় গৃহায়নে নামজারির আবেদন করেন নি। এমনকি ওসমান ও তার স্ত্রীর জীবদ্দশায়ও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি। এভাবে বছরের পর বছর গোপন

রেখে তাজুল বড় অংকের ঘুষ দিয়ে বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে জাতীয় গৃহায়ন থেকে হস্তান্তর প্রক্রিয়া ছাড়াই একতরফাভাবে নিজের নামে নামজারি করিয়ে নেন। নামজারির ক্ষেত্রে সেল পারমিশন, বিক্রেতার আবেদন থেকে শুরু করে অনেক বিধি-বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে কোন নিয়মই অনুসরণ করা হয়নি। বিক্রয় দলিলের মূল কপি ছাড়া সার্টিফাই কপি জমা দিয়ে নামজারি করা হয় বলেও অভিযোগ আছে। মূল কপি জমা দেয়া হলে ওসমানের ভুয়া স্বাক্ষর প্রমাণ হয়ে যাবে এ ভয়ও প্রতারক ভাড়াটিয়ার মাঝে কাজে করেছে। নিজ নামে নামজারির অনুমোদন নিয়ে ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলাম ২০০৭ সাল পর্যন্ত চুপচাপ থাকেন। ২০০৭ সালে ওসমানের বড় ছেলে হায়দার হোসেন ডেভেলপার দিয়ে বাড়িটি বহুতল ভবনে নির্মাণের জন্য ঘর ছেড়ে দিতে বললে ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলাম ঘরছাড়া নিয়ে নানা টালবাহনা করতে থাকে। পরবর্তীতে বাড়িটি জবর দখল করে রাখলে এক পর্যায়ে ভুয়া দলিলে নামজারির বিষয়টি জানাজানি হয়। প্লট মালিকের ছেলে হায়দার হোসেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের বরাবরে দলিল জালিয়াতির বিষয়টি জানিয়ে ভাড়াটিয়ার নামজারি বাতিলের আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ প্রায় চারবার শুনানি শেষে গত ২০০৯ সালের ৩ জুন ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলামের নামজারির আদেশ বাতিল করে প্লটের প্রকৃত মালিক ওসমানের নামে নামজারি বহাল রাখেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া পুনঃ আবেদন করলে কর্তৃপক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, "আপনার নামে নামীয় নামজারির বাতিল আদেশটি যথাযথ হয়েছে। এমতাবস্থায় নামজারির বাতিল আদেশ স্থগিত করার কোন সুযোগ নাই"। পরবর্তীতে হায়দার আলীর পক্ষে জবরদখলকারীকে উচ্ছেদের আবেদন করা হলে অপর একটি নোটিশে জবর দখলকারী তাজুলকে উচ্ছেদের আদেশ দেয়া হয়। পুরো বিষয়টি দেখাশোনা করেন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা উপ-পরিচালক একে এম টিপু সুলতান। বিবেচনার সুযোগ নাই, ভাড়াটিয়ার নামজারি বাতিল আদেশ যথাযথ বলার পরও অনিয়ম করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ মাত্র এক সপ্তা'র ব্যবধানে ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলামের কাছ থেকে মোটা অংকের বিনিময়ে নামজারি বাতিল আদেশ ও উচ্ছেদের চূড়ান্ত নোটিশটি স্থগিত করে দেয়া হয়। এই অনিয়মের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন বিদায়ী চেয়ারম্যান এম এম নিয়াজ উদ্দিন, মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন, উপ পরিচালক একেএম টিপু সুলতানসহ দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট। পরবর্তীতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার না পেয়ে ভুক্তভোগী হায়দার হোসেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। চেয়ারম্যান এম এম নিয়াজ বিষয়টি সমাধান করতে ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলীকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি করে দেন। কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৮ অক্টোবর উভয় পক্ষকে শুনানির জন্য ডাকা হয়। ওই দিন হায়দার হোসেন নিজেই হাজির হলেও ভাড়াটিয়া তাজুল ইসলাম হাজির হননি। বরং তার পক্ষে ভক্ত পরিচয়দানকারী সন্দ্বিপের এক চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। সুফি তাজুলের জীবদ্দশায় উক্ত চেয়ারম্যানই বার বার শুনানিতে অংশ নিচ্ছেন। গত ২৮ অক্টোবর শুনানির দিন তাজুলের পক্ষে এক সাবেক সচিব প্রধানমন্ত্রীর চাচা পরিচয়দানকারী এক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে তদবির করতে দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে হায়দার হোসেনের পক্ষে প্রতিবাদ করা হলে কমিটি পাশ কাটিয়ে হায়দার হোসেনের পক্ষের লোকজনের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন বলেও অভিযোগ আছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বক্তব্য লিখিতভাবে গ্রহণ করা হয়। বিধি-বিধান না মেনে শুনানির পর্যায়ে ফেলে রেখে এভাবেই প্লটের প্রকৃত মালিককে হয়রানি করা হচ্ছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে। নিয়ম না মেনে জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারেও রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কমিটির প্রধান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ভূমি ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলী শীর্ষ কাগজকে জানান বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আইনি জটিলতা রয়েছে। উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বোর্ড সভা হবে। এরপর সিদ্ধান্ত জানানো হবে। ভুক্তভোগী হায়দার হোসেন জানান, ভুয়া দলিলে নামজারি করার কারণে আজ আমাদের প্লটটি জবর দখল করে রাখা হয়েছে। শুনানিতে প্রতারক তাজুল একবারও মূল দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই শুনানিতে অংশ নিচ্ছে না। তারপরও তার পক্ষে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। তিনি জানান, তার দলিলে আমার পিতার কোন স্বাক্ষর নাই। ৭৪ সালের দলিল দেখিয়ে কোন সেল পারমিশন ছাড়াই কর্তৃপক্ষ তার নামে কিভাবে নামজারি করতে পারে। পরবর্তীতে আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি ধরা পড়ার পর তার নামজারি বাতিলও করা হয়। কিন্তু আবারো ঘুষ দিয়ে সেই চূড়ান্ত আদেশটি এক সপ্তা'র মধ্যে স্থগিত করে দেন কর্তৃপক্ষ। ঘুষ লেনদেন করে এভাবে চরম হয়রানি করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সেল পারমিশনে দুর্নীতি ঃ ৮৬ লাখ টাকা গচ্ছা

দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী সিন্ডিকেটের কারণে চট্টগ্রামের দুটি শিল্প প্লটের সেল পারমিশনে প্রায় ৮৬ লাখ টাকার আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। ২০০৯ সালে বড় ধরনের অনিয়মের এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরও মোটা অংকের বিনিময়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অভিযোগে জানা যায়, ২০০৮ সালে আজিজুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি চট্টগ্রামের হালিশহর হাউজিংয়ের চার নম্বর সড়কের বি ব্লকে পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি শিল্প প্লট কিনেন। এ সংক্রান্ত জাতীয় গৃহায়নে দু'টি ফাইল খোলা হয়। প্লট দুটির ফাইল নম্বর হলো ৮৬৫/৯৮ এবং এইচ ১৬/২০০১।

জানা যায়, ৮৬৫/৯৮ নথিভুক্ত শিল্পপ্লটটি ২০০৮ সালে মোঃ ফারুক জাহাঙ্গীর থেকে কিনেন আজিজুল ইসলাম। ওই বছর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ প্লটটির বিপরীতে সেল পারমিশন দেয় ৫৪ লাখ ৭ হাজার ৫০ টাকায়। একইভাবে এইচ-১৬/২০০১ প্লটটির সেল পারমিশন দেয়া হয় ৫২ লাখ ২৫ হাজার ৬শ' ৮৮ টাকায়। সেল পারমিশনের টাকা পরিশোধ না করে চট্টগ্রামে প্রশাসনিক কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ আলমগীরের মাধ্যমে এক বছরের মাথায় দু'টি প্লটের ক্ষেত্রে পুনরায় সেল পারমিশন নির্ধারণ করা হয়। আর এতে দুটি প্লটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মাত্র ১০ লাখ টাকা করে বিশ লাখ ২৫ হাজার টাকা। প্লট দু'টির বিপরীতে সরকারের গচ্ছা গেছে প্রায় ৮৬ লাখ টাকা। অথচ একই সময়ে যে সব সেল পারমিশন দেয়া হয় সে সবের ক্ষেত্রে এধরনের মূল্য কমানো হয়নি। জাতীয় গৃহায়নের মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন, সাবেক কর্মকর্তা রুহুল আমীন মুন্সী এবং চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আলমগীরের কারসাজিতে এই অপকর্ম করা হয়। এ দু'টি প্লটের ক্ষেত্রেও তারা ৫০ লাখ টাকা কমিশন ভাগাভাগি করে নিয়েছেন বলেও অভিযোগ আছে।

তাছাড়া জাতীয় গৃহায়নে সেল পারমিশন নিয়ে চলছে ব্যাপক ঘুষ দুর্নীতি। সেল পারমিশনের প্রত্যেকটি ফাইল চালাচালিতে মোটা অংকের ঘুষ আদায় করা হচ্ছে। জাতীয় গৃহায়নের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ছাড়াও ওই দায়িত্বে নিয়োজিত মিরপুর সেকশনের হুইপ রউফ এই অপকর্মের অন্যতম

হোতা বলে জানা গেছে। প্রত্যেকটি সেল পারমিশনে তিনি কমপক্ষে এক লাখ টাকা আদায় করেন। এর কম হলে সেল পারমিশনে দেয়া হয় না। টাকা না দেয়ায় তার কাছে অসংখ্য সেল পারমিশনের ফাইল আটকা রয়েছে। এসব ফাইল নিয়ে জনসাধারণের চরম ভোগান্তি হলেও কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই।

বিদায়ী চেয়ারম্যানের দুর্নীতি

সরকার দলীয় সমর্থক হিসাবে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে প্রায় আটমাস আগে নিয়োগ পান মোহাম্মদ নিয়াজ উদ্দিন। তার বড় পরিচিতি আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আহসান উল্লাহ মাস্টারের নিকটাত্মীয়। বাড়ি গাজীপুরে। যোগদানের পর থেকেই অপকর্ম করে তিনি দলীয় অবস্থার প্রতিদান দেন। চাকরির আট মাসের মাথায় অপকর্ম করে তিনি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে ঘুষের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেন। তার আমলে দুর্নীতিতে রেকর্ড গড়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। দুর্নীতির কারণে সম্প্রতি তাকে বদলি করা হলেও পরে এর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল পদে পদায়ন করে সরকার দুর্নীতির আরো একটি রেকর্ড গড়ে। মোটা অংকের ঘুষ তদবির এবং দলীয় লবিংয়ের জোরে দুর্নীতিবাজ সত্ত্বেও তাকে পুরস্কৃত করা হয় বলে অভিযোগ আছে। আরো ভাল পদে তার পদায়ন নিয়ে সর্বত্র ব্যাপক সমালোচনা চলছে।

জানা যায়, চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদানের পর নিয়াজ উদ্দিন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ব্যাপক বদলি বাণিজ্য করেন। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের হেড অফিস, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও বিভাগীয় শহরের অফিসগুলোতে ব্যাপক বদলি বাণিজ্য চলে তার আমলে। শুধু গৃহায়ন অফিসেই ৬০ কর্মচারীর বদলির ঘটনা ঘটে। ক্ষেত্র বিশেষ মোটা অংকের বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রমোশনও দিয়েছেন। চেয়ারম্যান পদ পাকাপোক্ত হওয়ার পর তিনি ঘুষের জন্য দলীয় স্ট্যান্ড থেকেও সরে যান। টাকা নিয়ে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও আশ্রয় প্রশ্রয় দেন। পিএস হিসাবে বেছে নেন বিএনপি সমর্থক মেহেদী হাসানকে। তার পরামর্শে ঘুষ নিয়ে সাবেক জোট সরকারের পূর্ত মন্ত্রী মীর্জা আব্বাসের নিয়োগকৃত অস্থায়ী ৭১ কর্মচারীকে স্থায়ী করার আদেশ দেন দুর্নীতিবাজ এই চেয়ারম্যান। পরবর্তীতে এ আদেশ নিয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি শেষে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায়।

অভিযোগ আছে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে প্লট বরাদ্দ, প্লট হস্তান্তর, দোকান বরাদ্দ, জমির ইজারা, বিকল্প প্লট বরাদ্দ, বাড়িঘর নকশা ছাড়, বদলি বাণিজ্য, চিঠি ইস্যু, নকশা প্রণয়ন লে-আউট প্ল্যান, নামজারির অনুমোদনসহ সব কাজে প্রত্যেক ফাইলেই তিনি ঘুষ নিতেন। ঘুষ ছাড়া কোন ফাইল সই করতেন না। তার পিএস মেহেদী হাসান এবং দুর্নীতিবাজ মোরাদ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তিনি এসব ঘুষের লেনদেন করতেন। পিএস মেহেদী হাসান বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আবদুস সালামের ভাতিজা। মীর্জা আব্বাস মন্ত্রী থাকাকালে মেহেদী হাসান দলীয় বিবেচনায় এখানে নিয়োগ পান। এদিকে ঘুষখোর চেয়ারম্যান পেয়ে এখানকার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারী সিন্ডিকেটও হন মহাখুশি। তারা দিন দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেন। ঘুষ দিয়ে একের পর এক অপকর্ম করতে থাকেন। মেস্বার ল্যান্ড মোরাদ সিন্ডিকেটও সমঝোতার মাধ্যমে ঘুষ দিয়ে চেয়ারম্যানের কাছ থেকে

কাজ আদায় করে নিতেন। ফলে চেয়ারম্যান ও তার সহযোগীরা অল্প সময়ে কোটি টাকার মালিক বনে যান। শুধু তাই নয়, চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পাবার পর তার ছোট ভাই জাতীয় গৃহায়নে দালালি করে গত আট মাসে অবৈধ উপার্জন করেন কয়েক কোটি টাকা।

অভিযোগ আছে, বিদায়ী চেয়ারম্যান যোগদানের অল্প ক'দিন পরে ২৯ জন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদে এককভাবে নিয়োগ দেন। এসব নিয়োগের পিছনে লেনদেন হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা। তাদের নিয়োগ পরীক্ষা বুয়েটের মাধ্যমে নেয়ার বিধান থাকলেও তিনি নিজেই পরীক্ষা গ্রহণ করে আলোচিত হন। তিনি নতুন ভবন ও লালমাটিয়ায় ফ্ল্যাট নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনিয়ম করেন। পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ দিয়ে মোটা অংকের কমিশন হাতিয়ে নেন। সর্বশেষ বিদায়ের একদিন আগে আগের তারিখ দেখিয়ে চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন প্রায় ৩০ কর্মচারী মাস্টার রোলে নিয়োগের আদেশ দেন। মাত্র ৫ জন ছাড়া বাকিদের নিয়োগ কার্যকর করে যেতে পারেন নি। এসব কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতে তিনি কয়েক লাখ টাকা করে হাতিয়ে নেন। তার ছোট ভাই এবং দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট এসব অবৈধ নিয়োগ অপকর্মের হোতা বলে জানা গেছে। বিদায়ের আগের দিন প্রার্থীদের দরখাস্তে নিয়োগ দেয়া হইল মর্মে স্বাক্ষর করেন তিনি। নতুন চেয়ারম্যান যোগদানের পর এসব নিয়োগ কার্যকর করা হয়নি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিদায়ী চেয়ারম্যানের দেয়া এসব নিয়োগ নিয়ে জাতীয় গৃহায়নে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। প্রার্থী ও তাদের আত্মীয়-স্বজন হয় নিয়োগ নয় টাকা ফেরত দেয়ার চাপ দিচ্ছে। দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট নতুন চেয়ারম্যানকে বুঝিয়ে এসব নিয়োগ কার্যকরের জোর তদবির চলছে বলেও অভিযোগ আছে।

এ ব্যাপারে নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান এম এ হান্নান শীর্ষ কাগজকে জানান বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ফাইল গায়েব

জাতীয় গৃহায়ন অফিস থেকে প্রতিনিয়ত ফাইল গায়েবের ঘটনা ঘটছে। অসংখ্য ফাইলের কোন হদিসও মিলছে না। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট বিভিন্ন আঞ্চলিক অফিস, বিভাগীয় অফিসের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল এখান থেকে গায়েব করে ফেলে। এরপর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নতুন করে আবার ফাইল তৈরি করা হয়। তাছাড়া এখানে টাকার বিনিময়েও প্রায় সময় ফাইল গায়েব করে ফেলা হয়। আবার টাকা না পেলে দুর্নীতিবাজ কর্মচারী সিন্ডিকেটও ফাইল লুকিয়ে রেখে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করে। গত ১১ নভেম্বর নামজারি সংক্রান্ত একটি ফাইল গায়েব হওয়ার ঘটনা ঘটে। ওই সময় দিনভর ফাইলটির তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হদিস মেলেনি। ফাইলটির জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে এক পরিচালকের কাছে তদবির করতে হয়। এখন পর্যন্ত ফাইলটি পাওয়া যায়নি। এধরনের ফাইল গায়েবের ঘটনা জাতীয় গৃহায়নে নতুন নয়। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িতদের কখনো শাস্তি দেয়া হয়নি। টাকা নিয়ে সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় গৃহায়নে ফাইল গায়েব করার মত অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। অভিযোগ আছে, গোলাম মর্তুজা নামের এক কর্মকর্তা চট্টগ্রামের উপ সহকারী প্রকৌশলী পদে থাকাকালীন সময়ে এখানকার অসংখ্য বরাদ্দ পত্রের ফাইল সরিয়ে ফেলেন। ওই সময়ে বিকল্প প্লট বরাদ্দ দেয়ার জন্য এসব ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়। হালিশহর হাউজিংয়ের জি ব্লকের ১৫টি বি ব্লকের ৩০টি ফাইলের হদিস পাওয়া যায়নি।

অপূর্ণাঙ্গ সিটিজেন চার্টার: তারও বাস্তবায়ন নাই

দীর্ঘদিন পর জাতীয় গৃহায়নে সেবা নির্দেশিকা নামে একটি সিটিজেন চার্টার টানানো হয়। কিন্তু এটিও অপূর্ণাঙ্গ বলে অভিযোগ আছে। কোন বিভাগে কতদিন ফাইল থাকবে তার একটি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হলেও এই নির্দেশিকায় কোথায় কী কাজ হয় তার কোন তথ্য নেই। তাছাড়া সেবা নির্দেশিকার কোন বাস্তবায়ন নেই জাতীয় গৃহায়নে। ফলে জনসাধারণকে বরাবরাই হয়রানির শিকার হতে হয়। নতুন চেয়ারম্যান এম এ হান্নানের যোগদানের পর সম্প্রতি জাতীয় গৃহায়নে এই নির্দেশিকা টানানো হয়।

জানা যায়, চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়াজ উদ্দিনের যোগদানের পরপরই তার নির্দেশে এখানকার সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট এই নির্দেশিকা সরিয়ে ফেলে। নির্দেশিকা না থকার সুবাদে এখানকার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারী দিনের পর দিন ফাইল আটকে রেখে ঘুষ দুর্নীতিতে লিপ্ত আছেন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে মাসের পর মাস টেবিলে ফাইল আটকে রাখা হলেও এসব ফাইলের কোন তদারকি নেই। টেবিলে কতদিন ফাইল থাকবে তার সময়সীমা বেধে দেয়া হলেও কর্মকর্তা-কর্মচারী কেউ তা মানতে রাজি নন। এখানকার একটি ফাইলেও সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয়না। কর্মকর্তা- কর্মচারীর টেবিলে পড়ে থাকা ফাইলের অনুসন্ধান চালালে তার প্রমান পাওয়া যাবে। ভুক্তভোগী এক ব্যক্তি জানান, সেবা নির্দেশিকা মেনে কাজ করলে অনিয়ম কমে যেতো। এখানে একটি কাজও ওই নির্দেশিকা মতে হয়না। তার তদারকিও করা হয়না। অফিস থেকে প্রতি সপ্তাহে নির্দেশিকা মত টেবিলে টেবিলে ফাইলের তদারকি করা হলে অনিয়মের ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসবে।

সেবা নির্দেশিকায় দেখা গেছে, জাতীয় গৃহায়নের প্রত্যেকটি কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। বন্ধক অনুমতিতে ১৭ দিন, রেজিষ্ট্রেশন করতে ৫০ দিন, দান হেবা অনুমতি নিতে ৫১ দিন, বিক্রয় অনুমতিতে ৪২ দিন, ভাঙা ও পুনর্নিমাণ ২০ দিন, খেলাপী কিস্তির টাকা জমা দেয়ার অনুমতি নিতে ২৩ দিন, নিম্নমান বাড়ি বরাদ্দ ৫০ দিন, আম মোক্তারনামা গ্রহণে ৪১ দিন, আধাপাকা টিনশেড বাড়ি বরাদ্দ ৫৩ দিন এবং নামজারি অনুমতি নিতে ৪০ দিনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ওই সব কাজ সম্পন্ন করতে জাতীয় গৃহায়নে সময় পার কয়েক বছর। তাও ঘুষ দিয়ে। অন্যথায় কোন কাজই আদায় হয়না।

জহিরুল ইসলাম নামের এক প্রবাসী অভিযোগ করেন, জাতীয় গৃহায়নে টানানো সেবা নির্দেশিকা ওই দেয়ালেই সীমাবদ্ধ। এর কার্যকর বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। তিনি জানান, ঘুষ নিয়েও যদি সেবা নির্দেশিকায় উল্লেখ্য নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে কাজ করা যেত তাহলে মানুষ অনেক হয়রানি থেকে পরিত্রাণ পেত। কারণ ঘুষ ছাড়া এখানে কাজ করা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

তিনি অভিযোগ করেন, তার সেল পারমিশনের একটি কাজে চেয়ারম্যানের অনুমতি, তারপর চিঠি ইস্যু, বিক্রেতাকে অফিসে হাজির করা, সেখান থেকে মিরপুর সার্কেলে সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত, এই রিপোর্ট নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে আনা, সেখান থেকে চিঠি ইস্যু বিভাগে নথিভুক্ত করা, সংশ্লিষ্ট কাজে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর গ্রহণ, চূড়ান্ত প্রতিবেদনসহ সবকিছু সম্পন্ন করতে লেগেছে প্রায় একবছর। সর্বশেষ চেয়ারম্যানের দফতরে গিয়ে তার ফাইলটি আটকে আছে।

অথচ এই কাজে তার লাগার কথা মাত্র ৪২দিন। সেবা নির্দেশিকা না মেনে এভাবেই লোকজনকে হয়রানি করা হচ্ছে।

মেম্বার ল্যান্ডের দুর্নীতি

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং দুর্নীতিবাজ অফিসারের নাম মোঃ মোরাদ হোসেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি চেয়ারম্যানের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান। ২০০৭ সালের ১৩ নভেম্বর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড হিসেবে যোগদান করেন। সেই থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তদবিরের জোরে সেই থেকে আজ অবধি তিনি একই পদে বহাল আছেন। তার মত এই অফিসে এক পদে টানা তিন বছর থাকার সুযোগ এর আগে আর কারো হয়নি। বহুবার তার বদলি আদেশ হয়েছে, কিন্তু অদৃশ্য ইশারায় তা আবার ঠেকেও গেছে। তিনি নির্দ্বিধায় ঘুষ খান আবার চাকরির সুবিধার্থে উপর মহলে কাড়ি কাড়ি ঘুষও দেন। অফিসে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিতি আছে। প্লট বরাদ্দসহ এই অফিসের সব কাজে তার একক নিয়ন্ত্রণ । তার সই ছাড়া এখানকার কোন ফাইল নড়েনা। ঘুষ নিয়ে আদালতের আদেশ অমান্য করে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্লট বিকল্প বরাদ্দ দেয়ার নজিরও আছে। এই অফিসে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠেছে একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী সিন্ডিকেট। অফিসের অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারী তার এই সিন্ডিকেটের সদস্য। এই অফিস ছাড়াও চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহীসহ বিভাগীয় পর্যায়ের অফিসেও সিন্ডিকেটের ডালপালা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ও এখানকার সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মী। যারা তার এই সিন্ডিকেটের বিরোধিতা করবেন তাদের কোন কারণ ছাড়াই বদলি করে শাস্তি দেয়া হয়। একইভাবে তার অধীনস্থ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদেরও কথায় কথায় বদলি করা হয়। আবার মোটা অংকের টাকা নিয়ে একই পদে বদলি করে নিয়ে আসার রেকর্ডও আছে তার ঝুলিতে। মোরাদ হোসেনের গ্রামের বাড়ি খুলনার খালিশপুরে। তিনি এখন নিজেকে শেখ হেলালের আত্মীয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক বলে পরিচয় দেন।

অভিযোগে জানা যায়, চাকরিতে যোগদানের পর হতে এই তিন বছরে ঘুষ-দুর্নীতি করে মোরাদ হোসেন নামে বেনামে এখন একশ' কোটি টাকার মালিক। গত তিন বছরে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তার নিয়ন্ত্রণে একাধিক বোর্ড সভা করে কমপক্ষে একশ' এর উপরে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বিকল্প বরাদ্দ দিয়ে দেন। এসব প্লট বিকল্প বরাদ্দের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে একাধিক মামলাও রয়েছে। এসব মামলায় বিকল্প প্লট বরাদ্দে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়। কিন্তু কে শুনে কার কথা। আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চেয়ারম্যানকে ঘুষ দিয়ে দুর্নীতিবাজ মোরাদ হোসেন বোর্ড সভা ডেকে এসব প্লট বিকল্প বরাদ্দ দিয়ে দেন। আর এসব বোর্ড সভা অনুষ্ঠান নিয়েও তার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আছে। প্রায় এগারজন সদস্য উপস্থিত থাকার বিধান থাকলেও তার অনুগত দুই তিনজন ছাড়া আর কাউকে রাখা হয়না।

জানা যায়, চট্টগ্রাম হলিশহর বি ব্লকের এক নম্বর রাস্তার ট্রেড স্কুল সংলগ্ন ছয় নম্বর প্লট- ১৯৯৯ সালে যথানিয়মে বরাদ্দ দেয়া হয় মাছুম রেজা নামের এক ব্যক্তিকে। তার মত জামিলুর রহমান, এবাদ উল্লাহসহ আরো প্রায় ৪৩ জনকে ১৯৯৮/৯৯ সালে যথা নিয়মে প্লট বরাদ্দ দেয়

হয় হালিশহর জি ব্লক, বি ব্লক ও ফিরোজশাহ কলোনিতে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ২১, নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৯ তম বোর্ড সভায় ঢাকা অফিসে টাকা জমা দেয়ার জন্য বরাদ্দপ্রাপ্তদের চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড হিসেবে যোগদানের পর ৫০ তম বোর্ড সভা ডেকে আগের বোর্ড সভায় কিস্তির টাকা জমা নেয়া সংক্রান্ত আদেশ স্থগিত করে দেন। এই স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মোঃ মাছুম রেজাসহ ৪৩ প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি চেয়ারম্যান, সচিব, মেম্বার ল্যান্ড মোরাদসহ ছয় কর্মকর্তাকে আসামী করে হাইকোর্টে পৃথক তিনটি রিট করেন। এসব মামলায় ২০০৮ সালে ৯ জুন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। উচ্চতর আদালতের এই আদেশ অমান্য করেই ঘুষ নিয়ে মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের নেতৃত্বে চেয়ারম্যানসহ অন্যদের ম্যানেজ করে পরবর্তী ৬৯ তম বোর্ড সভা ডেকে এসব প্লট থেকে বিকল্প বরাদ্দ দেয়া হয়। এভাবে প্রতিমাসে বোর্ড সভা করে ঘুষ নিয়ে বিকল্প বরাদ্দ অব্যাহত রয়েছে। ভুক্তভোগী মাছুম রেজার পক্ষ থেকে বিষয়টি জানিয়ে আদালতের আদেশ মেনে বিকল্প বরাদ্দ থেকে বিরত এবং দুর্নীতিবাজ মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ৩ মার্চ চেয়ারম্যান বরাবরে একটি লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়। কিন্তু চেয়ারম্যান অভিযোগের তদন্ত না করে মোরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে এই মোরাদ হোসেনকে দায়িত্ব দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ৪৩ জন সাধারণ ব্যক্তি প্রায় বার বছর ধরে একটি প্লটের মালিক হবেন এ আশায় এখানো ঘুরছেন কর্মকর্তাদের দ্বারে দ্বারে। মোরাদ হোসেন ও তার সিন্ডিকেটের অপকর্মে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে ঘুষ দুর্নীতির বাসা বেধেছে।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেন শীর্ষ কাগজকে জানান এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। এসব অভিযোগকে তিনি মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও উলেখ করেন।

দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট বেপরোয়া

দুর্নীতির কারণে চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের বিদায় ঘন্টা বাজলে তার উত্তরসূরী প্রভাবশালী দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা মোরাদ হোসেন, একেএম টিপু সুলতান, প্রকৌশলী এটিএম ওয়াহিদ আজহার, মোঃ হুমায়ুন কবির, প্রকৌশলী প্রফুল্ল চন্দ্র ভৌমিক, খন্দকার আকতারুজ্জামান, মোঃ সাজ্জাদ কবির, আল মামুন মোর্শেদ, প্রকৌশলী কাজী আবু হানিফ, মিরপুরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোরাদের সাবেক পিএস শাসসুল হুদা, অফিস সহকারী শামসুল হক মিরপুরের উচ্চমান সহকারী বনিক বাবু, ঢাকা সার্কেলের পাটোয়ারি, মিরপুর সেকশনের হুইপ রউফসহ অফিসের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনো বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় গৃহায়নে সমঝোতার ভিত্তিতে ঘুষ দুর্নীতির অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে জাতীয় গৃহায়নে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী সিন্ডিকেট। দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের বিদায়ের পর তার সহযোগী এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাদের অপকর্মের ব্যাপারে তদন্তও করা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় তারা দিন দিন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বরং আগের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ঘুষ দুর্নীতির অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আদালতের আদেশ অমান্য করে একতরফা ভাবে ঘুষ নিয়ে চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য স্থানে অসংখ্য প্লট বিকল্প দেয়ার নজিরও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অপকর্মে দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগী

জনসাধারণ। এ নিয়ে চাঁপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে জাতীয় গৃহায়নে। যে কোন মুহূর্তে এই জনক্রোধ বিস্ফোরণে পরিণত হতে পারে বলেও শংকা করা হচ্ছে।

এদিকে প্রায় পনের দিন আগে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে যোগ দিয়েছেন এম এ হান্নান। তার বাড়ি বর্তমান পূর্ত মন্ত্রী আবদুল মান্নানের এলাকায়। কর্মজীবনে সৎ হিসাবে তার ব্যাপক প্রচার রয়েছে। জাতীয় গৃহায়নের চেয়াম্যান পদে তার যোগদানের পর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীরা কিছুটা তটস্থ থাকলেও এখন তাকে নানাভাবে বিপথগামী করার চেষ্টা চলছে। কনভিন্স করতে না পারলে তাকে অকেজো কিংবা বদলি করার মিশন নিয়ে নেমেছে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটটি। তারা ইতিমধ্যে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সরকারের উপর মহলে জোর তদবির করছেন। এজন্য কোটি টাকা বরাদ্দও রাখা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে। জাতীয় গৃহায়নে ঘুষ-দুর্নীতি প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান এম এ হান্নান শীর্ষ কাগজকে বলেন, এখানকার ঘুষ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তার জানা আছে। দীর্ঘদিনের জঞ্জাল পরিষ্কার করে এই প্রতিষ্ঠানকে ঘুষ দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্ট চলছে। সবক্ষেত্রে সৎ থাকা গেলে একাজ সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন। তিনি জানান, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নামজারিসহ সব কাজ সম্পন্ন করতে একটি ফরমেট তৈরি করা হচ্ছে।

মামলার পর উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গৃহায়নের

বালু ভরাট করে শত কোটি টাকার সরকারি জলাশয় জবর দখলে নিয়েছে এটিএন বাংলা

রাতের আঁধারে বালু ভরাট করে অবৈধভাবে সরকারের শত কোটি টাকার প্রবহমান জলাশয় দখল করে নিয়েছে এটিএন বাংলা লিমিটেড। রাজধানীর মিরপুর রূপনগর (১ম পর্ব) এলাকায় অবস্থিত জাতীয় গৃহায়নের গেজেটভুক্ত সরকারি সম্পত্তিতে অবৈধ দখলের এ ঘটনা ঘটে। ৪০ কাঠা জমি নিজেদের দাবি করে তারা সেখানে সাইনবোর্ড টানিয়ে অবৈধ স্থাপনাও নির্মাণ করেছে। জবরদখল নিয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বাঁধা দেয়ার পরও কাজ অব্যাহত রাখা হলে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ দখলদার এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে পল্লবী থানায় পরপর চারটি জিডি ও সর্বশেষ জলাশয় আইনে মামলা করে। পরবর্তীতে বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হলে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে জবর দখলকারী এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেয়া হয়।

এদিকে পল্লবী থানায় চারটি জিডি এবং জলাশয় আইনে মামলার পরও স্থানীয় থানা-পুলিশ এবং জাতীয় গৃহায়নের রহস্যজনক নীরবতার কারণে মিরপুর এলাকার একমাত্র দশ একর সরকারি জলাশয়টি এটিএন বাংলা সাইন বোর্ড টানিয়ে দখল করে নিচ্ছে।

এ ব্যাপারে জাতীয় গৃহায়নের চেয়ারম্যান এম এ হান্নান শীর্ষ কাগজকে জানান, মিরপুর রূপনগরে অবস্থিত প্রবহমান জলাশয়টি সরকারি গেজেটভুক্ত জাতীয় গৃহায়নের সম্পত্তি। এটিএন বাংলা লিমিটেড কিংবা অন্য কারো ক্রয় সূত্রে এতে মালিকানা থাকার প্রশ্নই উঠে না। সম্প্রতি বালু ভরাট করে এটিএন বাংলা লিমিটেড অবৈধভাবে জলাশয়টি দখল করে নেয়। বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতেও এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ সংক্রান্ত চিঠি আামদের হাতে এসে পৌছার পর দখলকারদের বিরুদ্ধে জলাশয় আইনে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি জাতীয় গৃহায়ন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। জলাশয় উদ্ধারে চলতি সপ্তাহে উচ্ছেদ অভিযান চালানোর কথাও তিনি জানান। জাতীয় গৃহায়নের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, জলাশয় আইনে মামলা এবং মন্ত্রণালয়ের আদেশের পর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা ও ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগসহ সার্বিক বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যানের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, এ বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হলে চলতি সপ্তাহে দখলকার এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।

জাতীয় গৃহায়নের জিডি এবং লিখিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, মিরপুর রূপনগর এলাকার ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং সড়কের শেষ প্রান্তে একটি প্রবহমান জলাশয় রয়েছে। এটি বৃহত্তর মিরপুর এলাকা হতে তুরাগ নদী পর্যন্ত প্রবহমান। জলাশয় এলাকার সিএস দাগ নং ১২০২ মৌজা দ্বিগুণে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গেজেটভুক্ত ১৬.৮৫ একর সরকারি সম্পত্তি রয়েছে। গত আগষ্ট মাসে

এটিএন বাংলা লিমিটেড কর্তৃপক্ষ সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে রাতারাতি রূপনগরের ৩০,৩১,৩২,৩৩ নম্বর সড়কের শেষ প্রান্তে জাতীয় গৃহায়নের উক্ত সম্পত্তিসহ জলাশয়টিতে বালু ভরাটের কাজ শুরু করে। খবর পেয়ে গৃহায়নের মিরপুর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবু হানিফ টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এসময় তিনি এটিএন বাংলার দখলকারীদের বাধা প্রদান করেন। তারা বাধা না মেনে কাজ অব্যাহত রাখলে জাতীয় গৃহায়নের পক্ষে স্থানীয় পল্লবী থানায় এটিএন বাংলার জবর দখলের বিরুদ্ধে একটি জিডি করা হয়। পরবর্তীতে এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে একই থানায় গৃহায়নের পক্ষ হতে আরো পৃথক তিনটি জিডি দায়ের করা হয়। জিডি নং ৩৫১- তারিখ ৫/৮/১০,৬২১- তারিখ ৮/৮/১০, ১৩০৭- তারিখ ১৭/৮/২০১০ ও ১৫১৯- তারিখ ১৯/১০/২০১০। পরবর্তীতে এটিএন বাংলা কাজ অব্যাহত রাখলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দেয়। কিন্তু পল্লবী থানা মামলা না নিয়ে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে। এই সুযোগে এটিএন বাংলা সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে জলাশয়ের প্রায় দুই বিঘা জমি দখল করে নেয়। তারপরও তারা জলাশয়ে আরো জবরদখল অব্যাহত রাখলে মিরপুর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবু হানিফ সরজমিন পরিদর্শন করে এটিএন বাংলার জবরদখল এবং স্থানীয় থানায় জিডিসহ সার্বিক বিষয় জানিয়ে গত ৩১ অক্টোবর গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত প্রতিবেদন দেন। পরবর্তীতে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম এ হান্নান গত ৩১ নভেম্বর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করলে এটিএন বাংলা লিমিটেড এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে সরকারি জলাশয় উদ্ধারের আদেশ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের আদেশ পেয়ে সম্প্রতি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে জাতীয় গৃহায়নের মিরপুর ডিভিশনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী রিদওয়ান হোসেন পল্লবী থানায় জলাশয় আইনে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় আসামি করা হয়েছে এটিএন বাংলা এবং তাদের পক্ষে মাটি ভরাটের কাজে নিয়োজিত নুরু মোল্লা ও ওসি ফারুক গংকে। এ ব্যাপারে পল্লবী থানার ওসি ইকবাল হোসেন শীর্ষ কাগজকে জানান, অভিযোগের তদন্ত চলছে। জলাশয় ভরাটের স্থলে এটিএন বাংলা লিমিটেডের একাধিক সাইন বোর্ড দেখা গেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তবে ঘটনাস্থলে এটিএন বাংলার নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, সরকারী গেজেটভুক্ত গৃহায়নের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিসহ জলাশয়টি বালু দিয়ে ভরাট করে এটিএন বাংলা দখল করে নেয়। এসব এলাকায় একাধিক সাইন বোর্ডও দিয়েছে। জবর দখলে রাখা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে এটিএন বাংলার নিজস্ব অর্থায়নে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত রাখা হয়েছে। ৩০নং রোডের শেষ প্রান্তে জলাশয়ের প্রবেশ মুখে টিনশেড দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। দখলকৃত জমির কিছু অংশে নির্মাণ করা হয়েছে সেমিপাকা অবকাঠামো। পাশে নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য করা হয়েছে টিনশেড বসতঘর। মিরপুর ডিভিশনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হারিছ জানান, কয়েক মাস ধরে এটিএন বাংলা গৃহায়নের জলাশয়টি দখল করছে। ইতিমধ্যে দুই বিঘা দখল করে নিয়েছে। তারা আরো দখলের জন্য রাতের আঁধারে বালু ভরাটের কাজ করছে। তারা এতে টিনশেড ঘিরে দিয়েছে। সেখানে গড়ে তুলেছে সেমিপাকা অবকাঠামো। তাছাড়া টিনশেড ঘর নির্মাণ করে নিজস্ব অর্থায়নে এটিএন বাংলা নিরাপত্তাকর্মীও মোতায়েন করেছে।

এদিকে রূপনগরে অবস্থিত জলাশয়ের অধিকাংশ দখল করে এখন তুরাগ নদীর দিকে প্রবহমান অংশটিও দখল করা হচ্ছে। জলাশয়ের মধ্যে তাদের মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড গেড়ে দিয়েছে। এটিএন বাংলার সাইনবোর্ডে দাবি করা হয়েছে, এখানকার ৪০ কাঠা জমি তাদের। মৌজা দ্বিগুণ এর জে এল নং সিএস ২১৬, এসএ ৪১, আরএস ২০- ঢাকা সিটি জরিপ ০২, খতিয়ান নং পিএস ৬০৪, এসএঃ ৫১৩, আরএস ৩৮৫, আরএস মিউটেশন : ২২২৪, ১৬১৮, ঢাকা সিটি জরিপে ৭৪৩১ দাগের সিএস ও এসএঃ ১২০২, আরএস ২০৭৪, ঢাকা সিটি জরিপে ১৪২০১। জমির পরিমাণ ৪০ কাঠা বলে দাবি করা হয়। দখলকৃত সম্পত্তিতে এটিএন বাংলার নিয়োজিত নিরাপত্তাকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে শীর্ষ কাগজকে জানান, এটি এটিএন বাংলার কেনা সম্পত্তি। এখানে তাদের প্রায় ৯ বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। এখন মাত্র দুই বিঘা জমিতে বালু ভরাট হয়েছে। আরো বাকি সাত বিঘাতে বালু ভরাট করা হবে। অথচ তাদের ঝুলানো সাইনবোর্ডে জমির পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে 'এটিএন বাংলার কেনা মোট জমির পরিমান ৪০ কাঠা'। এ ব্যাপারে এটিএন বাংলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড.মাহফুজুর রহমান শীর্ষ কাগজকে জানান, জলাশয় দখল সংক্রান্ত গৃহায়নের অভিযোগ সত্য নয়। আমরা কেনা সম্পত্তি সংরক্ষণ করছি মাত্র। তিনি বলেন, এখানে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৯.০৬ পয়েন্ট। এর থেকে ১১.২২ পয়েন্ট সম্পত্তি সরকারের মালিকানায়। বাকি ৭.৮৬ পয়েন্ট সম্পত্তি অবমুক্ত আছে। এই অবমুক্ত সম্পত্তির মধ্যে ১৭ বিঘা আমরা কিনেছি। তিনি বলেন, আমারদের কেনা সম্পত্তি দখল করতে না পেরে ভূমিদস্যুরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এসব সম্পত্তি জাতীয় গৃহায়নের হলে তারা আদালতে মামলা করতে পারে।

অথচ গত ৩১ ডিসেম্বর গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম এ হান্নান স্বাক্ষরিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পাঠানো প্রতিবেদনে বলা হয়, মিরপুর রূপনগর এলাকায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গেজেটভুক্ত সম্পত্তির মধ্যে আনুমানিক দুই একর জলাশয় এটিএন বাংলা লিমিটেড : ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা নামে সাইনবোর্ড টানিয়ে (ছবি সংযুক্ত) ক্রয় সূত্রে মালিক দাবি করে অবৈধভাবে বালি ভরাট এবং অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। কিন্তু মিরপুরস্থ রূপনগর এলাকার সকল জমি জাতীয় গৃহায়নের গেজেটভুক্ত সরকারি সম্পত্তি (গেজেটের কপি সংযুক্ত)। উক্ত এলাকায় ৩০, ৩১,৩২, ও ৩৩ নং রাস্তার শেষ প্রান্তের (পশ্চিম পার্শ্বের) ১৬.৮৫ একর জমি দ্বিগুণ মৌজার সিএস ১২০২ দাগে অবস্থিত এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মূল নকশায় প্রায় দশ একর জমি জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত ও উক্ত জলাশয় দিয়ে মিরপুর এলাকার পয়ঃনিষ্কাশনসহ তুরাগ নদীতে পতিত হচ্ছে। প্রতিবেদনের দুই নম্বর প্যারায় এটিএন বাংলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলা হয় জলাশয়টি অবৈধ দখলের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, মিরপুর ডিভিশনের দফতর হতে প্রথম থেকেই বাধা প্রদানসহ পল্লবী থানায় একাধিক ডিজি এন্ট্রিসহ এফআইআর গ্রহণের অনুরোধ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। তবে অদ্যাবধি সংশিষ্ট থানা কর্তৃক কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে রাতের আঁধারে অবৈধভাবে বালু ভরাট ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে।

এর তিন নম্বর প্যারায় বলা হয়েছে, এটিএন বাংলাকে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কোন জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। তবে ড. মাহফুজুর রহমান, চেয়ারম্যান, এটিএন বাংলা কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর এটিএন বাংলার নামে ঢাকায় জমি বরাদ্দের জন্য একটি আবেদন দাখিল

করলে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এটিএন বাংলা লিমিটেড এর অনুকূলে জমি বরাদ্দের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪/০৬/২০১০ তারিখের শাখা ৭/ এল তেজ-৯/১০/১৬৪৫ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে তেজগাঁও শিল্প এলাকা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত নয় এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীনে বরাদ্দযোগ্য কোন খালি জমি নাই মর্মে মাঠ পর্যায়ে অফিস থেকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের তিন নম্বর প্যারায় বলা হয়, আলোচ্য জলাশয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বৃহত্তম মিরপুরের পানি তুরাগ নদীতে পতিত হয়। এ এলাকাটি গৃহায়নের মূল মাস্টার প্ল্যানের জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত করা আছে। যা কখনো বরাদ্দযোগ্য নয় বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, জলাশয়টি এই এলাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে রূপনগরসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পয়ঃনিষ্কাশিত পানি তুরাগ নদীতে পতিত হয়। তাছাড়া এলাকার লোকজন এই জলাশয় থেকে পানির চাহিদা মেটায়। অগ্নিকাণ্ডের মত দুর্ঘটনার সময় জলাশয়টি এলাকাবাসীর একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এটিএন বাংলার অবৈধ দখল থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই জলাশয়টি মুক্ত করা না গেলে পয়ঃনিষ্কাশন বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির পাশাপশি এই এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন-যাপন বিঘ্নিত হবে বলে এলাকাবাসী শঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

শাস্তির পরিবর্তে দফায় দফায় পুরস্কার দুর্নীতিবাজ নিয়াজ উদ্দিনের

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের একটি আলোচিত নাম মোঃ নিয়াজ উদ্দিন মিয়া। যোগদানের অল্পদিনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে ইতিহাস গড়েন তিনি। গৃহায়নের চেয়ারম্যান হিসেবে চাকরি করেন মাত্র দশ মাস। এই দশ মাসে ঘুষ, দুর্নীতি করে তিনি এখন শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিক বলে কথা উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। বিগত বছরগুলোতে তাকে কখনো পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দুর্নীতি করেও চাকরি জীবনের এই ক'টা বছরে তার জীবনে জুটেছে পদায়নের পুরস্কার। তাই যেখানে যান সেখানে ঘুষ, দুর্নীতি করতে তিনি কখানো নিরুৎসাহিত হননা। অতীত চাকরি জীবনেও তার দুর্নীতি নিয়ে অনেক কথা রয়েছে। তবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হন। যদিও এখানে চাকরি করেন মাত্র দশ মাস। কিন্তু, এই দশ মাস সময়ে তিনি যে নজির স্থাপন করে গেছেন তা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অতীত সব রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে।

অবশ্য, গৃহায়নে ঘুষ, দুর্নীতি গেড়ে বসায় সরকার এক পর্যায়ে এখান থেকে তাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ওএসডি করা হয়। সরকারের শুভাকাঙ্খীরা এই পদক্ষেপে সরকারের নীতি নির্ধারকদের প্রশংসা করেন। কিন্তু নিয়াজ উদ্দিনের ভাগ্যের চাকা থেমে থাকেনি। ওইসব নিন্দুকের দলকে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দিয়ে মাত্র কয়েকদিনের মাথায় নিয়াজ উদ্দিন মিয়া বাগিয়ে নেন গৃহায়নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং বীমা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদ। ওই প্রতিষ্ঠানেও যোগদানের অল্পদিনের মাথায় তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়। মনে করা হয়, এইবার বুঝি নিয়াজ উদ্দিন পোস্টিং সমস্যায় পড়বেন কিন্তু না বরং আগের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিয়ে সরকার তাকে পুরস্কৃত করে। অবাক হন সমালোচকরা।

জাতীয় গৃহায়নে নিয়োগ বাণিজ্য

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদানের পর নিয়াজ উদ্দিন প্রথমে অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে সদস্য (প্রশাসন) মোঃ আকতারুজ্জামান, তৎকালীন সদস্য (ভূমি) মোরাদ হোসেন, সদস্য (প্রকৌশল) খন্দকার আকতারুজ্জামান, তৎকালীন সচিব মোঃ আজহারুল হক, উপ-পরিচালক আইয়ুব আলীর মত সুবিধাভোগীদের হাত করে নেন। তারপর করতে থাকেন একরে পর এক অপকর্ম। এসব অপকর্মের মধ্যে নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্য এবং প্রমোশন বাণিজ্য ছিল অন্যতম। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, চেয়ারম্যান পদে যোগদানের পর নিয়াজ উদ্দিন তার আস্থাভাজন অফিসারদের সম্মতি আদায় করে প্রথমে ২২ জনকে নিয়োগ দেন। সহকারী প্রকৌশলী এবং হিসাব সহকারী ও অফিস সহকারী পদে এসব লোক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রত্যেক নিয়োগে নেয়া হয় তিন লাখ টাকার উপরে। তার পিএস মেহেদী হাসানের মাধ্যমে ঘুষের এই টাকা সংগ্রহ করা হয়। তাকে সহায়তা করেন চেয়ারম্যানের পিয়ন তাজু এবং ড্রাইভার স্বপন। তারপর ঘুষের এই টাকা

নিয়োগ কমিটির কাছে পদ অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া হয়। এই নিয়োগে চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন এককভাবে বিশ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিয়োগ বাণিজ্যের পর করেন ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ বাণিজ্য। জোট সরকার আমলের পূর্তমন্ত্রী মীর্জা আব্বাসের নির্দেশে বিএনপি নেতা আবদুস সালামের ভাতিজা বর্তমান চেয়ারম্যানের পিএস মেহেদী হাসান, মীর্জা আব্বাসের ওই সময়ের সহকর্মীর বোনসহ বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত এই ৭২ জনকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। জোট সরকার বিদায়ের পর বঞ্চিত প্রার্থীরা ওই নিয়োগের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলা নিস্পত্তি না হওয়ার আগেই সরকার সমর্থক হওয়ার দাপট দেখিয়ে নিয়াজ উদ্দিন তাদের চাকরী স্থায়ী করার আদেশ দেন। বিনিমিয়ে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আদায় করেন এক লাখ টাকা করে, এমন অভিযোগ উঠে। এভাবে চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয় জাতীয় গৃহায়নে। বিষয়টি নিয়ে এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ দেয়া হয়। কিন্তু সরকার সমর্থিত লোক হওয়ার সুবাদে উচ্চ পর্যায়ে তদবির করে সেই যাত্রায় নিজেকে রক্ষা করেন। তবুও তার দুর্নীতির মাত্রা কমেনি।

চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন আট মাসের মাথায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিয়োগ কমিটির সদস্যদের বশীভূত করে আবারো নিয়োগ বাণিজ্য শুরু করেন। অবৈধভাবে ২ জন কর্মচারী এবং ৩৫ জন এমএলএসএস নিয়োগ দেন। এদের কাছ থেকে পিএস মেহেদী হাসানের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা করে ঘুষ নেয়া হয়। মেহেদী হাসান তার ওই সময় ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে (০১৭১৬০৩০৩২৮) এসব তদবিরের অধিকাংশ টাকা সংগ্রহ করেন। বর্তমানে এটি বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে কমিটির (মন্ত্রণালয়ের দু'জন প্রতিনিধি) দু'সদস্য অনিয়ম অবহিত করে নিয়োগ বাতিলের আবেদন জানালে গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয় এটি প্রথমে স্থগিত, পরে বাতিল করে দেন। কিন্তু চেয়ারম্যান এই বাতিল আদেশ উপেক্ষা করে নিয়োগকৃতদের হাতে নিয়োগ পত্র ইস্যু করেন।

অভিযোগ আছে, বিদায়ের আগ মুহূর্তেও নিয়াজ উদ্দিন বড় অংকের ঘুষ নিয়ে এককভাবে ৩৫ জনকে মাস্টার রোলে চাকরি দেন। নিয়োগকৃত এসব মাস্টার রোলের চাকরিজীবী প্রতিদিন হাজিরা দিলেও তাদের কাজকর্ম ও বেতন দেয়া হয়নি। নিয়োগকৃত অধিকাংশ প্রার্থী এখানকার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের আত্মীয় স্বজন। এই নিয়োগে দালালি করে নিয়াজ উদ্দিনের ছোট ভাই বাবলু প্রার্থীদের কাছ থেকে বড় অংকের ঘুষ হাতিয়ে নিয়েছেন। নিয়োগকৃতদের মধ্যে জাতীয় গৃহায়নের বিতর্কিত সদস(প্রশাসন) মোঃ আকতারুজ্জামানের ভাতিজা মুহাম্মদ জাহাঙ্গির হোসেন, পিএস মেহেদী হাসানের ৫ জনসহ দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের পছন্দের লোকজন রয়েছেন।

এছাড়া নিয়াজ উদ্দিন জাতীয় গৃহায়নে বিধি বহির্ভূত ভাবে ১০৫ জন মাস্টার রোলের কর্মচারীকে ওয়ার্কাচার্জ কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দেন। অথচ ওয়ার্কচার্জ কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। নিয়োগকৃতদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পনের থেকে বিশ হাজার টাকা করে ঘুষ নিয়ে এই নিয়োগ দেয়া হয়।

টেন্ডার বাণিজ্য
শুধু নিয়োগ বাণিজ্যই নয়, জাতীয় গৃহায়নের যাবতীয় টেন্ডার বাণিজ্যের নেপথ্যেও ছিলেন চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন। সরকারের অর্থ ক্ষতি করে পছন্দের ঠিকাদারদের কাজ দেয়ায় এসব প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিয়াজ উদ্দিনের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে মৌলভীবাজার মাটি ভরাট প্রকল্পের কাজ দেয়া হয় তার পছন্দের ঠিকাদারকে। এবং ওই প্রকল্পের নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত আরো বাজেট অনুমোদন দেয়া হয়। একইভাবে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এফ ব্লকের প্রকল্প কাজ দেয়া হয় সরকার দলীয় এমপি এনামুল হকের প্রতিষ্ঠান এনা প্রপ্রার্টিজকে। এভাবে জাতীয় গৃহায়নের চলমান প্রকল্প আসাদ টাওয়ার, লালমাটিয়ার ১৮২ ফ্ল্যাট প্রকল্প, মিরপুরের ৩৬০ ফ্ল্যাট প্রকল্প, আনন্দনগর ফ্ল্যাট প্রকল্পসহ একাধিক কাজ নামেমাত্র টেন্ডার দেখিয়ে পছন্দের ঠিকাদারকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি টেন্ডার কাজে জাতীয় গৃহায়নের সদস্য (প্রকৌশল) খন্দকার আকতারুজ্জামান ও পিএস মেহেদী হাসানের অবৈধ হস্তক্ষেপ চলে। তবে এরা কাজ করেন চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি হিসেবেই।

প্রমোশন বাণিজ্য
চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের আমলে প্রমোশন বাণিজ্যের রেকর্ড গড়ে জাতীয় গৃহায়ন। ঘুষ নিয়ে বিধি বহির্ভুতভাবে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এক লাফে নির্বাহী প্রকৌশলী আবার উপ-সহকারী প্রকৌশলী থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে প্রমোশন দেন একাধিককে। এসব প্রমোশন থেকে নিয়াজ উদ্দিন হাতিয়ে নেন বড় অংকের অর্থ। এই অবৈধ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সদস্য (প্রকৌশল) খন্দকার আকতারুজ্জামান, সদস্য (প্রশাসন) মোঃ আকতারুজ্জামান, ঢাকা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ওয়াহিদ আজহার, পিএস মেহেদী হাসান। জানা গেছে, চেয়ারম্যান হিসাবে ক্ষমাতার অপব্যববহার করে নিয়াজ উদ্দিন দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের সুপারিশের ভিত্তিতে একাধিক উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সরাসরি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে প্রমোশন দেন। এসব প্রমোশনে সরকারের যথাযথ নিয়ম মানা হয়নি। পদোন্নতি প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন সাইদ রেজা, পরিমল কুড়ি, শামসুল আলম প্রমুখ। সাইদ রেজা বর্তমান খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিমল কুড়ি মোহাম্মদপুর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং শামসুল আলম মোহাম্মদপুর ডিভিশনে দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে নিয়ম নীতি না মেনে উপসহকারী পদ থেকে প্রায় ২০ জন কর্মকর্তাকে অবৈধভাবে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। তার মধ্যে রয়েছেন নজরুল ইসলাম, নওরোজ হোসেন, মুহাম্মদ আবদুল অদুদ প্রমুখ। নজরুল ও নওরোজ চট্টগ্রামে এবং অদুদ সিলেটে কর্মরত আছেন।

বদলী বাণিজ্য
চেয়ারম্যান নিয়াজউদ্দিন বদলি বাণিজ্যের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেশি হয়রানি করেন। এ কাজে বড় অংকের ঘুষও আদায় করেছেন তিনি। তার আমলে জাতীয় গৃহায়নে বদলি বাণিজ্য করে অস্থিরতা তৈরী করা হয়। কথায় কথায় বদলি করা হয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের । আবার টাকা নিয়ে অল্পদিনের মাথায় একই পদে নিয়েও আসা হয়। তার আমলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের হেড

অফিস, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও বিভাগীয় শহরের অফিসগুলোত ব্যাপক বদলি বাণিজ্য চলে। শুধু গৃহায়নের হেড ৬০ কর্মচারীর বদলির ঘটনা ঘটে।

দুর্নীতি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত
বিদায়ী চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানা দুর্নীতি নিয়ে সপ্তাহিক শীর্ষ কাগজে সংবাদ প্রকাশের পর সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় খবর নিতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় গৃহায়নের চেয়ারম্যান এম এ হান্নান জানান, আগের নিয়োগ নিয়ে মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা সহযোগিতা করছি মাত্র। তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে রাজি হন নি।

সিন্ডিকেটের প্রমোশন ও নিয়োগ বাণিজ্যঃ অপকর্ম করেও পুরস্কার!

সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে অনিয়ম, ঘুষ দুর্নীতি বেড়ে চলছে। শীর্ষ কর্মকর্তাদের দু'একজনের প্রশ্রয়ে এখানে যে নিয়োগ ও প্রমোশন বাণিজ্য, অনিয়ম হয়রানি চলছে তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগী সাধারণ। দিন দিন এখানকার দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে।

জানা গেছে, এসব অপকর্মের সমন্বয় করতে এ প্রতিষ্ঠনে গড়ে উঠেছে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেটই নিয়ন্ত্রণ করছে গৃহায়নের অধিকাংশ কাজ-কারবার। এতে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

শীর্ষ দু'কর্মকর্তার প্রশ্রয়ে

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়াজ উদ্দিন এবং সদস্য (ভূমি) মোরাদ হোসেন এখন নেই। কিন্তু, তাই বলে এখানকার অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ নেই। প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সদস্য মোঃ আকতারুজ্জামান এবং একই বিভাগের অধীনস্থ পরিচালক সাজ্জাদ কবির বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অনিয়ম-দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সাবেক চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের আমলে জাতীয় গৃহায়নে নিয়োগ নিয়ে যত অনিয়ম দুর্নীতি হয়েছে তাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দু'কর্মকর্তা সরাসরি জড়িত ছিলেন। এরপর থেকে এখনো তারা এখানকার প্রশাসনিক কাজ-কারবার, বদলি ও প্রমোশনসহ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। তাদের ইশারায় অনেক সময় প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্তমান চেয়ারম্যানকে অবহিত করা হয় না। তাকে অন্ধকারে রেখে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরে সুযোগ বুঝে বাস্তবায়ন করে থাকেন। জাতীয় গৃহায়নের নিয়োগ, বদলি, পদায়ন ও প্রমোশন বাণিজ্য করে দু'কর্মকর্তা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।
জানা গেছে, প্রায় দু'বছর আগে জাতীয় গৃহায়নের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের সদস্য হিসেবে যোগ দেন মোঃ আকতারুজ্জামান। দেড় বছর আগে পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ পদে যোগ দেন সাজ্জাদ কবির। পূর্তমন্ত্রী এবং বর্তমান চেয়ারম্যানের এলাকার লোক হওয়ায় সাজ্জাদ কবিরের বর্তমানে এই অফিসে ক্ষমতার দাপট একটু বেশি। ক্ষেত্র বিশেষ বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান চেয়ারম্যানকে তিনি উপদেশ পরামর্শ দেন বলেও কথা উঠেছে। আর এ কারণেই প্রতিষ্ঠানের ওপর তার প্রভাব বেশি।

নিয়োগ বাণিজ্য

তৎকালীন চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনকে দিয়ে এই সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করতো। এসব নিয়োগে চলত বড় অংকের ঘুষ বাণিজ্য। নিয়াজ উদ্দিন মিয়ার আমলে এ খাতে সিন্ডিকেটের সদস্যরা বড় অংকের টাকা আয় করেছেন। বিনিময়ে কারো কারো চাকরির সুযোগ হয়েছে, আবার কারো হয়নি। চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনের বিদায়ের আগে জাতীয় গৃহায়নের লোক নিয়োগে ব্যাপকহারে অনিয়ম হয়। দশটি পদে ১১৩ জনের নিয়োগ চূড়ান্ত করেন চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন। সবক'টি পদে ঘুষের লেনদেন হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের প্রভাবশালী সদস্য আকতারুজ্জামান ও পরিচালক সাজ্জাদ কবির। নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও পরে নিয়ম মানা হয়নি। গৃহায়নের গঠিত নিয়োগ কমিটির ৯ সদস্যের মধ্যে ৭ জন জাতীয় গৃহায়নের হওয়ার সুবাদে ঘুষ নিয়ে বিধি-বিধান পাশ কাটিয়ে কমিটির সদস্য আকতারুজ্জামান তার পছন্দ মত লোকজনের নিয়োগ চূড়ান্ত করেন। এই নিয়োগ নিয়ে গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বরাবরে অভিযোগ দেয়া হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিতাদেশের পর মন্ত্রণালয় থেকে এক পর্যায়ে তা বাতিল করা হয়। তারপরও বিদায়ী চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আকতারুজ্জামান ও সাজ্জাদ কবিরের পরামর্শে মন্ত্রণালয়ের বাতিল আদেশ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় দফা ঘুষ নিয়ে এমএলএসএস সহ বিভিন্ন পদে বেশ কিছু প্রার্থীর নামে নিয়োগ পত্র ইস্যু করেন। প্রার্থীরা নিয়োগপত্র হাতে পেলেও নিয়াজ উদ্দিনের বিদায়ের পর নতুন চেয়ারম্যানের অধীনে চাকরিতে যোগ দিতে পারেন নি। বর্তমান চেয়ারম্যান অবৈধ নিয়োগের বিষয়টি পরবর্তীতে বহাল রাখেননি। ফলে নিয়োগকৃতরা বিপাকে পড়ে যান। কিন্তু এসব প্রার্থী বলছেন, মন্ত্রণালয় তাদের নিয়োগ বাতিলের ক্ষমতা রাখে না। বরং বাতিলের সুপারিশ করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র এখতিয়ার জাতীয় গৃহায়নের। কিন্তু বিধিটি অনুসরণ করা হয়নি। তাদের বক্তব্য, ঘুষ-দুর্নীতি যেভাবেই হোক এসব প্রার্থীদের নামের যেন জাতীয় গৃহায়নের নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়। এসব নিয়োগ পত্র দিয়ে তারা এখন চাকরিতে যোগ দিতে প্রাণপণ চেষ্ট করছে। তাতে সহযোগিতা করছে সিন্ডিকেটটি।

এছাড়া ২০১০ সালের মার্চ মাসে একইভাবে জাতীয় গৃহায়নের উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে ১১ জন এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৯ জনের নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম করা হয়। এর সঙ্গেও জড়িত ছিলো সেই সিন্ডিকেট। সাবেক চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিনকে দিয়ে বিদায়ের শেষ দিনে আগের তারিখ দেখিয়ে নিয়োগ পত্র ইস্যু করে আরো ৩৫ জনকে মাস্টার রোলে নিয়োগ দেয়া হয়। তড়িঘড়ি করে তাদের দরখাস্তের উপর 'নিয়োগ দেয়া হইল' বলে সই করেন চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন। প্রত্যেকের কাছ থেকে ২-৩ লাখ টাকা করে ঘুষ নেয়া হয়। নিয়াজ উদ্দিনের বিদায়ের পর এম এ হান্নানের যোগাদানের পর এই নিয়োগ আর কার্যকর করা হয়নি। মাস্টার রোলে চাকরির জন্য বড় অংকের ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলেও কাজে যোগ দিতে পারেন নি এসব প্রার্থী। চাকরিতে যোগ দিতে তারা প্রতিদিন জাতীয় গৃহায়নে ধরনা দিচ্ছেন। এসব প্রার্থীর মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন বেশি। তারা জীবন জীবিকার তাগিদে একটি চাকরির জন্য ধার নিয়ে কেউবা শেষ সহায় সম্বল বিক্রি করে ঘুষের টাকা যোগান দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তাদের চাকরি হয়নি। চাকরির আশায় তারা এখনো জাতীয় গৃহায়নে ঘুরছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, জাতীয় গৃহায়নে ঘুষ ছাড়া চাকরি হয় না। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। তাই বাধ্য হয়ে সব কিছু নিঃস্ব করে ঘুষের টাকা যোগাড় করেছি। আমাদেরতো কোন দোষ নেই। নতুন চেয়ারম্যান চাইলে আমাদের মাস্টার রোলে চাকরি দিয়ে দয়া দেখাতে পারেন। চাকরি নেই, ঘুষের টাকাও ফেরত পাচ্ছি না। এমনি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে মাস্টার রোলের প্রার্থীরা। তাছাড়া ঘুষের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্রমোশন-পদায়ন বাণিজ্য

পদায়ন-প্রমোশন নিয়ে অনিয়মের রেকর্ড গড়েছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। বিদায়ী চেয়ারম্যানকে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করে পদায়ন-প্রমোশনে ব্যাপক অপকর্ম করেন এরা। জাতীয় গৃহায়নের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সহকারী প্রকৌশলীর শূন্য পদের এক তৃতীয়াংশ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হতে পদোন্নতির বিধান থাকলেও তা মানা হয়নি। ঘুষ নিয়ে ৬ জনের স্থলে ১৫ জনকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। তাতেও জুনিয়র-সিনিয়র মানা হয়নি। ২নং সিরিয়ালে থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে বাদ দিয়ে ৪৯ নম্বর সিরিয়ালের অধিকারী উপ-সহকারী প্রকৌশলী উম্মে জহুরা মৌসুমীকে পদোন্নতি দেয়া হয়। একইভাবে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর শূন্য পদে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে ন্যূনতম পাঁচ বছর চাকরি করার পর পদোন্নতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি। যশোরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী দীপক কুমারকে এক ধাপ ডিঙ্গিয়ে সরাসরি উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া সিনিয়রদের ডিঙ্গিয়ে হিসাব সহকারী পদ থেকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে জুনিয়র মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে। সরকার পক্ষে অপশন প্রদানকারী কর্মচারী মোঃ মনসুর আলম ও জিন্নাত আলীকে মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত ছাড়াই ক্যাশিয়ার হিসেবে প্রমোশন দেয়া হয়। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে নেয়া হয় বড় অংকের ঘুষ। আকতারুজ্জামান ও সাজ্জাদ কবির ঘুষ নিয়ে দুদকের মামলার আসামি অফিস সহকারী মোঃ সাইদুর রহমানের বরখাস্ত আদেশ বাতিল করে কাজে যোগ দেয়ার সুযোগ করে দেন বলে অভিযোগ আছে। বর্তমানে তিনি অত্র অফিসের ভূমি বিভাগে কর্মরত আছেন। রাজশাহীতে চাকরিকালে সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ম. শফিউদ্দিন আহমেদের তদন্ত রিপোর্টের আলোকে সাইদুর রহমানকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। মামলা থেকে খালাস পবার আগেই আকতারুজ্জামান তার বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে তাকে বদলির ব্যবস্থা করেন।

আকতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, ঘুষ নিয়ে জাতীয় গৃহায়নের সদস্য (ভূমি ও সম্পত্তি) পদে একই সময় আকলিমা খানম এবং তাসলিমা জান্নাত আরজুকে পদায়ন করেন। একই পদে দু'জনের একসঙ্গে পদায়ন নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিযোগ রয়েছে, আকলিমা খানম থেকে সরাসরি ঘুষ নেন বিদায়ী চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন, আর তাসলিমা আরজুর কাছ থেকে নেন আকতারুজ্জামান নিজেই। পরবর্তীতে তদবিরের লড়াইয়ে আরজু হেরে যান। বহাল রাখা হয় আকলিমাকে।

অপকর্মের পরও পুরস্কার

নানা অপকর্ম করেও ভাল এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক স্থানে বদলি করার ইতিহাস রয়েছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের। ঘুষ তদবিরের জোরে দীর্ঘদিন ধরে এখানে এসব অপকর্ম চললেও কর্তৃপক্ষ নীরব রয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত আছে সিন্ডিকেটটি। শুধু তাই নয়, শাস্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত তদন্ত রিপোর্টকে পাশ কাটিয়ে কুমিল্লার দুর্নীতিবাজ এক কর্মচারীকে চট্টগামের মত ভাল জায়গায় বদলি করে অপকর্মের পুরস্কার দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

চট্টগ্রাম সার্কেলের আওতাধীন কর্মরত কর্মচারী রফিক উল্লাহ, অশোক কুমার কর্মকার, মোঃ সালাহ উদ্দিন ও বেলাল হোসেনের বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতি, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মারধর, প্লট-ফ্ল্যাট দখল করে কর্মচারী লীগের অফিস স্থাপন, ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রণসহ নানা অপকর্মের একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে সার্কেল অফিসে। এসব অপকর্মের মূল হোতা ছিলেন কুমিল্লা থেকে সম্প্রতি বদলি হওয়া কর্মচারী রফিক উল্লাহ। তার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের কর্মচারী অশোক কুমার কর্মকার, ড্রাইভার মোঃ সালাহ উদ্দিন, বেলাল হোসেন এসব অপকর্মে লিপ্ত রয়েছেন। তারা এ কাজে দীর্ঘদিন ধরে বহিরাগত সন্ত্রাসীও ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কুমিল্লায় বদলি হওয়ার পরও চট্টগ্রামের বরাদ্দ বাসা না ছেড়ে রফিক উল্লাহ সপ্তা'র চার দিন চট্টগ্রামে অবস্থান করে এসব অপকর্মে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা অফিসে গিয়ে হাজিরা দেন। এসব অপকর্ম চলছিল খোদ জাতীয় গৃহায়নের প্রশাসনিক দপ্তরের কেন্দ্রীয় সিন্ডিকেটের প্রত্যক্ষ মদদে। কুমিল্লায় চাকরিকালীন সময়ে রফিক উল্লা চট্টগামে অবস্থান করে প্রায় সময় অন্যায় আবদার নিয়ে চট্টগ্রামে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় অবরোধ, লাথি মারাসহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দেন। সর্বশেষ গত বছরের ৩০ অক্টোবর রফিক উল্লার ইঙ্গিতে একদল বহিরাগত সন্ত্রাসী চট্টগ্রাম সার্কেলের কর্মচারী বাবুল হোসেন বিশ্বাস, মোঃ মাসুদুর রহমান, তানজেল হোসেন, সুব্রত বড়ুয়া, সমাপন খীসা, নুরুল আমীন ও ইয়াছিনের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে আহত করে। এ ঘটনায় দৈনিক সমকাল, পূর্বকোণসহ পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে মারধরের ঘটনা এবং নানা অপকর্ম সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত করা হয়। তদন্তে কুমিল্লার কর্মচারী রফিক উল্লা, চট্টগ্রাম অফিসের কর্মচারী অশোক কুমার, মোঃ সালাহ উদ্দিন ও বেলাল হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি রিপোর্টও পেশ করা হয়। রিপোর্টের আলোকে চট্টগ্রাম সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সোহরাব হোসেন এসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে ২০১০ সালের ৩ নভেম্বর জাতীয় গৃহায়নের চেয়ারম্যান বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু চিঠিটি অজ্ঞাত কারণে চেয়ারম্যান পর্যন্ত পৌঁছানো হয়নি বলে অভিযোগ আছে।

মজার ব্যাপার হলো, অপকর্মের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও বরং অভিযুক্তদের পুরস্কৃত করা হয়। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে রফিক উল্লাকে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। তাও নির্বাহি প্রকৌশলীর দপ্তরের নিম্নমান সহকারী হিসাবে। বহাল রাখা হয় অশোক কুমার কর্মকার, সালাহ উদ্দিনদের। জাতীয় গৃহায়নের প্রশাসনিক শীর্ষ দু' কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করার ফলে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনকি বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যানকে অন্ধকারে রাখা হয়। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান এম.এ হান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি শীর্ষ কাগজকে জানান, এ ধরনের ঘটনা তার জানা নেই। এ সময় সাজ্জাদ কবিরও উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে সাজ্জাদ কবির নিজেই বিষয়টি একটি সাধারণ ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে গত ৩ নভেম্বর পাঠানো চট্টগ্রাম সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর গোপন চিঠির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। ফলে রফিক উল্লা ও তার সহযোগীরা এখন নতুন উদ্যমে চট্টগ্রাম সার্কেলে অপকর্মের মহোৎসবে মেতে উঠেছে। অসহায় ও জিম্মি হয়ে আছে ভুক্তভোগী সাধারণ কর্মচারীরা। শাস্তির বদলে পুরস্কারের ঘটনায় চট্টগ্রাম সার্কেলে কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করছে।

বাসা বরাদ্দে বাণিজ্য

নিয়োগ, বদলি, পদায়ন-প্রমোশন বাণিজ্যের মত বাসা বরাদ্দে অনিয়মের সঙ্গেও জড়িত আকতারুজ্জামান। তিনি ঢাকার বাসভবন বরাদ্দ কমিটির সভাপতি হওয়ার সুবাদে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিধি বহির্ভূতভাবে অসংখ্য বাসা বরাদ্দ দিয়েছেন। প্রতিটি বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্র বদল হলেও আকতারুজ্জামানের প্রশ্রয়ে ঢাকার বরাদ্দকৃত বাসা ছাড়েন নি অনেকেই। আবার অনেকেই বাসা বরাদ্দ নিয়ে ভাড়া বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রতিমাসে কমিশনের একটি অংশ পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। একাজে সহয়তা করেন অফিস সহকারী আবদুর রশিদ।

অভিযোগ আছে, সেগুনবাগিচাস্থ টিনশেডের এক নম্বর বাসা হিসাব সহকারী মোঃ মতিয়ার রহমানকে বরাদ্দ দেয়া হয়। এক বছর আগে তাকে বদলি করে দিনাজপুরে দেয়া হলেও তার বাসার বরাদ্দ এখনো বাতিল করা হয়নি। একইভাবে টিনশেড এর দুই নম্বর বাসা বরাদ্দ দেয়া হয় কেয়ারটেকার মনিরুজ্জামানকে। কিন্তু তিনি ওই বাসা ভাড়া দিয়ে মিরপুরের ১৪ নম্বর সেকশনে নিজস্ব বাসায় বসবাস করেন। মিরপুরের ১৯ নম্বর বাসাটি বরাদ্দ দেয়া হয় অডিটর উজ্জ্বলকে। কিন্তু তিনি ব্যাচেলর হওয়ায় ওই বাসা ভাড়া দিয়ে সেগুনবাগিচাস্থ মনিরের বাসায় ভাড়া থাকেন বলে অভিযোগ আছে। এভাবে মিরপুর ১৪ নম্বর সেকশনের হিসাব সহকারী নাহিদ এবং রিয়াজুলকে দু'টি বাসা বরাদ্দ দেয়া হলেও তারা সেখানে থাকেন না। ভাড়া দিয়ে অন্যত্র থাকেন। নিউ কলোনী ২৪ নম্বর ভবনে দেলোয়ার হোসেন এবং গায়েত্রী রানীকে পৃথক বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু তারা বরাদ্দকৃত বাসায় বসবাস না করে ভাড়া বাণিজ্য করছেন।

এদিকে অভিযোগ আছে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগের কম্পিউটার কম্পোজ এবং ফটোকপি করা নিয়েও রমরমা বাণিজ্য চলছে। আকতারুজ্জামানের পিএ তাসলিমা জান্নাত আরজু দপ্তরের কম্পিউটার ব্যবহার করে ভূমি বিভাগের অধিকাংশ চিঠিপত্র কম্পোজ করেন। প্রত্যেকটি কম্পোজ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়। দৈনিক ১৫-২০টির অধিক চিঠিপত্র কম্পোজ করা হয় এই কম্পিউটারে। কম্পিউটার কম্পোজের মত এই দপ্তরে দীর্ঘ দিন ধরে ফটোকপির বাণিজ্যও চলছে। অফিসের এমএলএসএস সৈয়দ রিয়াজুল ইসলাম এই ফটোকপির ব্যবসা পরিচালনা করছে। তার মাধ্যমে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাইরে পাচারের অভিযোগ আছে। এমনকি অনেক গোপন তথ্য তার মাধ্যমে বাইরে ফাঁস হলেও শীর্ষ কর্মকর্তারা এসব প্রশ্রয় দিয়ে চলছেন।

সংঘবদ্ধ চক্র

জাতীয় গৃহায়নে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এরা প্রতিষ্ঠানের সেগুনবাগিচার মূল কার্যালয়, মিরপুর ডিভিশন, মোহাম্মদপুর ডিভিশন, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগসহ সারা দেশে অবস্থিত শাখা অফিসের প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে। ফাইল আটকে ঘুষ আদায়, চিঠিপত্র গায়েব করে রাখা, নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্যসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। তাদের অপকর্ম এবং দাপটে জিম্মি হয়ে পড়েছে সাধারণ সেবা প্রার্থীরা। বর্তমানে সংঘবদ্ধ এই সিন্ডিকেটের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন জাতীয় গৃহায়নের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান সহকারী হেদায়েত উল্লাহ, হিসাব সহকারী শাহজাহান, হিসাব সহকারী জিন্নাহ, পিএ তাসলিমা জান্নাত আরজু, উপ সহকারী প্রকৌশলী দীপক কুমার (যশোর),

উপ সহকারী প্রকৌশলী উম্মে জহুরা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আলমগীর (চট্টগ্রাম), ক্যাশিয়ার মনসুর আলম, ক্যাশিয়ার মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ক্যাশিয়ার জিন্নাত আলী, অফিস সহকারী সাইদুর রহমান, অফিস সহকারী আবদুর রশিদ, হিসাব সহকারী মোঃ মতিয়ার রহমান (বদলি দিনাজপুরে), মিরপুর-১৪ নং সেকশনের হিসাব সহকারী নাহিদ, রিয়াজুল প্রমুখ। এরা প্রত্যেকে ঘুষ লেনদেনের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগে রয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলালে তাদের ঘুষ বাণিজ্য সহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসবে। চাকরি জীবনে অপকর্মের জন্য এরা বিতর্কিত। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক অভিযোগ রয়েছে। ঘুষ-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চেয়ারম্যান নিয়াজ উদ্দিন এবং মেম্বার ল্যান্ড মোরাদ হোসেনের বদলি হলেও অন্য প্রভাবশালীরা এখনো প্রতিষ্ঠানটিতে বহাল রয়ে গেছেন। ব্যক্তিগতভাবে সৎ বলে পরিচিতি থাকলেও বর্তমান চেয়ারম্যান এই দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করে আসছেন।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

জাতীয় গৃহায়নের ঘুষ দুর্নীতি বন্ধে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে জাড়িত প্রমাণ পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, রাতারাতি এখানকার অনিয়ম দূর করা সম্ভব নয়।

বিধি বহির্ভূতভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন

নরসিংদীর জেলা জজ পদে থাকালীন যেসব আত্মীয়দের আবুল হোসেন খান চাকরি দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, প্রধান তুলনাকারী পদে সুমি বেগম। তিনি আবুল হোসেনের ভ্রাতৃবধু। রেকর্ড সহকারী পদে ভাতিজিকে চাকরি দিয়েছেন। তার নাম নাহিদা আক্তার। ভাগিনা বাবুলকে ড্রাইভার এবং আরেক নিকটতম আত্মীয় সাইফুল ইসলামকে চাকরি দেয়া হয়েছে এমএলএসএস পদে।

পূর্ত মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন দুর্নীতি

আবুল হোসেন খান ২০০৬-২০০৭ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ) পদে কর্মরত ছিলেন। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টার দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা। কিন্তু আবুল হোসেন সেই দায়িত্ব পালন না করে ভূমিদস্যুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকারি সম্পত্তি বেহাত কাজে লিপ্ত ছিলেন। এ সময় তাকে রাজউকসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতরে তদবির করতে দেখা গেছে। ভুমিদস্যুদের পক্ষে বিচারের রায় এনে দেয়ার ব্যাপারেও তদবির করেছিলেন আবুল হোসেন খান। তিনি এসব অবৈধ কাজে টাকার বিনিময়ে চুক্তি পর্যন্ত করেছিলেন বলেও সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল। বিভিন্ন আদালতে কর্মরত তার ব্যাচের এবং জুনিয়র-সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছেও তদবির করতেন যাতে সরকারের বিরুদ্ধে রায় যায়।

এ সময় আবুল হোসেন খান গোপন সমঝোতা ও অর্থের বিনিময়ে মিরপুরের একটি শহীদ পরিবারকে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করার জন্য লিখিত মতামত দিয়েছেন। মিরপুর ১০-বি, ১০/৯ বাড়িটির দোতলা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল এই শহীদ পরিবারেকে। পরবর্তীতে ওই শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে বাড়িটি ক্রয়ের প্রস্তাব করলে পূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে তা নাকচ করে দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন আইন

উপদেষ্টা আবুল হোসেন খান ওই বাড়িটি নিচতলায় বসবাসকারী কামাল উদ্দিন চৌধুরী নামের এক ভূমি দস্যুর কাছে দোতলা ফ্লোরটি বিক্রির পক্ষে মত দেন। অথচ কামাল উদ্দিন চৌধুরীর ঢাকায় ৪টি প্লট ও বাড়ি রয়েছে বলে ডিসি অফিসের তদন্তে তা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যও নন। এ প্রেক্ষিতে কামাল উদ্দিন কোন ক্রমেই সরকারি বাড়ি ক্রয়েরে ক্রাইটেরিয়ায় পড়েন না। তারপরও আবুল হোসেন খান তার পক্ষে অবৈধ মতামত দিয়েছিলেন।

অবৈধভাবে বাড়ি দখল

আবুল হোসেন খানের গ্রামের বাড়ি বরিশালের শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের চর আইচা গ্রামে। তার পিতার নাম মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ খান। তার পিতা ছিলেন একজন দলিল লেখক। ওয়াহেদ খানরা ছিলেন ৮ ভাই বোন। দরিদ্রতার কারণে তাদের অভাব লেগেই থাকত। আবুল হোসেন খানের পিতার থাকার জায়গা ছিল না বিধায় চর আইচা গ্রামের মুন্সী বাড়িতে ঘর করে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে এই গ্রামের বাসিন্দা যোগেশ ভক্তের ছেলেদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের বাড়ির ৩/৫ অংশ লিখে নিয়েছেন। এ ছাড়া আবুল হোসেন খান ওই গ্রামের কৈশাল সাজোয়ালের পরিত্যক্ত বাড়ি ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিসহ ১ একর ৭৫ শতাংশ জমি জাল দলিল করে দখলে নিয়ে নেন। এই দলিলের নম্বর- ৫৩৬৫। অন্যের বাড়ি দখল করে সেখানে 'জজবাড়ি' সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন। আবুল হোসেন খান জজ বলে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহস পান না। আবুল হোসেন খানের প্রভাবে তার আত্মীয় স্বজনরাও এলাকার অনেক জমি দখল করে নিয়েছেন।

যেভাবে উত্থান

আবুল হোসেন খান ১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই ফরিদপুর জেলা আদালতে শিক্ষানবিশ মুন্সেফ পদে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই চাকুরী পেয়েছিলেন। এরপর তিনি প্রথমে ফরিদপুর জেলার দামুড়হুদা এবং পরে ভাংগা উপজেলার মুন্সেফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯ মার্চ ১৯৮৭ সালে তিনি ফরিদপুরের ভাংগা থেকে মাদারীপুরের গোসাইরহাট উপজেলার মুন্সেফ পদে যোগ দেন। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন এক মাসের ও কম সময়। সেখান থেকে সহকারী জজ পদে পদোন্নতি নিয়ে ৯ এপ্রিল ১৯৮৭ মাদারীপুরের শিবচরে যোগদান করেন। শিবচর থেকে ২২ জানুয়ারি ১৯৯০ চট্টগ্রাম জেলা সদরে সহকারী জজ পদে যোগদান করেন। পরবর্তীতে একই পদে চট্টগ্রামের রাউজান ও পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করেন। সাব-জজ পদে পদোন্নতি নিয়ে তিনি ১৬ জুন ১৯৯৪ সালে যশোরে বদলি হয়ে আসেন। যশোর থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলার সাব-জজ পদে ৯ মার্চ ১৯৯৮ বদলি হন। এখানে ছিলেন ১৮ মার্চ ২০০০ পর্যন্ত।

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি নিয়ে আবুল হোসেন খান ২২ মার্চ ২০০০ নরসিংদীতে যোগদান করেন। নরসিংদী থেকে ঢাকায় ৭ মে ২০০৩ বদলি হয়ে আসেন। এরপর ঠাকুরগাঁর নারী ও শিশু আদালতের জেলা জজ হিসেবে ২০০৬ এর মে পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সেখান থেকে ৮ মে, ২০০৬ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ) হিসেবে যোগ দেন। আবুল হোসেন খান ১ জানুয়ারি ২০০৮ নরসিংদীর জেলা ও দায়রা জজ পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে বছর খানেক আগে সাতক্ষীরার জেলা ও দায়রা জজ পদে বদলি হন। বর্তমানে

এই পদেই আছেন। অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে এখান থেকে তাকে প্রত্যাহারের সকল কার্যক্রম শেষ হলেও এখনও আদেশ জারি করা যায়নি আইন মন্ত্রণালয় থেকে। কারণ, প্রভাবশালী এই জজ সরকারের উর্ধ্ব মহলে তদবির করে তা ঠেকিয়ে রেখেছেন। সাতক্ষীরার আইন আশ্রয়ীদের দাবি এই দুর্নীতিবাজকে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করা না হলে তারা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হবেন। দিন দিন এই বিতর্কিত বিচারকের দুর্নীতি বাড়তে থাকবে। যা বিচার বিভাগকে প্রশ্নের সম্মুখীন করবে।

শীর্ষ কাগজে রিপোর্ট প্রকাশের পর এটিএন বাংলার দখলে থাকা জমি উদ্ধার

ঢাকা, ২ জানুয়ারী (শীর্ষ নিউজ ডটকম): সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজে সংবাদ প্রকাশের পর রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে অবৈধভাবে দখলে নেয়া সরকারী জলাশয়সহ ৬০ কাঠা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। রোববার দিনভর অভিযান চালিয়ে এটিএন বাংলার সকল অবৈধ স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। ঘটনাস্থল থেকে এটিএন বাংলার ৮টি সাইনবোর্ড, একটি সেমিপাকা ঘর ও ৬০টি টিনশেড বস্তি উচ্ছেদ করা হয়। এটিএন বাংলার অবৈধ দখল ছাড়াও প্রবহমান জলাশয়ের আশপাশে বেশকিছু বস্তিঘরও উচ্ছেদ করে গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। এতে সাইবোর্ড টানিয়ে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণভারও গ্রহণ করেছে তারা। গৃহায়নের ম্যাজিস্ট্রেট একে এম টিপু সুলতান ও আল মামুন মোর্শেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এ সময় পল্লবী থানার ৫ এসআই, ৬৫ পুলিশ কনস্টেবল ও ২০ আনসার সদস্য অভিযানে সহায়তা করেন। উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেন গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মিরপুর ডিভিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আবদুল হানিফ ও এসডি মোঃ হারিছ উদ্দিনসহ দুই শতাধিক কর্মী। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ভূমি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক বাসুদেব গাঙ্গুলী শীর্ষ নিউজ ডটকমকে জানান, জাতীয় গৃহায়নের গেজেটভুক্ত জলাশয় এতদিন এটিএন বাংলা লিমিটেড অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল। আজ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটানা অভিযান চালিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। তিনি বলেন, রূপনগরের উক্ত জলাশয় জাতীয় গৃহায়নের সম্পত্তি। এখানে ব্যক্তি মালিকানায় কারো সম্পত্তি নেই। পল্লবী থানার ওসি ইকবাল হোসেন জানান, এটিএন বাংলাসহ রূপনগরের জলাশয় দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মিরপুরের রূপনগরে অবস্থিত জাতীয় গৃহায়নের সরকারি গেজেটভুক্ত শত কোটি টাকার প্রবহমান জলাশয়টি এটিএন বাংলা লিমিটেড তিন মাস ধরে বালু ভরাট করে অবৈধভাবে দখলে নেয়। তারা এটি নিজেদের সম্পত্তি দাবি করে সাইনবোর্ড টানিয়ে এতে বালু ভরাট অব্যাহত রাখলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ পল্লবী থানায় একাধিক জিডি এবং অবশেষে জলাশয় আইনে মামলা দায়ের করে। সরকারি জলাশয় দখল নিয়ে সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর গত ২৬ ডিসেম্বর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ জরুরি বৈঠক করে এটিএন বাংলাকে উচ্ছেদপূর্বক জলাশয়টি পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় রোববার দিনভর অভিযান চালিয়ে এটিএন বাংলাকে উচ্ছেদ করে জলাশয়টি পুনরুদ্ধার করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে মিরপুরের একমাত্র প্রবহমান জলাশয়টি পুনরুদ্ধার করায় এলাকাবাসীর মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে। স্থানীয়রা জানান, যেভাবে এটিএন বাংলাসহ প্রভাবশালী মহল এই এলাকার একমাত্র সরকারি জলাশয়টি অবৈধভাবে দখলের মহোৎসবে মেতে উঠেছে তা উদ্বেগজনক। তারা পুনরুদ্ধারকৃত জলাশয়টি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। তারা আশঙ্কা করেন, স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা না হলে এটি যে কোনো সময় আবারও বেদখল হয়ে যেতে পারে।

কোচিং নির্ভর শিক্ষা

প্রতিবেদন
কোচিং নির্ভর শিক্ষা

প্রতিবেদক
এইচ এম আলাউদ্দিন

প্রকাশের তারিখ
৩ নভেম্বর ২০১০ থেকে
৫ ডিসেম্বর ২০১০

সংবাদপত্র
দৈনিক পূর্বাঞ্চল

বর্তমান কর্মস্থল
দৈনিক পূর্বাঞ্চল
সিনিয়র রিপোর্টার, খুলনা

টিআইবি'র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন

নগরীর চারটি সরকারি স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত কোচিং ফি আদায় করা হচ্ছে

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১

বোর্ড নির্ধারিত ফি মাত্র ১১শ' টাকা। ফরম পূরণে নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা। কোন কোন স্কুলে আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। অতিরিক্ত টাকার অধিকাংশই কোচিং ফি হিসেবে নেয়া হলেও দেখানো হচ্ছে মডেল টেস্টসহ অন্যান্য একাধিক খাত। খুলনা মহানগরীর চারটি সরকারি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের চিত্র এটি। এ প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাফ কথা 'কোচিং ছাড়া রেজাল্ট ভালো হয় না'। আর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছেন 'বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হলে তার দায় দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে'। অসহায়ের মত অভিভাবকের বক্তব্য হলো 'টাকাটা বড় কথা নয়, ছেলে-মেয়েরা ভালো ফলাফল করুক এটাই চাই'। এভাবে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে চারটি সরকারি স্কুল থেকে এবার প্রায় অতিরিক্ত ১২ লাখ টাকা আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এবার খুলনার চারটি সরকারি স্কুলে শিক্ষক পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে কোচিং ফি। আর অতিরিক্ত ক্লাশ বলা হলেও প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১টা অথবা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে নেওয়া হচ্ছে কোচিং ক্লাশ। খুলনা জিলা স্কুলে ৩৮৪, করোনেশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০০, খুলনা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে (মন্নুজান) ১৩৪ জন ও ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে ১৬৮ জন সম্ভাব্য পরীক্ষার্থী থাকায় তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১২শ' টাকা করে নেয়া হলে সর্বমোট দাঁড়ায় ১১ লাখ ৮৩ হাজার ২শ' টাকা। এ টাকা স্কুলের কোচিং ক্লাশের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

সোমবার বেলা পৌনে ১টার সময় খুলনা জিলা স্কুল চত্বরে এই প্রতিবেদকের সাথে কথা হয় একজন নারী অভিভাবকের। নগরীর হাজী মহসীন রোডের বাসিন্দা ওই অভিভাবকের ছোট ছেলের জন্য তিনি এসেছেন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে। নিয়ে আসছেন ২৪শ' টাকা। বোর্ড ফি মাত্র ১১শ' টাকা হলেও বেশী দিবেন কেন প্রশ্ন করা হলে তার বক্তব্য 'বেশী নিক সেটা বড় কথা নয়, বরং ছেলের পাশ করা দরকার।'

গেটে অপেক্ষমান ৭/৮ জন অভিভাবকের সাথে কথা হলে তারা জানান, ২৬ অক্টোবর থেকে তাদের সন্তানদের জন্য কোচিং ক্লাশ শুরু হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত কোচিং ক্লাশ হয় বলেও জানান তারা। স্কুলে কোচিং করা বাধ্যতামূলক আর না করলেও অতিরিক্ত ফি দিতে হবে বলে উল্লেখ করে অভিভাবকরা জানান, স্কুল ছাড়াও তাদের সন্তানদের জন্য রয়েছে বাইরের কোচিং ও গৃহ শিক্ষক। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মালেকা বেগম বলেন, মডেল টেস্ট ৬টি ধাপে ও দু'টি পর্বে ক্লাশ টেস্ট ও প্রতিদিন একটি করে ক্লাশ মিলিয়ে ৩শ' টাকা আর মাসে ২শ' টাকা কোচিং ফি নিয়ে ৩ মাসে ৬শ' টাকা অর্থাৎ অতিরিক্ত ১২শ' টাকা নেওয়া হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে। সবকিছুর মূল্য

বাড়লেও ২০০০ সাল থেকে একই নিয়মে কোচিং ফি নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, খুলনার আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে কোচিং ফি বাড়ানো হয়নি । একইদিন ১টা ৩৫ মিনিটে সরকারি করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে এই প্রতিবেদকের অবস্থানের সময় স্কুলের ৭২১৬০৪ নম্বর ফোনে একটি রিং আসে। স্কুলের আয়া ফোনটি রিসিভ করে প্রধান শিক্ষিকাকে বলেন, একজন অভিভাবক ফরম পূরণের জন্য টাকার অংক জানতে চান। কিন্তু ফোনে না বলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীকে এসে জানার জন্য নির্দেশ দেন প্রধান শিক্ষিকা। যদিও প্রধান শিক্ষিকা ফারহানা নাজ এই প্রতিবেদককে বলেন এসএসসি'র জন্য বিজ্ঞানে ১১৬০ ও মানবিকে ১০৮৫ টাকা নেওয়া হচ্ছে তবে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কোচিং ক্লাশ হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব মিলিয়ে ১২শ' টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা পরে আদায় করা হবে। একই স্কুলের গেটে বেলা ১টা ৩৮ মিনিটের সময় কথা হয় দুজন অভিভাবকের সাথে তারা জানান তাদের মেয়েদের জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক। আর স্কুলের দারোয়ান জানান এটি 'আইন'।

খুলনা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা জনান, কয়েকদিন আগে স্কুলের একজন শিক্ষিকা ছাত্রীদের জানিয়ে দেন ফরম পূরণ করার জন্য চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা জোগাড় রাখতে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক ইমরান আলী জানান বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে প্রতি মাসে ৩শ' টাকা বেশী কোচিং ফি নেওয়া হচ্ছে। আবার সংশ্লিষ্ট শ্রেণী শিক্ষক মাহমুদা হোসেন তুলির সাথে সোমবার বিকেলে কথা বলতে গেলে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। বলেন, তিনি ছাত্রী ছাড়া কারও সাথে কথা বলেন না। তাৎক্ষণিক প্রধান শিক্ষকের ০১৭১২১২০৭২৫ নম্বর মোবাইলে বিষয়টি জানানো হলে তিনি একটি নিয়োগ পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত আছেন বলে এড়িয়ে যান।

নগরীর ফুলবাড়ি গেটস্থ কুয়েট রোডে অবস্থিত খুলনা সরকারি ল্যাবরেটরী স্কুলের অভিভাবকদের নিয়ে মিটিং ডেকে তাদের কাছ থেকে সম্প্রতি সম্মতি নিয়ে ফরম পূরণের জন্য নেওয়া হচ্ছে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে যথাক্রমে ২০৩৫ ও ২১৭০ টাকা। গত মাসের ২৫ তারিখ থেকে ঐ স্কুলে কোচিং ক্লাশ শুরু হয়েছে বলেও জানালেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম আযম।

খুলনার চারটি সরকারি স্কুলে ২৫ অথবা ২৬ অক্টোবর থেকে এসএসসি'র ফরম পূরণ শুরু হওয়া এবং এজন্য অতিরিক্ত টাকা গ্রহণের বিষয়টি জানেন না স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও খুলনার জেলা প্রশাসক মোঃ জমশের আহাম্মদ খন্দকার। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র কমিটির কাছে এ তথ্য রয়েছে। তবে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন, কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে কোচিং করাতে পারেন। কিন্তু কোনক্রমেই বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে পারবেন না। এটি যদি কেউ করে থাকে সেটি তাদের নিজ দায়িত্বে করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

৩য় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টার সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি অভিভাবকরা মডেল টেস্টের নামে বছরে প্রায় ১৪ লাখ টাকা আদায়

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২

খুলনার চারটি সরকারি স্কুলের ৩য় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টার সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে হচ্ছে অভিভাবকদের। প্রতি বছর ভর্তি কোচিংয়ের মডেল টেস্টের নামে হাতিয়ে নেওয়া হয় লাখ লাখ টাকা। ভর্তির সাথে সম্পৃক্ত কোচিং সেন্টারগুলো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১৪ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলেও এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ভীতি কাটানোর নামে তাদেরকে এক কোচিং থেকে অন্য কোচিংয়ে নিয়ে ভর্তি পরীক্ষার আদলে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে 'মডেল টেস্ট'। আর এ কথিত মডেল টেস্টের জন্য প্রতিটি পরীক্ষার জন্যই প্রতি শিক্ষার্থীকে ফি দিতে হয় ৫০ থেকে ৮০ টাকা। এ বছর ইতোমধ্যেই প্রায় ১৬টি কোচিং সেন্টার নিজেদের মধ্যে মডেল টেস্ট নিয়েছে বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। এবারের সর্বশেষ মডেল টেস্ট হবে আগামী ১২ নভেম্বর। ওইদিন 'সেলিম স্যারের ব্যাচ' নামে ইকবাল নগরের একটি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে এবং আগামীকাল শুক্রবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডের এ্যাংকর কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া বিগত মাসাধিককাল ধরে মেহেদি স্যারের ব্যাচ, সাকসেস কোচিং, বিল ফিউচার, উত্তম স্যারের ব্যাচ , হুদা স্যারের ব্যাচ, বিভাস স্যারের ব্যাচ (অগ্রদূত কোচিং), টুটুল স্যারের ব্যাচ (ইউনিট কোচিং), প্রমিলা একাডেমি, সোনামণি কোচিং, শাহীন ক্যাডেট কোচিং, ত্রয়ী কোচিং, গিয়াস স্যারের ব্যাচ, লিটু স্যারের ব্যাচ, আন্তরিক কোচিং, খুলনা প্রি-ক্যাডেট এবং অক্সফোর্ড কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মডেল টেস্ট আয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি কোচিং সেন্টার পরীক্ষার আয়োজন করলেও অন্যান্য কোচিং সেন্টারগুলো নিজেদের কোচিং এর ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে সহোযোগিতা করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর অন্তত সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী মডেল টেস্টের আওতায় আসে। অর্থাৎ প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গড়ে ৭০ টাকা করে নেওয়া হলেও এক হাজার শিক্ষার্থী থেকে ২০টি কোচিংয়ের এর আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ লাখ টাকা। আবার একজন শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র ভর্তির জন্যই দিতে হচ্ছে ২০টি মডেল টেস্ট যা দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষাকেও হার মানায়। অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার আগেও যেখানে প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার মধ্যেই প্রস্তুতি সীমাবদ্ধ থাকত সেখানে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ১৫/২০টি মডেল টেস্ট দেওয়ার বিষয়টিকে অনেকে ব্যবসায়িক মনোভাবের সাথে তুলনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক এ প্রতিবেদককে জানান, জিলা করোনেশনে ভর্তির জন্য তাদেরকে যেহেতু প্রতীক্ষায় থাকতে হয় সেহেতু কোচিং কর্তৃপক্ষের যে কোন আয়োজনের কাছে তারা জিম্মি হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে অর্থের চেয়ে ভর্তির সুযোগটিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেও তারা জানান। তবে সম্প্রতি গঠন করা খুলনা কোচিং পরিচালক এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ওবায়দুল হক লিটু বলেন, কোন শিক্ষার্থী বা অভিভাবককে মডেল টেস্টের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় না বরং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর ভীতি কাটানো ও জিলা কারোনেশনের আদলে পরীক্ষা শেখানোর জন্যই মডেল টেস্টের আহ্বান জানানো হয়। এ পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয় না। এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ জাকিরুল ইসলাম বলেন, কোচিং এর নামে বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যেই এ এসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এ এসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে অচিরেই কোচিং ব্যবসা বন্ধ ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। এছাড়া পূর্ব ঘোষণা থাকা আগামীকালের এ্যাংকর ও ১২ নভেম্বরের সেলিম স্যারের ব্যাচের পরীক্ষা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এর পরেও কোন কোচিং সেন্টার মডেল টেস্ট নিলে তার দায় দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অপর একটি সূত্র জানায়, এ বছর থেকে অধ্যায়ন কোচিং এবং আমানত স্যারের ব্যাচ নামের কোচিং সেন্টার দু'টি মডেল টেস্ট বন্ধ করে দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কোচিং সেন্টারগুলোর মডেল টেস্ট বন্ধ করলে ভর্তি বাণিজ্য থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কিছুটা রক্ষা পাবে বলেও অনেকে মন্তব্য করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মধ্যেও চলছে কোচিং সেন্টারগুলোর ভিজিট প্রথা, শিক্ষার মান ব্যাহত হচ্ছে

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৩

শুধু হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের মাঝে ঔষধ কোম্পানীর ভিজিটই নয়, এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মাঝেও কোচিং সেন্টারগুলোর ভিজিট প্রথা চালু হয়েছে। আর এ ভিজিট প্রথার কারণে শিক্ষার মান ব্যাহত হবার আশঙ্কা করছেন অনেকে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুলে উত্তরপত্র সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রী পাঠাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে। গত বছর থেকে শুধুমাত্র এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে এ উত্তরপত্র সরবারহ শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ক্লাশে এবং শিক্ষকদের মধ্যে ভিজিট প্রথা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করে বলেছেন, হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসকদের মাঝে ঔষধ কোম্পানীগুলোর ভিজিট প্রথার ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মাঝে শুরু হওয়া এ ভিজিট প্রথা এক সময় মহামারী আকার ধারণ করলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দীর্ঘদিন থেকে ঔষধ কোম্পানীগুলোর পক্ষ থেকে যেমন উপঢৌকন দেওয়ার প্রবণতা চলে আসায় তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ লিখতে হচ্ছে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ভিজিট শুরু হলে এক সময় শিক্ষকদের চাপের মুখে অখ্যাত ও নামসর্বস্ব কোচিং সেন্টারে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান ক্ষুণ্ন হতে পারে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।

সূত্রগুলো বলছে, গত বছর খুলনা মহানগরীর বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার সময় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহ করে একটি কোচিং সেন্টার। নগরীর শামছুর রহমান রোডের ইন্টারএইড নামের ওই কোচিং সেন্টারটি হাজী এ মালেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপসা বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়, এইচআরএইচ প্রিন্স আগাখান মাধ্যমিক বিদ্যালয়,শহীদ জিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পল্লীমঙ্গল মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সবুরননেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার আদলে উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়।

গত বছর শুরু হওয়া ওই প্রবণতার কারণে প্রতিযোগিতাপরায়ণ হয়ে উঠেছে অন্যান্য কোচিং সেন্টারগুলোও। প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে এ বছর একই রোডের সাকসেস কোচিং সেন্টার নামের প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একইভাবে উত্তরপত্র সরবরাহ করেছে বলেও জানা গেছে। অবশ্য গত

বছর ইন্টারএইড শুধুমাত্র নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহ করলেও এ বছর সাকসেস কোচিং নৈর্ব্যক্তিক ছাড়াও মূল উত্তরপত্রও সরবরাহ করেছে।

এভাবে ক্রমান্বয়ে কোচিং সেন্টারের খাতায় স্কুলের টেস্ট, প্রি-টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় এ সুযোগটি প্রতিনিয়ত নেওয়ার চেষ্টা করবে বলে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত অনেকে আশঙ্কা করছেন। যা একসময় 'স্যাম্পল বা উপঢৌকন না দিলে ডাক্তারদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ঔষধ না লেখার ন্যায় শিক্ষকরাও কোচিংগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী না পাঠানো'র মত ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষাদানে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে বলেও কেউ কেউ আশঙ্কা করছে। আবার উপঢৌকোনের কারণেই অনেক সময় কোন কোন চিকিৎসক অখ্যাত কোম্পানী বা অতিরিক্ত ঔষধ লিখে থাকেন তেমনিভাবে শিক্ষকরাও নামসর্বস্ব বা অবৈধ কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠিয়ে তাদেরকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিতে পারেন এমন আশঙ্কাও রয়েছে অনেকের।

সংশ্লিষ্ট কয়েকজন অভিভাবক এই প্রতিবেদককে জানান, নগরীর ফুলবাড়ী গেটস্থ কুয়েট রোডের একটি সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে পার্শ্ববর্তী দু'টি কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আয়ের একটি অংশ দেওয়া হয়। যার কারণে ঐ কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তির জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এ বিষয়টির প্রতি এখনই নজর না দিলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান ব্যাহত হতে পারে বলে সচেতন মহল মনে করছেন। এদিকে কোচিং নির্ভর শিক্ষা নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনের গতকালের মডেল টেস্ট সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পর তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য গড়ে উঠা নগরীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলোর পরিচালকবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন বলে শোনা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের পর তড়িঘড়ি করে খুলনা কোচিং পরিচালক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। ঐ নোটিশে মডেল টেস্ট বন্ধের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ নগরীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডস্থ এ্যাংকর কোচিং কর্তৃপক্ষ। ওই কোচিং এর পূর্বনির্ধারিত আজকের পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মডেল টেস্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে বলে গতকাল সন্ধ্যায় ঐ কোচিং এ গিয়ে আঁচ করা গেছে। এছাড়া গত ২৪ সেপ্টম্বর নান্নু স্যারের ব্যাচ (নলেজ হোম) এবং ২৯ অক্টোবর পাঞ্জেরী কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

একদিকে বন্ধের নোটিশ, অপরদিকে মডেল টেস্ট

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৪

'অনিবার্য কারণবশত এ্যাংকর কোচিং-এর চূড়ান্ত মডেল টেস্ট স্থগিত করা হলো' নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডস্থ পাইওনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের গেটে গতকাল এ ধরনের নোটিশ টানানো হলেও প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক (এমটি) রোডস্থ উক্ত কোচিং এর নিজস্ব কার্যালয়ে। কোন প্রকার পুলিশী অনুমতি ছাড়া দিনভর একাধিক ব্যাচে এ পরীক্ষা নেওয়া হলেও পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রের গেটের ওই নোটিশ নিয়ে অভিভাবকসহ সচেতন মহলে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। তাছাড়া মডেল টেস্ট নামের সিন্ডিকেট পরীক্ষার সময় এমটি রোডের জন ও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কোচিং নির্ভর শিক্ষার এ চিত্র খুলনা মহানগরীতে প্রায়শই দেখা গেলেও প্রশাসন রয়েছে নির্বিকার।

সূত্র মতে, নগরীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডের এ্যাংকর কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে পাইওনিয়ার স্কুলে পূর্ব নির্ধারিত মডেল টেস্ট ছিল গতকাল শুক্রবার। এ ব্যাপারে স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে দিন তারিখ নির্ধারণ করে রাখেন কোচিং কর্তৃপক্ষ। যার আলোকে নগরীর বিভিন্ন কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০ থেকে ৮০ টাকা করে ফি গ্রহণ সাপেক্ষে তাদেরকে প্রবেশপত্র সরবরাহ করা হয়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারগুলোর সিন্ডিকেট বাণিজ্যের অংশ হিসেবে মডেল টেস্ট গ্রহণ সংক্রান্ত সংবাদ বৃহস্পতিবার দৈনিক পূর্বাঞ্চলে প্রকাশের পর তড়িঘড়ি করেই কোচিং কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। যার আলোকে বৃহস্পতিবার রাতেই একটি ডেকোরেটর থেকে চেয়ার টেবিল নিয়ে রাতভর কোচিং এর নিচতলা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার সব কক্ষে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এ বিষয়টি গোপন রেখে পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রের গেটে হাতে লিখা নোটিশ টানিয়ে দিয়ে প্রচার করা হয় মডেল টেস্ট বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোচিং এর শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উক্ত সেন্টারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এদিকে গতকাল সকাল ৮টা থেকে একাধিক ধাপে ঐ পরীক্ষা নেওয়া হলেও পরীক্ষার্থীদের বসানো হয় কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্লোর, খাট, সোফা সেট এমন কি পাকা ঘরেও। গতকাল বেলা সোয়া ১২টায় এ প্রতিবেদকের সাথে কথা হয় যোবায়ের মাহমুদ, আতিক, শফিকসহ কয়েকজন পরীক্ষার্থীর সাথে। একজন পরীক্ষার্থী জানায়, এ নিয়ে তার মডেল টেস্ট এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬টিতে অর্থাৎ এর আগেও সে অন্য ৫টি মডেল টেস্টে অংশ নিয়েছে।

এসময় কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ফি নিয়ে পূর্ব ঘোষণা ছাড়া যেভাবে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে তা কোন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া ফেরার পথে একাধিক অভিভাবক উক্ত কোচিং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন। তাছাড়া কোচিং সেন্টারগুলো সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের মডেল টেস্ট দিতে বাধ্য করেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। তবে দুই একজন অভিভাবক বলেছেন মডেল টেস্টে অতিরিক্ত টাকা খরচ হলেও ছেলে মেয়েদের ভীতি কেটে যায়। যদিও কোচিং পরিচালক হুমায়ুন কবির বাচ্চু এ প্রতিবেদককে বলেন, মডেল টেস্ট বন্ধ করা হলেও

শুধুমাত্র তার কোচিংয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী চলে এসেছে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তবে দিনভর উক্ত কোচিং সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করে জানা যায় গতকাল অন্তত ২০টি কোচিং বা ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রী মডেল টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষার্থী ছিল ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের ব্যাচের। অর্থাৎ ৩২০ জন পরীক্ষার্থী মডেল টেস্টে অংশ নেয় উক্ত কোচিং থেকে। এছাড়া যেসব ব্যাচ বা কোচিং থেকে পরীক্ষার্থীরা অংশ নেয় সেগুলো হচ্ছে মিঠু স্যারের ব্যাচ, গিয়াস স্যারের ব্যাচ, মুহিত স্যারের ব্যাচ, নান্নু স্যারের ব্যাচ,আমানত স্যারের ব্যাচ, পাঞ্জেরী কোচিং, সোনামণি কোচিং, মেহেদি স্যারের ব্যাচ, টুটুল স্যারের ব্যাচ, বিল ফিউচার, ইসলামী প্রি-ক্যাডেট, আফরুল স্যারের ব্যাচ, হিমাংশু স্যারের ব্যাচ ও হুদা স্যারের ব্যাচ।

গতকালের মডেল টেস্ট সম্পর্কে পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আফরোজা খাতুন বলেন, তিনি সদ্য যোগদান করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। তবে জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসেছিলেন এবং পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানালেও বৃহস্পতিবার থেকে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ায় হয়তোবা আর কোন যোগাযোগ করেননি।

অপর একটি সূত্র জানায়, গতকালের এ্যাংকর কোচিং এ মডেল টেস্ট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোন অনুমতি ছিলনা খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের। কেএমপি'র সহকারী পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি) মিজানুর রহমান বলেন, এ ধরনের জনসমাগমের ব্যাপারে অবশ্যই পুলিশী অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। খুলনা সদর থানার ওসি মুনীর-উল-গিয়াস বলেন, গতকাল শুক্রবার নগরীর শামছুর রহমান রোডের জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতনের ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোন কোচিং সেন্টারের ভর্তি পরীক্ষার অনুমতি ছিল না।

অপরদিকে সদ্য গঠিত খুলনা কোচিং পরিচালক এসোসিয়েশন বৃহস্পতিবার একটি নোটিশ দিয়ে মডেল টেস্ট বন্ধের ঘোষণা দিলেও বাংলাদেশ কিন্ডারগার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন খুলনা বিভাগীয় শাখার পূর্ব নির্ধারিত তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার মডেল টেস্ট আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে নগরীর হাজী মহসিন রোডের একটি শিশু শিক্ষালয়ে। সেই সাথে আগামী ১২ নভেম্বর পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং খান এ সবুর মহিলা মাদ্রাসায় ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের ব্যাচের পূর্ব নির্ধারিত মডেল টেস্টের তারিখ রয়েছে। যদিও পাইওনিয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেছেন তার কাছ থেকে এখনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে খান এ সবুর মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সোবাহান বলেন, মডেল টেস্টের অনুমতি রয়েছে এবং এজন্য আদায়কৃত ভাড়ার টাকা মাদ্রাসা ফান্ডেই জমা হবে।

এভাবে খুলনার নামকরা স্কুলে ভর্তির জন্য প্রতিবছরই কোচিং বাণিজ্যের কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে হয় অভিভাবকদের। যা নিয়ে দেখা দিয়েছে অভিভাবক মহলে নানা প্রশ্ন।

বেসরকারি স্কুলগুলোতেও কোচিং ফি আদায়, দু' থেকে চার হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে এসএসএসি'র ফরম পূরণে

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৫

শুধু সরকারি স্কুলেই নয় খুলনার বেসরকারি স্কুলগুলোতেও আদায় করা হচ্ছে কোচিং ফি। নগরীর শতাধিক স্কুলে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে কোচিং ফি'সহ নেওয়া হচ্ছে দু' থেকে চার হাজার টাকা।

নগরীর সেন্ট যোসেফ মডেল, ইকবাল নগর, সুলতানা হামিদ আলী, খুলনা কলেজিয়েট গার্লস, হাজী ফয়েজ উদ্দিন, বাস্তুহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোচিং না করলেও ফরম পূরণের সময় কোচিং ফি দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাছাড়া জেএসসি'র কারণে আগামী বছর থেকে এসএসসি সিস্টেম না থাকার অজুহাত দিয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলেও ঐসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে তাদেরকে ফরম পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অনেক স্কুলে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, অকৃতকার্য শিক্ষার্থী কিভাবে টাকা দিলেই কৃতকার্য শিক্ষার্থীতে পরিণত হয় সেটিই প্রশ্নের বিষয়।

নগরীর শেখপাড়া এইচআরএইচ প্রিন্স আগাখান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবক নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান, এবারের এসএসসি নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে বিষয় প্রতি এক হাজার টাকা করে নিয়ে পাশ দেখানো হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ে এবারের ফরম পূরণের জন্য ধার্য করা হয়েছে তিন হাজার টাকা। খুলনা মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাউন্সিলের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসএসসি'র ফরম পূরণে নেওয়া হচ্ছে দু'হাজার একশ টাকা। ক্লাশ সময়ের বাইরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং নেওয়ার কথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানালেও দিনের প্রথমার্ধে কোচিং ক্লাশ হয় বলে তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে। এছাড়া এসএসসি'র ফরম পূরণে সেন্ট যোসেফস প্রায় সাড়ে তিন হাজার, এসিসি স্কুলে প্রায় তিন হাজার, রেলওয়ে স্কুলে দু'হাজার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্কুলে ২৯শ', বাস্তুহারা স্কুলে আড়াই হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট স্কুল সূত্র থেকে জানা গেছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রায় একইভাবে অতিরিক্ত ফরম পূরণ ফি আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য কোচিং এর নামে অন্যান্য স্কুলে কতিপয় শিক্ষকের অর্থ আয়ের পথ ছাড়া তেমন কোন লেখা পড়াও হয় না বলে জানা গেছে।

খুলনার নামকরা একটি সরকারি স্কুলের জনৈক ছাত্র জানায়, সম্প্রতি তারা কোচিং সেন্টারে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক আসতে দেরী দেখে তাকে বাসায় ডাকতে যায়। ওই সময় উক্ত শিক্ষক ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে কান ধরে দীর্ঘ এক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখেন। উক্ত শিক্ষকের ক্লাশ সময় শেষ হওয়ার পর ঐ ছাত্রকে কোচিং ক্লাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অমানবিক এ ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ঐ ছাত্র। এছাড়া শেখ পাড়া একটি বিদ্যালয়ের জনৈক কোচিং

শিক্ষকের কথা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা জনায়, কোচিং এ লিখতে দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বাজারে চলে যান আর সময় শেষ হওয়ায় এসে ছুটি দিয়ে দেন। এভাবে বিভিন্ন স্কুলে, স্কুল সময়ে ক্লাশ নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে পড়াশোনার মানের ক্রমান্বয়ে অবনতি হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের মন্তব্য হচ্ছে যেখানে নবম ও দশম শ্রেণী অর্থাৎ দু'বছর যে স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়েও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে পারছেন না, সেখানে মাত্র তিন মাসের কোচিং করিয়ে কিভাবে তাকে ভালো ফলাফল করাবেন? তাছাড়া ঐ তিনমাসে শিক্ষকরা যেহেতু সরকারি বেতন ভোগ করবেন সেহেতু কেনই বা কোচিং ফি নেওয়া হচ্ছে? এসব জেনেও কেন সন্তানদের সেখানে দেন জানতে চাইলে অভিভাবকরা এ প্রতিবেদক কে জানান, যেহেতু কোচিং ফি দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং ফরম পূরণের সময়ই তা আদায় করা হয় সেহেতু বাইরের কোচিং এর পাশাপাশি স্কুল কোচিং এ ছেলে মেয়েদের পাঠাতে হয়।

অবশ্য মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব নেই বলে দায় এড়িয়ে যান জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান এবং বিভাগীয় উপ-পরিচালক টি.এম.জাকির হোসেন। তবে যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর রবিউল ইসলাম বলেন, ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি নেওয়ার কোন নিয়ম নেই। কোচিং ফি নেওয়া যাবেনা বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু যেসব স্কুল অতিরিক্ত ফি আদায় করছে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি আর কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি।

খুলনার জেলা প্রশাসক মোঃ জমশের আহাম্মদ খন্দকার বলেন, ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের লিখিত অভিযোগ না থাকায় কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি নির্ধারণ করে শিক্ষক সমিতি

নাগরিক ফোরামের উদ্বেগ, তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৬

স্কুল কর্তৃপক্ষ বা ম্যানেজিং কমিটি থাকলেও খুলনার উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে এসএসসি'র ফরম পূরণে ফি নির্ধারণ করে শিক্ষক সমিতি। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয়গুলো, স্থানীয় শিক্ষক সমিতি ও সাংবাদিকসহ অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, চলমান এসএসসি'র ফরম পূরণে ফুলতলা দিঘলিয়া ও তেরখাদায় দু' হাজার থেকে ২২শ', রূপসা উপজেলায় ১৯শ' থেকে ২২শ' ডুমুরিয়ায় ১৮শ' থেকে দু'হাজার এবং আইলা বিধ্বস্ত দাকোপ, কয়রা ও প্যাইকগাছায় দু'হাজার থেকে ২১শ' টাকা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে বোর্ড ফি ১২শ' টাকা বাদে বাকী টাকার অধিকাংশই নেওয়া হচ্ছে কোচিং ফি বাবদ। অধিকাংশ স্কুলেই ফরম ফি নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষক সমিতির একটি বিশাল ভূমিকা থাকে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

সূত্রটি জানায়, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় অধিকাংশ স্থানে শিক্ষক সমিতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসরে যাবার পরও দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ পদ ধরে রাখার নজিরও রয়েছে খুলনায়। কোচিং ফি এবং অবৈধ গাইডবুক তালিকাভুক্তিকরণসহ বিভিন্ন মাধ্যমের আয় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ শিক্ষক সমিতির দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিদের পকেটে চলে যাবার কারণে ঐ পদটি ছাড়তে নারাজ অনেকে। যদিও শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রে অবসরে যাবার পরও সমিতির সদস্য থাকার বিধান রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সমিতির খুলনা জেলা ও দিঘলিয়া উপজেলা সভাপতি খান নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, চাকুরী থেকে অবসরে গেলেও দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা করছেন।

জেলার বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক সমিতির এসএসসি'র ফরম পূরণের নির্ধারণের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে বলেন, একাডেমিক বিষয়ে সমিতির সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অভিন্ন প্রশ্নপত্র করার বিষয়টি তিনি স্বীকার করে বলেন, এ থেকে আয়ের অর্থ সমিতির ফান্ডে জমা হয়।

এদিকে পাইকগাছা উপজেলা সাধারণ সম্পাদক হরে কৃষ্ণদাস বলেন, শিক্ষক সমিতির ফরম পূরণ ফি নির্ধারণ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা আদায় করা হয় না। কোন কোন শিক্ষার্থী বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়েও কম টাকা দেওয়ায় শিক্ষকদের পকেট থেকে দিয়ে ফরম পূরণ করে দিতে হয়। আজ সোমবার থেকে পাইকগাছা এলাকার বেসরকারী স্কুলগুলোতে কোচিং শুরু হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিদিন দুটি শাখায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা ও ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত স্কুলে কোচিং ক্লাশ চলবে।

এছাড়া রূপসা উপজেলার শিক্ষক সমিতির জনৈক নেতা পূর্বাঞ্চলকে জানান, শহরতলীর স্কুল হওয়ায় অনেক ভালো শিক্ষার্থীই শহরের সরকারী স্কুলে চলে যায়। যে কারণে কোচিং করানো সহ বিভিন্নভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ভালো করানোর চেষ্টা করা হয়। এজন্য পারিশ্রমিক হিসেবে কোন স্কুল সামান্য কিছু কোচিং ফি নিলেও সেটি বড় ধরনের দুর্নীতি নয় বলেও তিনি দাবি করেন।

অপরদিকে গতকাল রোববার দৈনিক পূর্বাঞ্চলে কোচিং নির্ভর শিক্ষার পঞ্চম পর্বে খুলনার বেসরকারি স্কুলগুলোর কোচিং ফি আদায়ের তথ্য প্রকাশের পর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে নাগরকি ফোরাম খুলনার চেয়ারপার্সন শেখ আব্দুল কাইয়ুম ও মহাসচিব শেখ মোশাররফ হোসেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, এসএসসি'র ফরম পূরণের ক্ষেত্রে খুলনা মহানগরীর স্কুলগুলো যা করেছে তাকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি নির্যাতন বললেও কম হবে না। ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের মাধ্যমে অনেক গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

বিবৃতিতে এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এজন্য যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়। বানিয়াখামারসহ কোন কোন স্কুলে বোর্ডের অতিরিক্ত অর্থ না নিলেও অন্যান্য স্কুলগুলো কেন নিচ্ছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার বলে নাগরিক ফোরামের নেতৃদ্বয় মনে করেন।

এছাড়া গতকাল নগরীর দৌলতপুর এলাকায় কয়েকজন অভিভাবক এ প্রতিবেদককে জানান, মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়সহ ওই এলাকার অনেক স্কুলেই অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। যেদিকে সংশ্লিষ্টরা নজর না দিলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ফরম পূরণের টাকা জোগাড় করতে না পেরে পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলেও তারা আশঙ্কা করছেন।

নগরীর শতাধিক কোচিং সেন্টারের মধ্যে অর্ধেকই তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি কোচিং

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৭

খুলনা মহানগরীর শতাধিক কোচিং সেন্টারের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই গড় উঠেছে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির ওপর নির্ভর করে। এসব কোচিং সেন্টারগুলোর সাথে সরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সখ্যতা গড়ে উঠার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। যা' নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরব থাকার কারণে অবৈধ কোচিং ব্যবসা বন্ধ না হয়ে এগুলো ক্রমান্বয়ে অভিভাবকদের ভরসাস্থলে পরিণত হয়ে উঠছে।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা যায় খুলনা মহানগরীতে বর্তমানে শতাধিক কোচিং সেন্টারের সাইনবোর্ড রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নগরীর চারটি সরকারি স্কুলে ভর্তি কোচিং। জিলা করোনেশন, মন্নুজান ও ল্যাবরেটরিতে ভর্তি সংক্রান্ত এসব কোচিং এর পোস্টারও শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। কোন কোন কোচিং আবার সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য ১০০% নিশ্চয়তা দিচ্ছে। কিভাবে দিচ্ছে তার কোন সঠিক জবাব নেই সংশ্লিষ্টদের কাছে। একদিকে কোচিং সেন্টারগুলোর ১০০% নিশ্চয়তা অপরদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ভর্তির জন্য তাদের কোন হাত নেই।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, নগরীর যেসব কোচিং সেন্টার তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির ওপর নির্ভশীল হয়ে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে তুঁতপাড়ার গোল্ডেন বার্ড, তালতলার প্রমিলা একাডেমি, সোনাডাঙ্গার মিঠু স্যারের ব্যাচ, আন্তরিক কোচিং, হাজী মোহসিন রোডের শিখন কোচিং, খুলনা ক্লাবের সামনে অধ্যায়ন কোচিং, বাগমারার হিমাংশু স্যারের ব্যাচ ও গুরুগৃহ, হাজী মোহসিন রোডের ব্রাইট কোচিং ও মেহেদি স্যারের ব্যাচ, শামছুর রহমান রোডের সানরাইজ কোচিং। আহসান আহমেদ রোডের অগ্রদূত কোচিং ও সেরেনা কোচিং, নতুন বাজারের সাকসেস কোচিং, খানজাহান আলী রোডের নলেজ হোম ও পাঞ্জেরী, মুন্সিপাড়ার আমানত সারের ব্যাচ, মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডের ডেল্টা কোচিং ও এ্যাংকর কোচিং, গ্লাক্সোর মোড়ের টুটুল স্যারের ব্যাচ, ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের ব্যাচ, শিক্ষা নিকেতন ও পরশ স্যারের ব্যাচ, নিরালা শান্তি নিকেতন শিশু বিদ্যালয় প্রভৃতি। এছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ৮ম বা ১০ম অথবা ৩য় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত যেসব কোচিং সেন্টার রয়েছে সেগুলোতেও ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি কোচিং করানো হয় বলে জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে পাঠশালা ব্রিলায়েন্স, স্টাডি কেয়ার, ত্রয়ী, মেরিট, প্যারাসনসহ বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। এর মধ্যে আমানত স্যারের ব্যাচ, ব্রাইট কোচিং, পাঞ্জেরী কোচিং, শিখন কোচিং, অগ্রদূত কোচিংসহ একাধিক কোচিং সেন্টারের পরিচালককের সাথে নগরীর দু'টি সরকারি স্কুলের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে জানা গেছে। একজন শিক্ষক অবসরে গেলেও তিনি কোচিং পরিচালনার পাশাপাশি নগরীর একটি সরকারি স্কুলে ক্লাশ নেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য হচ্ছে, মানবিক দিক বিবেচনা করে তাকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া খানজাহান আলী রোডের অপর একটি কোচিং

সেন্টারের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত এক ব্যক্তি অপর একটি সরকারি স্কুল থেকে দুর্নীতির দায়ে বদলি হয়ে বর্তমানে নগরীর একটি সরকারি কলেজে কর্মরত থাকলেও ওই স্কুলের সাথে সম্পৃক্ততা থাকার সুবাদে নিশ্চয়তা দিয়ে এ কোচিংয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। একই মালিকানাধীন নতুন বাজারের অপর একটি কোচিং সেন্টারে একইভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় বলে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে জানা গেছে। নগরীর নিরালার একটি কোচিং সেন্টারে জিলা করোনেশনে ভর্তির ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আর্কষণ করছে। তবে ওই কোচিং এর পরিচালকের ০১৭১৮-৭৬৭০৭৮ নম্বর মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, ছাত্র-ছাত্রী ভালো না হলে এ কোচিংয়ে ভর্তি করা হয় না। তবে অন্য কোন পথ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি সরাসরি কথা বলার আহ্বান জানিয়ে বলেন অনেক কথা আছে যা মোবাইলে বলা যায় না। এদিকে সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ গাইড বইও ছড়িয়ে দেওয়া হয় এসব কোচিং সেন্টারে। বিনিময়ে কোচিং সেন্টারগুলোকে দেওয়া হয় মোটা অংকের ডোনেশন। আবার অনেক গাইডে সরকারি স্কুলের কিছু শিক্ষকের নাম দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করার নজিরও রয়েছে। যেগুলোর অধিক মূল্য হলেও সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তির আশায় সেগুলো কিনছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। লেকচার জুনিয়র বৃত্তি গাইড নামের এ ধরনের একটি গাইড বইতে রয়েছে খুলনার নামকরা একটি সরকারি স্কুলের জনৈক শিক্ষকের নাম। শুধুমাত্র নাম ব্যবহারের কারণেই ওই শিক্ষককে কয়েক লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

।। প্রতিবাদ ।।

অপরদিকে গত ৫ নভেম্বর কোচিং নির্ভর শিক্ষার তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত সংবাদের একাংশের প্রতিবাদ জানিয়েছেন কুয়েট রোডের গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম গোলাম আযম। প্রতিবাদ লিপিতে তিনি বলেন, ওই স্কুলের আশেপাশে অনেক কোচিং সেন্টার আছে। কোন কোচিং সেন্টারের সাথে তার কোন যোগসূত্র নেই এবং কোন কোচিং সেন্টার থেকে আয়ের কোন অংশ তাকে দেওয়া হয় না। তাছাড়া স্কুল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত সবই থাকে জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে। তিনি প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখিত অংশের প্রতিবাদ জানান।

কিন্ডার গার্টেনগুলো বৃহত্তর কোচিং সেন্টারে পরিণত, তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তিই মূল টার্গেট

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৮

খুলনা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রসহ আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা কিন্ডার গার্টেনগুলো পরিণত হয়েছে বৃহত্তর কোচিং সেন্টারে। কেজি, প্রি-প্লে, প্লে অথবা প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে কোন কোন কিন্ডার গার্টেনে ৩য় অথবা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর কথা বলা হলেও মূলত এসব গড়ে উঠেছে নগরীর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তিকে টার্গেট করে।

নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, নগরীর ৫টি থানা এলাকায় একশ' কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এর মধ্যে হাতে গোনা ২/১ টি ছাড়া অন্যকোন প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব কোন জায়গা নেই। নেই কোন খেলার মাঠও। অনেক স্থানে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজস্ব আবাসিক বাড়ির ক্ষুদ্র কক্ষেই গড়ে উঠেছে ক্লাশরুম। তারপরও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি। কোন প্রকার সরেজমিন পরিদর্শন ছাড়াই এসব কিন্ডার গার্টেন এর দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কথিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দেওয়ার ঘটনা নিয়েও জনমনে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্নের। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়েই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি স্কুলে ভর্তির ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে অভিভাবকদের দৃষ্টি আর্কষণ করছে কোচিং সেন্টারগুলোর মতই। নগরীর শামছুর রহমান রোডের একটি কিন্ডার গার্টেনের কথা উল্লেখ করে জনৈক অভিভাবক এ প্রতিবেদককে বলেন, জিলা-করোনেশন ভর্তির ইচ্ছা থাকলেও প্রথমেই ওই কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি করাতে হবে। তার মতে এতেই জিলা-করোনেশনে স্কুলে ভর্তির অর্ধেক নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। এ ধরনের আরো অনেক কিন্ডার গার্টেন এর নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অভিভাবক প্রায় একই মতামত ব্যক্ত করেন। এতে শিক্ষা যে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে সেটিও প্রমাণিত হচ্ছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন।

খুলনা মহানগরীতে প্রায় একশ' কিন্ডার গার্টেন থাকলেও তার জন্য রয়েছে দু'টি এসোসিয়েশন। দুই একটি কিন্ডার গার্টেন ওই এসোসিয়েশনের আওতাভুক্ত না থাকলেও সিংহভাগই এসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সমিতিভুক্তভাবেও সরকারি স্কুলে ভর্তির কোটা নির্ধারণ করা হয়। এসব কিন্ডার গার্টেনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জোহরা খাতুন শিশুবিদ্যা নিকেতন, অংকুর বিদ্যাপিঠ, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বর্ণমালা, ইমিতা শিশু বিদ্যালয়, সানসাইন, আইডিয়াল ন্যাশনাল, ইউসেফ, ইসলামিয়া,সানরাইজ, দিশারী, আদর্শ, কম্বাইন্ড, পাখি, নতুন কুড়ি, মরিয়ম শিশু বিদ্যালয়, আদর্শ শিশু শিক্ষালয়, সেফ কনফিডেন্স, আল আমিন একাডেমি, আল নুর একাডেমি, টাচ স্টোন, তপুরা, তাহমিনি, এসো শিখি, ইউনিভার্সেল, সোনামণি, আর এম, সূচনা শিশু শিক্ষালয়, এম আর, সানফ্লাওয়ার, ক্যামেলিয়া পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা প্রি-ক্যাডেট, মামনি, অরিত্রীর্থ বিদ্যাপিঠ, খুলনা শিশু বিদ্যালয়, সৈয়দ আলী হোসেন, খান এ সবুর স্কুল এন্ড কলেজ, রাসেল স্মৃতি, রেলওয়ে, হেল্প, হেলেনা, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, আন্তরিক লাইফ প্রি-পারেটরি স্কুল, শতদল, আদর্শ

শিশু বিদ্যালয়, ডলি, আনসার আলী শিশু বিদ্যালয়,সিটি, সবুরননেছা, আকিমুন, সাইদ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও বি এম কলেজ, লিলি, সোনামণি, স্বপ্ন, আনন্দ নিকেতন, মডেল স্কুল, বর্ণমালা (আরআরএফ), লাইফ লাইন, শিশু বিদ্যা নিকেতন, ফসকো, লিটল ফ্লাওয়ার, চিলড্রেন ভয়েজ, ন্যাশনাল, নতুন কুঁড়ি, আনন্দ নিকেতন, অংকুর, প্যারাডাইস পাবলিক স্কুল, চিলড্রেন একাডেমি, হলি চাইল্ড স্কুল, আমিনি আইডিয়াল স্কুল, কথা প্রি-ক্যাডেট স্কুল, স্মৃতি, আল হেরা হলি চাইল্ড, কবি ফররুখ একাডেমি, সবুজ সাথী, ইউনাইটেড, সৌরভ, আইডিয়াল চাইল্ড স্কুল, রোড রোজ, প্রতিভা, মনিহার, চাইল্ডভিউ মডেল স্কুল, কনফিডেন্স, ফুলকুঁড়ি, নতুন কুঁড়ি, শিশু পল্লী, এজি কিন্ডার গার্টেন প্রভৃতি।

এসব কিন্ডার গার্টেনের অধিকাংশরেই দৃষ্টি পড়েছে প্রথম শ্রেণীর ওপর। ওইসব কিন্ডার গার্টেনের কোন কোনটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের প্রভাবিত করে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি না করিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিচ্ছে এবং তারা প্রথম থেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর সিলেবাস অনুযায়ী পড়ায়। অবশ্য কিছু প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সিলেবাস ও বই থাকলেও অধিকাংশই বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ফলে কোমলমতি শিশুরা একেবারে প্রথম পর্যায়েই শিক্ষার একটি স্তর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য কিছু কিন্ডার গার্টেন অভিভাবকদের মধ্য থেকে দালাল নির্ধারণ করে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এভাবে প্রতিনিয়ত খুলনায় একের পর এক কিন্ডার গার্টেন গড়ে উঠলেও শিক্ষার মান উন্নয়নে কোন ভূমিকা নেই একে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এসোসিয়েশনগুলোর। বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন ওনার্স এসোসিয়েশন নামের দু'টি সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হয়ে আসলেও এগুলো মূলত বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রচারণায় ব্যস্ত। এসব নিয়ে এখনই ভাববার বিষয় বলে উল্লেখ করে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, তা না হলে মানসম্মত শিক্ষার পরিবর্তে ব্যবসাভিত্তিক শিক্ষায় পরিণত হবে প্রাথমিক শিক্ষা।

।। সংশোধনী ।।

কোচিং নির্ভর শিক্ষার ৭ম পর্বে গতকাল নগরীর কিছু কোচিং সেন্টারের নাম প্রকাশ করা হলেও মুদ্রণজনিত কারণে কয়েকটি কোচিং সেন্টারের নাম বাদ পড়েছে। এগুলো হচ্ছে লিটু স্যারের ব্যাচ, গিয়াস স্যারের ব্যাচ, মেহেদি স্যারের ব্যাচ, সোনামণি কোচিং, হিমাংশু স্যারের ব্যাচ, প্রোমিলা একাডেমি প্রভৃতি।

মডেল টেস্টের নামে কোচিংয়ের ট্রেড সেন্টার, লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-৯

খুলনা মহানগরীতে মডেল টেস্টের নামে কোচিং সেন্টারগুলোর ট্রেড সেন্টার গড়ে তোলার বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছে বাংলাদেশ কনজুমারস রাইটস সোসাইটি। সোসাইটির বিভাগীয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে ওই লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছে খুলনা জজ কোর্টের আইনজীবী আলী আকবর হোসেন (লিটন)। প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশে মূল্যহীন প্রতারণার মডেল টেস্ট বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, অন্যথায় বাংলাদেশ প্রচলিত আইনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সোসাইটি বাধ্য হবে।

লিগ্যাল নোটিশ প্রেরিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম হচ্ছে, তুঁতপাড়া নলেজ হোম কোচিং সেন্টার, রূপসা স্ট্যান্ড রোডের সাকসেস কোচিং সেন্টার, ইকবাল নগর বালিকা বিদ্যালয়ের সামনের সেলিম স্যারের ব্যাচ, খান জাহান আলী রোডের পাঞ্জেরী কোচিং সেন্টার, শেখ পাড়ার আন্তরিক কোচিং, সোনাডাঙ্গার মিঠু স্যারের ব্যাচ, হাজী মহসিন রোডের মেহেদী স্যারের ব্যাচ, বাগমারার হিমাংশু স্যারের ব্যাচ, সোনামণি কোচিং ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডের লিটু স্যারের ব্যাচ প্রভৃতি।

এছাড়া নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডের খান এ সবুর মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বরাবর দেওয়া সোসাইটির বিভাগীয় আইন উপদেষ্টা স্বাক্ষরিত এক আবেদনে শিক্ষাকে ট্রেড সেন্টার না ভেবে কোমলমতি শিশুদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করতে সহযোগিতা কামনা করা হয়।

ওই আবেদন পত্রে আরো বলা হয়, সরকার শিক্ষাকে যখন মেধা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরীর পরিকল্পনায় ব্যস্ত ঠিক তখনই এক শ্রেণীর কোচিং ব্যবসায়ী শিক্ষাকে ট্রেড সেন্টার ভেবে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তির কোচিং ব্যবসার মাঝে অতিরিক্ত লাভের আশায় সিন্ডিকেট তৈরী করে অভিভাবকদের সু-কৌশলে প্রতারণা করে মূল্যহীন মডেল টেস্ট নামে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা গ্রহণ করে লাখ লাখ টাকা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করছে, যা নৈতিকতা বিরোধী। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ কনজুমারস রাইটস সোসাইটি শিশুদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতির দিক বিবেচনা করে সকল অবৈধ কোচিং ব্যবসায়ীকে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ওই আবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের কারণে কোচিং ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মডেল টেস্ট বন্ধ করার আহ্বান জানানো হলেও কিছু কোচিং ব্যবসায়ী অতিরিক্ত লাভের কথা ভুলতে না পেরে কোচিং ব্যবসার আদলে মূল্যহীন মডেল টেস্ট নেওয়ার পাঁয়তারা করছে।

খান-এ সবুর মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সোবাহান ওই পত্র প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, গত ৮ নভেম্বর পত্রটি তার হস্তগত হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই গড়ে উঠেছে প্রি-ক্যাডেট স্কুল

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১০

একই ক্যাম্পাসে দু'টি স্কুল পরিচালিত হয়ে আসছে দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে। এমপিওভুক্ত একটি স্কুলের অভ্যন্তরে কিভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন কিন্ডারগার্টেন পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে সচেতন মহলে। কিন্তু কোন প্রকার তাপ-উত্তাপ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। আলোচিত এ ঘটনা ঘটেছে ফুলতলা উপজেলার আটরা এলাকায়।

সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, আটরা শ্রীনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই গড়ে উঠেছে এ.জি.এম প্রি-ক্যাডেট স্কুল নামের ওই প্রতিষ্ঠানটি। নিচ তলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাশ হলেও অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন (আটরা গিলাতলা মত্তমডাঙ্গা) প্রি-ক্যাডেট স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই প্রি-ক্যাডেট স্কুলটি পরিচালিত হয়ে আসছে বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কিভাবে অপর একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলার অনুমোদন দেওয়া হলো, সে ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি ফুলতলা উপজেলার তৎকালিন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলে রহমান। তিনি বলেন, নিজস্ব জমি না থাকলে কোন কিন্ডারগার্টেন বা প্রি-ক্যাডেট স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয়ার বিধান নেই কিন্তু তিনি কিভাবে ওই প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন দিলেন তার কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানান। ফুলতলা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, কিভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল তা' তার জানা নেই। সম্প্রতি সরেজমিন স্কুল পরিদর্শনের সময় এ.জি.এম প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সৈয়দ শামিম হোসেন বলেন, স্কুল স্থানান্তরের জন্য চেষ্টা চলছে। আগামী জানুয়ারী মাসে স্কুলটি পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় স্থানান্তর হবে বলেও তিনি জানান। এসময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহাদত হোসেন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন।

অবশ্য ওই স্কুলের জন্য পার্শ্ববর্তী যে জায়গাটি দেখানো হয়েছে এবং সেখানে যে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে সেটিও সরকারি জমির উপর। দীর্ঘদিন ধরে ঐ জমিতে ঘের করে আসছিলেন জনৈক ব্যক্তি। আটকে পড়া পাকিস্তানীদের জন্য নির্ধারিত ঐ জমিটি লিজ নিয়ে লিটন নামের ব্যক্তি ঘের করে আসছিলেন। সম্প্রতি তাকে কিছু টাকা দিয়ে এ.জি.এম স্কুল কর্তৃপক্ষ জায়গাটিতে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। কিভাবে ওই জমিটিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলের সাইনবোর্ড টানানো হলো তার কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে আটরা শ্রীনাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মহসিন বিশ্বাস বলেন, বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে এ.জি.এম'এর শিক্ষার্থীরা ক্লাশ করছে। জানুয়ারিতে তারা স্কুল ছেড়ে চলে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে কিভাবে এতদিন একই ক্যাম্পাসে স্কুলটি চলে আসছে তার কোন সঠিক জবাব দিতে পারেননি তিনি। এসময়ে তিনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বেগ আব্দুর

রাজ্জাকের সাথে কথা বলার অনুরোধ জনান। তার সাথে এ প্রতিবেদকের কথা হলে তিনি বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান খারাপ থাকায় স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক মরহুম সরদার মনজের আহমেদের চেষ্টায় এজিএম স্কুলটি গড়ে তোলা হয়। এর ফলে এলাকায় শিক্ষার মান ভালো হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। আটরা গিলাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোল্লা কাউসার আলী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল সম্মন্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সঠিক নয়, ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা মিলবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অপর একটি সূত্র জানায়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রি-ক্যাডেট স্কুল করার অনুমতি দেয়ার ঘটনায় খুলনা জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস থেকে একাধিকবার পত্র দিয়ে কারণ দর্শানো হয়েছে। কিন্তু কোন ক্ষমতা বলে এসব আদেশ উপেক্ষা করা হচ্ছে সেটিই ক্ষতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

মাধ্যমিক স্কুলেই কোচিং সেন্টারের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের মডেল টেস্ট

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১১

সরকারি স্কুলেই অনুষ্ঠিত হল কোচিং সেন্টারের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের মডেল টেস্ট। দু'টি প্রতিষ্ঠান জায়গা না দিলেও অপর তিনটি প্রতিষ্ঠানের দিনভর প্রকাশ্যে মডেল টেস্টের নামে নগরীর একটি কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ হাতিয়ে নিয়েছে অর্ধ লক্ষাধিক টাকা। যা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক কোচিং নির্ভর শিক্ষা বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদনের ফলে টনক নড়ে সংশ্লিষ্টদের। যার অংশ হিসেবে গত শুক্রবার নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডের পাইওনিয়ার স্কুলের নির্ধারিত কেন্দ্র রাতারাতি পরিবর্তন করে মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোডের এ্যাংকর কোচিংয়ের নিজস্ব বাড়িতে নেওয়া হয় মডেল টেস্ট। এরপর গতকালকের নগরীর ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের নির্ধারিত মডেল টেস্ট নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। বিগত ৮ অক্টোবর নগরীর মডেল স্কুলে ঐ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন-তারিখ থাকলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সেটির তারিখ পরিবর্তন করে করা হয় ১২ নভেম্বর। কিন্তু এরই মধ্যে জেএসসি পরীক্ষাসহ অন্যান্য কারণে মডেল স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেন্যু দিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় সেলিম স্যারের ব্যাচের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠানের জন্য পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খান-এ-সবুর মহিলা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন কোচিং কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে খান-এ-সবুর মহিলা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে গতকালের মডেল টেস্টের জন্য লিখিত অনুমতিও দেওয়া হয়। তবে প্রশাসনিক ঝামেলা এড়াতে ৫ নভেম্বরের ন্যায় গতকালকের মডেল টেস্টের স্থানও রাতারাতি পরিবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে অন্যান্য কোচিংয়ের খবর দিয়ে বিষয়টি গোপন রেখে কয়লাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে সকল পরীক্ষার্থীকে নিয়ে অভিভাবকদের হাজির হবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

কোচিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক গতকাল শুক্রবার যথারীতি অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে সেখানে গেলে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানো হয় কয়লাঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গগনবাবু রোডস্থ সবুরননেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এ দু'টি স্কুলে প্রথম পর্বের পরীক্ষা নেওয়া হলেও বিকেল তিনটা থেকে ২য় পর্বের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র গগনবাবু রোডের সবুরননেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে।

এ প্রসঙ্গে একটি সূত্র জানায়, কোচিং কর্তৃপক্ষ কয়লাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরাবর দেওয়া আবেদনপত্রে শুধুমাত্র স্কুলের মিলনায়তন ভাড়া নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেও সকালে সরেজমিন স্কুলে গিয়ে দেখা যায় সরকারি স্কুলের ক্লাশ রুমেই মডেল টেস্ট নেয়া হচ্ছে। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ এনে বিকেলে পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল করা হয়।

ফলে বিকেলে সকলের পরীক্ষা নেওয়া হয় সবুরননেছা স্কুলে। যেখানে মডেল টেস্ট নেওয়ার পাশাপাশি মাইকিং করে শিক্ষার্থীদের আহ্বান করা হচ্ছিল। বিষয়টি কতটা আইনসম্মত সে বিষয়ে ব্যাখ্যা না দিলেও কেএমপি'র সহকারি কমিশনার (সিটিএসবি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, পাইওনিয়ার স্কুল ও খান-এ-সবুর মাদ্রাসায় উক্ত ব্যাচের মডেল টেস্টের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি তাদেরকে জানানো হয়নি।

এদিকে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কোচিং সেন্টারের সিন্ডিকেট মডেল টেস্ট নেয়ার জন্য কিভাবে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল জানতে চাইলে কোনো প্রকার মন্তব্য করতে রাজী হননি সবুরননেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিরান নাহার। তার ব্যবহৃত ০১৭১১-০৪৭৪৪৭ নম্বর মোবাইলে ফোন করার পর 'আমি সাংবাদিকদের কাছে এর জবাব দিতে বাধ্য নই' বলে মোবাইলটি বন্ধ করে রাখেন। তাছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা জেলা কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমানের মোবাইলে একাধিকবার রিং করা হলেও তিনি সেটি রিসিভ করেননি। গতকাল সবুরননেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে একাধিক অভিভাবকের সাথে কথা হলে তাদের অনেকেই মডেল টেস্ট বাণিজ্যের বিরোধীতা করেন। জনৈক কলেজ শিক্ষক বলেন, কোচিং সেন্টারগুলো এমনভাবে সিন্ডিকেট তৈরী করে রেখেছে যাতে মডেল টেস্টসহ কোচিং কর্তৃপক্ষের যেকোন অবৈধ দাবী পূরণে বাধ্য হন। শিখন কোচিংয়ের সিলভি, সেলিম স্যারের ব্যাচের আবিদ, বিদ্যানিলয়ের সাদিয়া সুলতানা, নান্নু স্যারের ব্যাচের ফাহিম আহমদসহ একাধিক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের সাথে এ প্রতিবেদকের কথা হলে তারা জানান, যেহেতু পরীক্ষাটি গত মাসে হওয়ার কথা ছিল সেহেতু আগেই ফি দেয়ার কারণে তারা তাদের সন্তানদেরকে মডেল টেস্ট নামের কোচিং বাণিজ্যের এ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য এসেছেন।

গতকালকের সেলিম স্যারের ব্যাচ আহুত মডেল টেস্টে অন্যান্য যেসব কোচিংয়ের শিক্ষার্থী অংশ নেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নলেজ হোম (নান্নু স্যারের ব্যাচ),পাঞ্জেরী (আব্দুল কাদের), শিখন (আফরুল স্যারের ব্যাচ), এ্যাংকর (বাচ্চু স্যারের ব্যাচ), বিদ্যানিলয়, আমানত স্যারের ব্যাচ প্রভৃতি।

অপর একটি সূত্র জানায়, গতকাল সকালে একই সময় খুলনা জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত নগরীর কাস্টমস ঘাটস্থ করোনেশন কারিগরি বিদ্যালয়ে আমানত স্যারের ব্যাচের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও ওই স্কুলে গতকাল বেলা সাড়ে ১২টায় গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আঃ কাইউম খানকে পাওয়া যায়নি। সকালে নিজস্ব মডেল টেস্ট হলেও বিকেলে সবুরননেছা স্কুলে আমানত স্যারের ব্যাচের অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায়। এভাবে প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিনিয়ত কোচিং বাণিজ্যের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হলেও সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁধে বোঝা বইয়ে দেওয়া ছাড়া তেমন কোনো ফল বয়ে আনতে পারছেনা বলেও মনে করেন অনেক অভিভাবক। যা' নিয়ে এখনই সংশ্লিষ্টদের সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলেও অভিভাবকদের অভিমত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বদলী হওয়া শিক্ষকরা আবারও বহাল তবিয়তে, কোচিং ব্যবসা জমজমাট

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১২

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বদলী হওয়া খুলনার দু'টি নামকরা সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা আবারও স্ব-স্থানে ফিরে এসে রয়েছেন বহাল তবিয়তে। শুধুমাত্র কোচিং ব্যবসা টিকিয়ে রাখতেই সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে একে একে সকল শিক্ষক যথাস্থানে এসে জমজমাটভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের ওই ব্যবসা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, খুলনা জিলা ও করোনেশন স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে চাকরী করে আসার সুবাদে কতিপয় শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি কোচিংয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে এ দু'টি স্কুলে ওইসব শিক্ষকদের থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামী জিলা ও স্ত্রী করোনেশন স্কুলের শিক্ষক হওয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রিত কোচিংয়ে এ দু'টি স্কুলে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রী অন্য কোচিংগুলোর চেয়ে বেশী। আর ওই কোচিং ব্যবসা টিকিয়ে রাখার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অনেককেই ম্যানেজ করে চলতে হয়। তবে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ওইসব অনিয়মের দূর্গে আঘাত হানা হয়। কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত অনেক শিক্ষককেই একে একে বদলী করা হয় যশোর, তালা, নড়াইলসহ বিভিন্ন স্থানে। ওইসব শিক্ষকদের বদলীর কারণে খুলনায় তাদের কোচিংয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে যায়। এক পর্যায়ে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে বিভিন্নভাবে তদবির করে স্ব-স্থানে ফিরে আসেন অনেকেই। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন খুলনা জিলা স্কুলের মোঃ আব্দুল খালেক, মোঃ ফারুকুল ইসলাম, শেখ আকরামুজ্জামান, মোঃ আমানত আলী হাওলাদার, মোঃ শাহীন আলম, আব্দুস সামাদ, নমিতা রাণী ঢালী, দীপক রঞ্জন বিশ্বাস, হুসনা হেনা, হেমন্ত কুমার ঘোষ, অসীম কুমার কুন্ডু এবং করোনেশন বালিকা বিদ্যালয়ের বিশ্বাস শামসুন্নাহার, মোঃ হাফিজুর রহমান, রেহানা পারভীন, কাকলী দাস, সাহিদা পারভীন, ফারকুন্নাহার ও ঠাকুরদাশ তরফদার।

এদের মধ্যে জিলা স্কুলের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের জনৈক শিক্ষক কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ইংরেজী শিক্ষক সেজে বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছেন কোচিং ব্যবসা। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক হলেও অনেকেই তাকে জানেন ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে। আবার ওই শিক্ষকের ব্যাচে না পড়লে ছাত্রদের ওপর চালানো হয় নির্যাতন। ফলে ছাত্ররা তার কোচিংয়ে পড়তে বাধ্য হয় বলেও জনশ্রুতি রয়েছে, এসব কারণে ওই শিক্ষককে তত্ত্বাবধায়ক আমলে তালায় বদলী করা হলে অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু পরে ওই শিক্ষক এ স্কুলে যোগদান করেই ইংরেজীতে অনার্স/মাস্টার্সধারী একজন ইংরেজী শিক্ষককে অন্যত্র বদলী করিয়ে একক রাজত্ব কায়েম করেন

ওই স্কুলের অপর এক ক্রীড়া শিক্ষক অবসরে গেলেও তিনি ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। নগরীর ৬৮/২ হাজী মহসীন রোডে তিনি বিলাসবহুল বাড়িতে বিশাল সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছেন মানবিক কারণে তাকে স্কুলে ক্লাশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া জিলা করোনেশনের শিক্ষক হওয়ার সুবাদে অনেক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এসব শিক্ষকের নাম ব্যবহার করে বাজারে ছাড়ছে তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি গাইড। বিনিময়ে ওইসব শিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে ডোনেশন। অর্থাৎ বই লিখার সাথে কোনো প্রকার সম্পৃক্ততা না থাকলেও শুধুমাত্র নামের কারণেই শিক্ষার্থীরা ওই বই কিনে ভর্তির সুযোগটি নিতে চায়। তাছাড়া বিভিন্ন কোচিং সেন্টারেও ওই বই কিনতে বাধ্য করা হয়। যদিও কয়েকটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক এই প্রতিবেদককে বলেন, ভর্তি গাইডগুলো ফলো না করা হলেও শুধুমাত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও ওইসব শিক্ষককে খুশী করতে শিক্ষার্থীদের বই কিনতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে অনেক নিম্ন ও মধ্যবিত্ত তাদের সন্তানদের ভর্তি কোচিং করাতে গিয়ে বিপুল অর্থ খরচ করতে বাধ্য হন। তবে বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারে জনৈক শিক্ষক বলেন, সরকারি চাকরী করতে গেলে নিয়ম-মাফিক বদলী হতেই পারে। আবার ফিরে আসাটাও তদ্রুপ, এখানে কোনো বাণিজ্যের অবকাশ নেই বলেও দাবী ওই শিক্ষকের।

অবৈধ বই দিয়েই কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা জীবন শুরু

লাভবান হয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ও কিছু শিক্ষক

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১৩

অবৈধ বই দিয়েই শুরু হয় খুলনার কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাজীবন। ৮ম শ্রেণী থেকে নীচের ক্লাশের সকল প্রকার নোট/গাইড নিষিদ্ধ থাকলেও প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে এসব বই। ভর্তি গাইড দিয়েই যেমন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধাপ শুরু করতে হয় তেমনি প্রতিটি ক্লাশের জন্যই বাজারে পাওয়া যায় নোট/গাইড বই। বইগুলো চড়ামূল্যে বিক্রি করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার ও কতিপয় শিক্ষক লাভবান হলেও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে অভিভাবকদের।

নগরীর ক্লে রোডস্থ নুর লাইব্রেরী, কেডি ঘোষ রোডস্থ হাসান বুক ডিপোর সাইন বোর্ডের অন্তরালে ইসলামিয়াসহ বেশ কিছু বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা গেছে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৬/৭ প্রকারের গাইড বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্যানডোরা, প্রোগ্রেস, ফেমাস, তানিয়া, মোহনা, অগ্রদূত, প্রমিস প্রভৃতি। এ গাইডের মধ্যে প্যানডোরা ও অগ্রদূত পৃথক দু'টি বই হলেও ভিতরের প্রতিটি পৃষ্ঠার লেখা সবকিছুই এক। এ দু'টি গাইডের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দৌলতপুরের ইসলামিয়া লাইব্রেরী। তবে প্যানডোরা গাইডটির পরিবেশক হিসেবে কুমিল্লার রাজগঞ্জের আতিক লাইব্রেরীর নাম রয়েছে। তাছাড়া দু'টি গাইডের রচয়িতা হিসেবে মোঃ শাহরিয়ার সরকারের নাম থাকলেও প্যানডোরার সম্পাদনায় নাম রয়েছে ইন্দিরা দেবনাথ, এ কে এম আমিনুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল হাফিজ, এ.কে. এম মনিরুল হক ও স্বরেজ কান্তি দেবের নাম। হুবহু একই বই হলেও অগ্রদূতের সম্পাদক হিসেবে কারো নাম নেই।

প্রোগ্রেস ভর্তি পরীক্ষা-২০১১ নাম দিয়ে প্রগ্রেসিভ প্রকাশনীর বইটির রচনা করেছেন এ এইচ কোচিং সেন্টারের পরিচালক মোঃ আমজাদ হোসেন, প্রগতি কোচিং সেন্টারের পরিচালক মোঃ তোফায়েল আহমেদ, শ্যামল কুমার শর্মা এবং দেবাশীষ কুমার মন্ডল (বিদ্যুৎ)। এ বইটির সম্পাদনায় রয়েছেন এ, কে, এম রেজাউল করিম। ফেমাস লাইব্রেরীর প্রকাশনায় ফেমাস গাইডের রচয়িতা হিসেবে ৩ জনের নাম রয়েছে। এরা হলেন খুলনা জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সেন্ট যোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক (গণিত) মদন মোহন পাল ও মোছাম্মৎ পারভীন আক্তার। তানিয়া প্রেস অ্যান্ড ও পাবলিকেশন্স পরিবেশিত তানিয়া ভর্তি গাইডটি রচনা করেন আকলিমা খাতুন, অঞ্জন চন্দ্র ও বেবী রাণী সাহা। এই গাইডটির সম্পাদনায় নাম রয়েছে নিখিল দেবনাথ ও মোস্তফা কবীরুজ্জামানের।

দিনাজপুরের কলম প্রকাশনী প্রকাশিত প্রমিস গাইডের রচনায় নাম রয়েছে মোঃ সোহেল মুন্না ও মোঃ সালাহউদ্দীন খোকনের। সার্বিক সহযোগী হিসেবে দিনাজপুর জিলা স্কুল ও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র ক্লাসিক্যাল টিচার পুলীন বিহারী চক্রবর্ত্তীর নাম রয়েছে। এছাড়া সহযোগী নাম রয়েছে মাসুদ রানা, জিয়া, ফারহানা, লতিফ, তাজকুল, জাহিদ, এমদাদ, হারুন, আব্দুল আলিম,

মাদ্রাসা শিক্ষাও কোচিং নির্ভর, দাখিলের ফরম পূরণে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১৪

মাদ্রাসা শিক্ষাও কোচিং নির্ভর হয়ে পড়েছে। খুলনা মহানগরীতে একাধিক মাদ্রাসা কোচিং গজিয়ে উঠার পাশাপাশি প্রতিটি মাদ্রাসারই দাখিলের ফরম পূরণে আদায় করা হচ্ছে অতিরিক্ত ফি। বোর্ড নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ কোচিং ফি হিসেবে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা যায়, নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোডের খান এ সবুর মহিলা কামিল মাদ্রাসার কতিপয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নগরীর টিবি ক্রস রোডে গড়ে উঠেছে রাহবার নামের একটি মাদ্রাসা কোচিং সেন্টার। ওই মাদ্রাসার ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট কোচিংয়ে পড়া বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে মাদ্রাসা প্রধানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাগ নেওয়ার বিষয়টিও জনশ্রুতি রয়েছে। যদিও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আব্দুস সোবাহান বিষয়টি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কোচিং সেন্টার থেকে তার ভাগ নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এছাড়া বানরগাতিতে সামিট কোচিং, সোনাডাঙ্গায় খুলনা কোচিং, চ্যালেঞ্জার কোচিং, প্যারাডাইস কোচিংসহ একাধিক কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে নগরীর মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে। নগরীর সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার বিজ্ঞান বিভাগের জনৈক শিক্ষকের ব্যাচে পড়া বাধ্যতামূলক বলেও অভিযোগ রয়েছে। যেসব ছাত্র ওই শিক্ষকের ব্যাচে না পড়বে তাদের কৌশলে ফলাফল খারাপ করারও নজির রয়েছে। এছাড়া উক্ত শিক্ষক ঢাকা থেকে 'এহতেমাম' নামের একটি সাজেশন এনে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্রি করেন বলে জানা যায়। যা প্রতিটি ছাত্রের কেনা বাধ্যতামূলক। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নগরীর খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা, খান-এ-সবুর মহিলা মাদ্রাসা, দারুল কুরআন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, তা'লিমুল মিল্লাত রাহমাতিয়া মাদ্রাসা, দৌলতপুর আলিম মাদ্রাসা, মিরের ডাঙ্গা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, শিরোমনি আলিম মাদ্রাসা, বিশ্ব ইসলাম মিশন দাখিল মাদ্রাসা, দক্ষিণ তুঁতপাড়া আহম্মেদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, হাজি আব্দুল মালেক ছালেহিয়া দারুচ্ছুন্না দাখিল মাদ্রাসা, মোহাম্মাদনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, আল ফারুক সোসাইটি দাখিল মাদ্রাসা, ক্রিসেন্ট দাখিল মাদ্রাসা, দেয়ানা পাবলা দাখিল মাদ্রাসা, দেয়ানা মহিলা দাখিল মাদ্রাসা ও হিলাতলা আহমেদিয়া দাখিল মাদ্রাসার অধিকাংশেই দাখিলের ফরম পূরণ সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়া প্রায় প্রতিটি মাদ্রাসায়ই অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত ফরম পূরণের টাকা নেওয়া হলেও বোর্ড ফি মাত্র ১২শ' টাকা। অতিরিক্ত অর্থ কোচিং ফি হিসেবে নেওয়া হয় এবং সকাল ৮টা থেকে ১টার মধ্যেই এসব কোচিং ক্লাশ হয় বলেও জানা যায়।

কোচিং সেন্টারের সাথে স্কুলের হলুদ ও নীল খামের সম্পর্ক

স্পেশাল মডেল টেস্টের নামে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১৫

খুলনা মহানগরীর আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠা কোচিং সেন্টারগুলোর সাথে নামকরা স্কুলের রয়েছে হলুদ ও নীল খামের সম্পর্ক। আর এ খাম বদলের মাধ্যমেই স্কুলগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় বলে তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়। হলুদ খামের নগদ অর্থের বিনিময়ে নীল খামের দেওয়া প্রশ্নপত্রের আলোকেই কোচিংগুলোতে নেওয়া হয় স্পেশাল মডেল টেস্ট। এভাবেই চলছে খুলনার শিক্ষা ব্যবস্থা।

নগরীর গুটিকয়েক কোচিং সেন্টারের সাথে নগরীর হলুদ ও নীল খামের বদলের কারণেই পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তনের এ বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে অনুসন্ধানে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, নগরীর প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে কোন কোন কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের ফলাফল ভালো দেখা যায়। ক্লাশে খুব একটা ভালো ছাত্র-ছাত্রী না হয়েও স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে কিভাবে কম পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করে সেটি নিয়েও চিন্তিত থাকেন অভিভাবকরা। আর এসব চিন্তার বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়েই বেরিয়ে এসেছে এসব নানা তথ্য। সরেজমিন বিভিন্ন স্কুল ও কোচিং সেন্টারে গিয়ে অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, যেসব ছাত্র-ছাত্রী অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে কোচিংয়ে পড়ে না তাদের ফলাফল খুব একটা ভালো হয় না। এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের ওই সূত্রটি বলেছে, যেসব কোচিং সেন্টারের সাথে স্কুলের শিক্ষক কর্তৃপক্ষের সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে তাদের কোচিংয়ের ছেলে মেয়েরা স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। এর কারণ হিসেবে কয়েকজন অভিভাবক জানান, স্কুলগুলোর প্রতিটি পরীক্ষার আগেই ওইসব কোচিং সেন্টারে স্পেশাল মডেল টেস্ট নামের পরীক্ষা হয়। সপ্তাহে একাধিক পরীক্ষা নিয়ে স্কুলের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা উল্লেখ করে একটি সূত্র জানায়, যেসব কোচিং সেন্টারে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার আগে স্পেশাল মডেল টেস্ট হয়, সেসব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করা হলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে। নগরীর মির্জাপুর রোডের একটি কোচিং সেন্টারের কথা উল্লেখ করে ওই সূত্রটি জানায়, ওই কোচিংয়ে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিমাসে ওই কোচিংয়ে আয়ের পরিমাণ ছয় লক্ষাধিক টাকা। আর এ আয়ের একটি অংশ রাখা হয় স্কুলগুলোর জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, হলুদ খামে নগদ অর্থ চলে যায় স্কুলে আর স্কুলের প্রশ্নপত্র নীল খামের মাধ্যমে চলে যায় কোচিং সেন্টারে। তবে কোচিং কর্তৃপক্ষও এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করে থাকেন বলে জানা যায়।

আর তা হচ্ছে স্কুল পরীক্ষার আগে একাধিক স্পেশাল মডেল টেস্ট নিয়ে পর্যায়ক্রমে কোচিং থেকেই স্কুলের প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণে পরীক্ষার পর দেখা যায় যে, কোচিং গুলোর সাথে স্কুলের খাম বদল হয় সেসব কোচিংয়ের শিক্ষর্থীরা ভালো ফলাফল করলেও অন্যদের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না।

এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক এ প্রতিবেদককে বলেন, এমনটি হয়ে থাকলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলেও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় কোচিং সেন্টারগুলোর ছাড়পত্র বাণিজ্যের মাধ্যমে

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১৮

সরকারি-বেসরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার ছাড়পত্র (টি.সি) প্রয়োজন হলেও কোচিং সেন্টারের তা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে কারণে অভিভাবকদের কাছ থেকে কোচিং কর্তৃপক্ষ হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারি-বেসরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাড়পত্র (টি.সি)। শুধুমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা নিবন্ধিত কিন্ডার গার্টেনগুলোই দিতে পারবে এ ছাড়পত্র। কিন্তু খুলনার জিলা-করোনেশন, মন্নুজান, ল্যাবরেটরী ছাড়াও যেসব বেসরকারি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেয় তার সিংহভাগই কোন না কোন কোচিং সেন্টারের সাথে যুক্ত থাকে। বছরের শুরু থেকে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে শুরু থেকেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কোন স্কুলে না দিয়ে প্রাইভেট পড়িয়ে বা ব্যাচের মাধ্যমে পড়াশোনা করিয়ে ভর্তি উপযোগী করে তোলেন। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন স্যারের ব্যাচ, কোচিং সেন্টার বা বাসায় পড়িয়ে তার সন্তানকে ভালো স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটে যখন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তাদের সন্তানটি ভর্তির জন্য যোগ্য প্রমাণিত হয়। আর তখন দারস্থ হতে হয় বিভিন্ন স্কুল কিংবা কিন্ডারগার্টেনের। সারা বছর কোচিং সেন্টারে না পড়িয়ে যখন স্কুল থেকে ছাড়পত্র আনার চেষ্টা করা হয় তখনই শুরু হয় স্কুলগুলোর বাণিজ্য। দাবি করা হয় তার সন্তান ওই স্কুলে কোনদিন ক্লাশ না করলেও পুরো বছরের বেতনসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অভিভাবকরা পুরো অর্থ দিয়ে কোন কোন স্কুল বা কিন্ডারগার্টেন থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করেন।

অনুসন্ধানে জনা যায়, অভিভাবকদের কাছ থেকে কোন কোন কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই ছাড়পত্রের জন্য বাড়তি অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। ওইসব কোচিং সেন্টারগুলোর সাথে নগরীর কয়েকটি টি.সি বাণিজ্যের সাথে জড়িত স্কুল থেকে অর্থের বিনিময়ে ছাড়পত্র এনে দেওয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে ইতোমধ্যেই অভিভাবকদের কাছ থেকে একশ' থেকে দুইশ' টাকা করে প্রতিটি টি.সি'র জন্য আদায় করা হচ্ছে বলেও শোনা যাচ্ছে।

অনেক সময় অস্তিত্বহীন স্কুলের নাম দিয়ে নামসর্বস্ব প্যাড ও সীল তৈরী করে কোচিং কর্তৃপক্ষই ছাড়পত্র তৈরী করে দিয়ে থাকেন এমন অভিযোগও রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হলেই এর প্রমাণ মিলবে বলেও সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। নিজেদের কোন ছাড়পত্র দেওয়ার বৈধতা না থাকলেও নগরীর সরকারি স্কুলে ভর্তির জন্য প্রতি বছর কয়েকটি কোচিং সেন্টার ফলাও করে পোস্টার ছাপিয়ে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পুস্তিকায় উল্লেখ করে থাকে তাদের কোচিং এ বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি চলে আসলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই।

অপর একটি সূত্র জানায়, কোচিং সেন্টার থেকে যখনই ছাড়পত্র চাওয়া হয় তখনই অর্থ আয়ের পাশাপাশি নিজের কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থী হিসেবে ভর্তির প্রমাণপত্র তৈরীর দিকেও কোন কোন কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষ বেশী নজর দিয়ে থাকেন। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের না পড়িয়েও এক বছরের বেতন আদায় করা হচ্ছে তেমনি ওই কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র বা ছাত্রী হিসেবে জিলা-করোনেশন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এটিও প্রচার করা যাবে। এ ধরনের টি.সি বাণিজ্যের সাথে যেসব প্রতিষ্ঠানের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, উত্তম স্যারের ব্যাচ, মরিয়ম কিন্ডার গার্টেন, সৈয়দ আলী, হোসেন কলেজিয়েট স্কুল, অংকুর বিদ্যাপিঠ, জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন, সানরাইজ কোচিং সেন্টার, ক্যামেলিয়া কিন্ডার গার্টেন ইমিতা শিশু শিক্ষা নিকেতন প্রভৃতি।

এছাড়া করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক নিজেই অস্তিত্বহীন বিভিন্ন স্কুলের নাম দিয়ে ছাড়পত্র তৈরী করে ছাত্র-ছাত্রীদের সরবরাহ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জনৈক অভিভাবক এ প্রতিবেদককে বলেন, কোচিং এ পড়াশোনা হলেও যখন তার সন্তান ভর্তির সুযোগ পাবে তখন ছাড়পত্রের জন্য কোন অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হলো কিনা তা দেখার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

।। প্রতিবাদ ।।

'স্কুল শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসাই নষ্ট করছে শিক্ষার প্রকৃত মান' শীর্ষক গতকালের প্রতিবেদনের একাংশের প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারি করোনেশনের মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঠাকুরদাস তরফদার। প্রতিবাদলিপিতে ঠাকুরদাস তরফদার বলেন, তিনি কোন কোচিং বাণিজ্যের সাথে কখনও জড়িত ছিলেন না বা এখনও নেই।

নগরীতে শতাধিক কোচিং সেন্টার থাকলেও ভ্যাট নিবন্ধনের তালিকাভুক্ত মাত্র ৪৩ টি

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-১৯

খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে শতাধিক কোচিং সেন্টার। এছাড়া বিএল কলেজ, কমার্স কলেজ, বয়রা মহিলা কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আশে-পাশে গড়ে উঠেছে আরও অর্ধশতাধিক কোচিং ও ব্যাচ। কিন্তু কেসিসির ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) নিবন্ধনের তালিকায় রয়েছে মাত্র ৪৩টি প্রতিষ্ঠানের নাম।

কাস্টমস্ এক্সাসাইজ ও ভ্যাট খুলনার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সূত্রটি জানায়, নগরীতে কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে হলে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রমাণপত্র থাকতে হবে। আর এ জন্য সংশ্লিষ্ট কোচিং পরিচালকের ছবি, খুলনা সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক হিসাবের প্রমাণপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং আয়কর বিভাগের টিন সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি দিয়ে ভ্যাট সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। কাস্টমস্ এক্সাসাইজ ও ভ্যাট খুলনার তালিকায় নগরীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে লাইসিয়াম কোচিং, কনফিডেন্স কোচিং, বিকল্প কোচিং, প্রতিভা কোচিং, নেপচুন কোচিং, শিক্ষা সাগর কোচিং, বিদ্যাঙ্গন কোচিং, সেন্টারস্ কোচিং, ফোকাস কোচিং, সানরাইজ কোচিং, সাইফুরস, ওমেগা, ইউনিএইড, প্রাইমেট কোচিং, অনার্স কোচিং, ইউরেকা কোচিং, কনকর্ড কমার্স কোচিং, প্রগ্রেস কোচিং, পদার্থ বিদ্যা কোচিং, দি স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, অগ্রদূত কোচিং, সানফ্লাওয়ার টিউটোরিয়াল, ই'হক এডুকেশন সোসাইটি, রেনেসাঁ কোচিং, সাকসেস কোচিং, এফ এম ইনস্টিটিউট, থ্রি ডক্টরস কোচিং, দীনবন্ধু কোচিং, আইডিয়াল কোচিং, স্মরণী কোচিং, লিজার কোচিং, সাকসেস, একুশে কোচিং, লিটু স্যারের ব্যাচ, রিলায়েন্স টিউটোরিয়াল হোম, শিখন কোচিং, ঢাকা কোচিং, ইউসিসি, অধ্যয়ন কোচিং, প্রনিধি টিউটোরিয়াল, প্যারাসল কোচিং, সেতু কোচিং এবং নিউরন কোচিং সেন্টার।

মাত্র ৪৩টি কোচিং সেন্টারের বৈধ ভ্যাট সার্টিফিকেট থাকলেও নগরীর আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। সাইনবোর্ড-ব্যানার টানিয়ে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসব কোচিং ব্যবসা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলেও অধিকাংশেরই নেই কোন বৈধ কাগজপত্র। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ব্যাপক ধড়-পাকড় শুরু হলে কিছু প্রতিষ্ঠান তড়িঘড়ি করে ভ্যাট ও আয়করের তালিকায় আসলেও সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাও ঝিমিয়ে পড়েছে। আবার ভ্যাট নিবন্ধনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে আঁতাত করেও কোনো কোনো কোচিং সেন্টার প্রকাশ্যে বিনা ট্যাক্সে কোচিং ব্যবসা চালিয়ে গেলেও সংশ্লিষ্টদের যেন কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। প্রশাসনিক এ নিরবতার কারণ সম্পর্কে কোন সঠিক জবাব না দিতে পারলেও ভ্যাট নিবন্ধনের সাথে জড়িত কর্মকর্তারা 'চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে' বক্তব্য দিয়েই দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

অবৈধ কোচিং বাণিজ্যের কথা তুলে ধরে কয়েকজন অভিভাবক এ প্রতিবেদককে বলেন, বৈধ-অবৈধ দেখার কোন সুযোগ নেই। কেননা যে আশা নিয়ে জিলা-করোনেশনসহ নগরীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে তাদের সন্তানদেরকে ভর্তি করানো হয়েছিল সে ধরনের লেখা-পড়া স্কুলে হয় না বলেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে কোচিং নির্ভর হতে হচ্ছে। এজন্য তারা স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মান বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং গজিয়ে ওঠার পেছনে স্কুলগুলোই দায়ী। এমনকি যেসব স্কুলের শিক্ষকরা চাকুরি বিধি লঙ্ঘন করে নামে-বেনামে কোচিং সেন্টার গড়ে তুলেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হলে অবৈধ কোচিং ব্যবসা বন্ধ হবে, নতুবা সম্ভব নয়।

খুলনার জেলা প্রশাসক মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার বলেন, কোচিং সেন্টার বৈধ থাকুক আর অবৈধ থাকুক সে বিষয়ে তার কিছুই করার নেই। এজন্য কেসিসি, আয়কর ও ভ্যাটসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোই দায়িত্ব পালন করবে।

কাস্টমস্ এক্সাসাইজ ও ভ্যাট খুলনার সুপার আকুঞ্জি ইউনুস আলী বলেন, তাদের নিয়োজিত কর্মকর্তারা পরিদর্শনের পর নিবন্ধনের আওতায় এনে কোচিংসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভ্যাটের আওতায় আনার চেষ্টা করছেন। ওই অফিসের একজন পরিদর্শক বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠান ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় নেই তাদের তালিকা করে প্রথমে চিঠি দেওয়া হয় এবং পরে বাধ্যতামূলক বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত খুলনার কোনো কোচিং সেন্টার ভ্যাট না দেওয়ার কারণে বাধ্যতামূলক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো উদাহরণ দিতে পারেননি ওই কর্মকর্তা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খুলনার কর কমিশনারের কার্যালয়ের জনৈক কর্মকর্তা বলেন, তারাও অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে পত্র দেওয়ার পাশাপাশি বাধ্যতামূলক বন্ধ করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। কিন্তু তাদের কাছেও বাধ্যতামূলক বন্ধের কোন নজির নেই।

নগরীর কোন কিন্ডার গার্টেন ও কোচিং সেন্টারেরই নেই কেসিসি'র নিবন্ধন

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২০

খুলনা নগরীতে পৃথক তিনটি এসোসিয়েশনভুক্ত কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা প্রায় একশ'। যদিও সুনির্দিষ্ট কোনো তালিকা নেই এসোসিয়েশনগুলোর কাছে। এছাড়া এসোসিয়েসনভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে আরও কয়েকটি। আবার কোন প্রকার সমিতি না থাকলেও শুধুমাত্র সাইনবোর্ডধারী কোচিং সেন্টারের সংখ্যাই শতাধিক। সাইনবোর্ড ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বাসায় গড়ে উঠেছে কোচিং ও ব্যাচ। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেসিসির নিবন্ধনের আইন হলেও সে আইন বিগত এক বছরেও কার্যকর হয়নি। অর্থাৎ রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কিন্ডার গার্টেন ও কোচিং সেন্টারগুলো বছরের পর বছর চলে আসলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সচেতন মহলের প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে অনেকটা নিরব।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন ও সমন্বিতকরণকল্পে প্রণীত আইনের ১১১(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'এ আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ২০০৯ সালে ১৫ অক্টোবর থেকে কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না।'

এছাড়া এ আইনের ১১১(২) ধারায় বলা হয়, 'কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার নিবন্ধনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফিস জমা দিয়ে মেয়র বরাবরে আবেদন করিতে হইবে এবং মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তা, তদন্ত করিয়া সন্তুষ্ট হইলে কর্পোরেশনের সভার অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টারকে নিবন্ধন করিবেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে, উহাদের মাসিক টিউটোরিয়াল বা কোচিং ফিস ধার্য করিয়া দিবেন।'

একই ধারার ৩ উপধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে যেসকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সেই সকল প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন কর্মকর্তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য হইবে'। গত বছর ১৫ অক্টোবর ওই আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলেও গতকাল খুলনার সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, আইনটি এখনও তার হস্তগত হয়নি। অথচ এ আইনটি www.lgd.gov.bd/downloads/local_government(CityCorporation)_Act,2009.pdf ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ওই আইনের ১১৩ ও ১১৪ ধারায় আইন লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। রয়েছে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নবায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণও। এ ব্যাপারে সিটি মেয়র এ প্রতিবেদককে বলেন, আইনটি তার হস্তগত হলে অবশ্যই কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেননা কেসিসি এলাকায় কোনো প্রকার অবৈধ প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না।

এ ব্যাপারে গতকাল বৃহস্পতিবার কেসিসির শিক্ষা শাখায় গিয়ে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছেও এ ব্যাপারে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই। নিবন্ধনের জন্য কত ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে তারও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই কেসিসির শিক্ষা শাখায়। তবে কিন্ডারগার্টেন ও কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'হাজার টাকা ফিস নির্ধারণ করা হতে পারে বলে কেসিসির অপর একটি সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন খুলনা শাখার সাধারণ সম্পাদক শ্যামল কুমার বলেন, তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন না থাকলেও এসোসিয়েশনের রয়েছে। সুতরাং যেসব প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েশনের আওতাভুক্ত তাদের আর আলাদাভাবে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তবে সাবেক মেয়রের আমলে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে এখনও নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। তবে আইনের দৃষ্টিতে কিন্ডারগার্টেন যদি অবৈধই হবে তাহলে কেসিসি'র পক্ষ থেকে তাদের এসোসিয়েশনকে চিঠিপত্র দেয়া হয় না কেন এ প্রশ্নও তিনি তুলে ধরেন। একই নামের অপর এসোসিয়েশনের সভাপতি গাউসুল আযম হাদী বলেন, তাদের আওতাভুক্ত এসোসিয়েশনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন রয়েছে। কেসিসি থেকে ট্রেড লাইসেন্সের কথা বলা হলেও নিবন্ধনের জন্য বলা হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তবে নিবন্ধনের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তা' মেনে নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। এদিকে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ওনার্স এসোসিয়েশনের খুলনা বিভাগীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মিনা অছিকুর রহমান দোলন বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেনের জন্য কোন নীতিমালা আসেনি। তবে নীতিমালা থাকা ভাল। যদি সরকার থেকে নীতিমালার কথা বলা হয় তাহলে তারা সেটি সাদরে গ্রহণ করবেন বলেও জানান। তবে কিন্ডারগার্টেনগুলোকে আগে তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হত না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন এসব প্রতিষ্ঠানে বই দেওয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

আবারও কোচিং সেন্টারের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের মডেল টেস্ট হলো নগরীতে

মুহিদ স্যার ও সেলিম স্যারের ব্যাচই মূল হোতা!

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২১

নগরীর গগনবাবু রোডস্থ সবুরননেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবারও অনুষ্ঠিত হল সিন্ডিকেট বাণিজ্যের মডেল টেস্ট। গুটিকয়েক কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ গতকাল শুক্রবার দিনভর ওই স্কুলে মডেল টেস্টের নামে আবারও অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীর কতবার চূড়ান্ত মডেল টেস্টর প্রয়োজন হয় সে প্রশ্ন যেমন দেখা দিয়েছে তেমনি এ বাণিজ্য আদৌ বন্ধ হবে না কি তা নিয়েও শঙ্কিত অনেকে।

সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুটি পর্বে কয়েকটি কোচিং সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা সবুরননেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মডেল টেস্টে অংশ নেয়। নগরীর নতুন বাজার মোড়ের সাকসেস কোচিং ও ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের ব্যাচের পরিচালক যথাক্রমে মহিদুজ্জামান মুহিদ ও সেলিম হোসেনের তত্ত্বাবধানে এ মডেল টেস্টে অংশ নেয় উক্ত দু'কোচিং এর শিক্ষার্থী ছাড়াও মিঠু স্যারের ব্যাচ, এ্যাংকর কোচিং, পাঞ্জেরী কোচিং ও নান্নু স্যারের ব্যাচের অনেক শিক্ষার্থী। দিনভর কোচিং সেন্টারের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের এ মডেল টেস্টে অংশ নেয় পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী। খুলনার নামকরা সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য এসব শিক্ষার্থীদের দিয়ে একাধিক মডেল টেস্টের নামে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হলেও প্রশাসন রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

তাছাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য একজন শিক্ষার্থীকে কতবার মডেল টেস্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয় সে প্রশ্ন জাগলেও কেন মডেল টেস্টের জন্য ষষ্ঠ বারের মত মেয়েকে নিয়ে এসেছেন জানতে চাইলে গতকাল সকালে জনৈক অভিভাবক বলেন, কোচিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না মানলে হয়তবা তার সন্তান ভাল স্কুলে ভর্তির সুযোগ নাও পেতে পারে। তাছাড়া কোচিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে পয়সা খরচ করে মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখা হলে যদি ভর্তির সুযোগ না পায় তাহলে দায়ভার অভিভাবকদের ওপর দেওয়ার আতংকে যতবারই ডাকা হয় ততবারই মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করানো হয় তাদের সন্তানদের।

এছাড়া সিন্ডিকেটের মডেল টেস্ট যতবারই হয়েছে ততবারই প্রবেশপত্রে লেখা হয়েছে চূড়ান্ত মডেল টেস্ট। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর জন্য কতবার 'চূড়ান্ত' বলে একাধিক মডেল টেস্ট নেয়া যেতে পারে তা' জানতে চাইলে সঠিক কোন জবাব দিতে পারেননি নগরীর ইকবাল নগরের সেলিম স্যারের ব্যাচের পরিচালক সেলিম। যদিও তিনি বলেছেন, চূড়ান্ত মডেল টেস্ট একবারই হয়। অথচ একাধিক শিক্ষার্থীর প্রবেশ পত্রে দেখা গেছে একাধিকবার চূড়ান্ত মডেল টেস্ট লিখে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। যা' নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ থাকলেও সন্তানদের ভর্তির খাতিরে কোন প্রতিবাদ করছেন না অনেকে।
এ ব্যাপারে গতকাল সকালে একাধিক নারী ও পুরুষ অভিভাবকের সাথে কথা হলে তাদের বক্তব্য

ছিল 'ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই বলার নেই'। তবে এ বাণিজ্যের মূল হোতা যে মুহিত স্যার ও সেলিম স্যারের ব্যাচ তাও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেন। এদিকে গতকাল শুক্রবার দিনভর গগনবাবু রোডের সবুরননেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হলেও তার জন্য কোন প্রশাসনিক অনুমোদন ছিল না বলে খুলনা মেট্রেপলিটন পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মিনারা নাহার বলেন, দু'হাজার টাকার ভাড়ার বিনিময়ে কোচিং সেন্টারকে পরীক্ষা নেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এমনকি আগামী শুক্রবারও তার স্কুল ব্যবহারের জন্য একটি কোচিং সেন্টারকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। তবে এ জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কোন সম্মতি আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছুটির দিনে কাউকে স্কুল ব্যবহারের জন্য দেওয়া হলে কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে তার ক্ষমতা রয়েছে। তবে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব সারোয়ার খান বলেন, স্কুলের যেকোন বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা একক ক্ষমতার অধিকারী নন। এজন্য কমিটির অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া গতকালকের কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্টের ব্যাপারটিও তাকে জানানো হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এভাবে নগরীর বিভিন্ন স্কুল ভাড়া নিয়ে কয়েকটি কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে মডেল টেস্ট নিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিলেও যেসব স্কুল ভাড়া নিয়ে পরীক্ষা হয় ওইসব টাকা কোথায় যায় সেটিও খাতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোচিং সেন্টারগুলোর ছবি বাণিজ্য ওপেন সিক্রেট

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২২

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, এস.এস.সি তে সাফল্য, ৫ম/৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়া এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ছবি ছাপিয়ে পোস্টারিং করে প্রতি বছর খুলনার কোচিং সেন্টারগুলো অভিভাবকদের আকৃষ্ট করতে বিশাল অংকের বাণিজ্য করে থাকে। বিগত কয়েক বছর ধরে এ বাণিজ্য ওপেন সিক্রেট হয়ে উঠলেও এ ব্যাপারে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। কোচিং সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলে বেরিয়ে এসেছে নানা তথ্য। ছবি বাণিজ্যের চিত্র তুলে ধরে সূত্রগুলো বলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, এস.এস.সি/এইচ.এস.সি এবং প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তির ফল প্রকাশের পরই বিভিন্ন কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ তাদের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরে শহরে পোস্টারিং করা ছাড়াও বিভিন্নভাবে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে থাকেন। একই চিত্র দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির পরও। একই শিক্ষার্থী একাধিক কোচিং সেন্টারে পড়ার সুযোগ অথবা যেকোন ভাবে কোচিংগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পূর্ব থেকেই ছবি রেখে এ বাণিজ্য করে থাকেন। নগরীর ইকবাল নগর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের একটি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি কোচিংয়ের নাম উল্লেখ করে ওই সূত্রগুলো বলছে, গতবছর থেকে শুরু হওয়া ওই কোচিং কর্তৃপক্ষ বছরের গোড়ার দিকে ৩৬/২৪ ইঞ্চি সাইজের রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে নগরীর বিভিন্ন স্থানে সাটিয়ে দেন। পোস্টারের শুরুতেই লেখা হয় 'প্রথম বছরেই ঈর্ষণীয় সাফল্য'। ওই কোচিংয়ের মাত্র ১৫ জন শিক্ষার্থী নগরীর দু'টি সরকারী স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেলেও পোষ্টারে স্থান পায় ৬৬ টি ছবি। অর্থাৎ মডেল টেষ্টের সময় বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছবিগুলো যোগাড় করে রেখে তা নিজের কোচিংয়ের শিক্ষার্থী বলে চালিয়ে দিয়ে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করা হয়। এছাড়া নগরীর দু'টি সরকারী স্কুলে ভর্তির সুযোগকেই মূলত সুযোগ বোঝালেও ওই কোচিংসহ ছবি বাণিজ্যের সাথে জড়িত কোচিংগুলো সেন্ট জোসেফস স্কুল, মন্নুজান মডেল স্কুল, পাবলিক স্কুল, ফাতেমা স্কুল, পাইওনিয়ার স্কুল, কলেজিয়েট স্কুলসহ অন্যান্য স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়াদের ছবি ছাপিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদাসম্পন্ন বোঝানোর চেষ্টা করে থাকে। যদিও জিলা করোনেশনে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ারাই মূলত অন্যান্য স্কুলে বাধ্য হয়ে ভর্তি হয়ে থাকে। এ ধরনের ছবি বাণিজ্যের সাথে জড়িত কোচিংগুলোর মধ্যে রয়েছে এস.এস. সি ফাইনালের প্রায় সবগুলো কোচিং, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিংয়ের মধ্যে ঢাকা কোচিং, ওমেগা, শুভেচ্ছা, সাইফুরস, ইন্টারএইড, স্মরণী, সাকসেস, ইলাক্স, ইউসিসি, আইডিয়াল, একাডেমি এবং ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য রেনেসাঁ, শিক্ষা সাগর, অক্ষর, প্রোগ্রেস, মেরিট, পাঞ্জেরী, শিক্ষালয়, তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সেলিম স্যারের ব্যাচ, পাঞ্জেরী, অক্সফোর্ড এবং ক্যাডেট কোচিংয়ের জন্য শাহীন ক্যাডেট একাডেমী ও চাইল্ড হ্যাভেন প্রভৃতি।

মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে এ ধরনের কোচিং বাণিজ্য ভোক্তা অধিকার আইনের পরিপন্থী বলে কনজুমার রাইটস্ সোসাইটি উল্লেখ করলেও এ ব্যাপারে তাদের কোন কর্মকান্ড নেই বললেই চলে। অথচ খুলনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য একাধিক সংগঠনের কর্মকান্ড বিদ্যমান রয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের এসব কোচিং সেন্টারের ছবি বাণিজ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খুলনার দু'টি প্রথম শ্রেণীর সরকারী স্কুলে ২৪০ করে ৪৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পেলেও কোচিং সেন্টারগুলোর ছবির হিসাবে তা হাজার ছড়িয়ে যায়। কোচিং সেন্টারগুলো নির্দিষ্ট কোন সংস্থার কাছে দায়বদ্ধ না থাকায় বছরের পর বছর ধরে এ প্রতারণার বাণিজ্য অব্যাহত থাকলেও কোন জবাবদিহিতা নেই।

তবে ছবি বাণিজ্যের বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার বললেও বাণিজ্য বলতে নারাজ কোচিং কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে কয়েকটি কোচিং পরিচালক বলেন এর মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হয় ঠিকই কিন্তু কোন প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় না। অবশ্য ভুক্তভোগীরা বলেন বিগত কয়েক বছরের পোস্টার লিফলেটসহ অন্যান্য প্রচারপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলেই এর সত্যতা মিলবে।

নিয়ম নীতি বিসর্জন দিয়ে কতিপয় স্কুল শিক্ষক কোচিং সেন্টারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২৩

নগদ অর্থ উপঢৌকন, পার্সেন্টেজসহ নানান সুবিধা নেওয়ার কারণে খুলনা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের কতিপয় শিক্ষক কোচিং সেন্টারগুলোর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নগরীর কিছু কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ম্যানেজ করে রাখেন। বিনিময়ে ঐসব শিক্ষকদেরকে দেওয়া হয় পার্সেন্টেজসহ হরেক রকমের উপঢৌকন। আর ওইসব শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের ক্লাশের পরীক্ষায় নম্বর বেশী দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু কোচিংয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সেইসাথে ঐসব শিক্ষক বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে কোমলমতি শিশুদের সরকার নিষিদ্ধ অবৈধ গাইড পড়তে বাধ্য করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন স্কুলের প্রথম-দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল মানের নোট পড়েও কোন কোন শিক্ষার্থী কাঙ্খিত ফলাফল করতে পারছে না। পক্ষান্তরে ঐসব শিক্ষকের আশীর্বাদপুষ্ট কোচিংয়ে অথবা নোট/গাইড পড়ে ভাল ফলাফল অর্জন করছে অনেকে। যা নিয়ে অনেক সময় অভিভাবকদের মধ্যে প্রশ্নের জন্ম নিলেও সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তারা প্রতিবাদ করে না। তবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে হতাশা দেখা দেয়। লেখাপড়ার প্রতি আস্থা হারানোর পাশাপাশি অমনোযোগী হবার কথাও শোনা গেছে কারও কারও ক্ষেত্রে। যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর প্রভাব পড়তে পারে বলেও অনেকে মনে করেন। আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ বাণিজ্যের সাথে জিলা-করোনেশন ও কলেজিয়েট গার্লস স্কুল সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক জড়িত বলেও তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়।

একাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলে জানা যায়, যেসব ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের কথা অমান্য করে তাদের নির্দেশিত কোচিংয়ে অথবা বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের গাইড না পড়বে তাদের সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করা হয়। এমনকি এস,বি,এ (বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই) এবং পি,টি (শরীর চর্চা) সহ যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের হাতেই নম্বরগুলো নির্ভর করে সেসব বিষয়ে ইচ্ছামত নম্বর কমিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

যেহেতু এর জন্য কোন উত্তরপত্র বা প্রমাণের কিছু থাকে না সেহেতু এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদেরও কিছু বলার থাকে না। আর এ সুযোগটি গ্রহণ করে কতিপয় শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে কোচিং থেকে এ ধরনের অবৈধ আয় করে যাচ্ছেন। যা নিয়ে সচেতন মহলে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এদিকে নগরীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে ছবি বাণিজ্যের পাশাপাশি পরিসংখ্যান বাণিজ্য চলছে বলেও খোঁজ নিয়ে জানা যায়। নিজেদের কোচিং সেন্টারে ভর্তির জন্য আকৃষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলো এ পরিসংখ্যান বাণিজ্য করে অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে থাকেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। ওইসব কোচিংয়ে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের বলা হয় তার কোচিং থেকে এ বছর জিলা-করোনেশনে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যেসব কোচিং থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীও ভর্তির সুযোগ পায়নি সেসব কোচিং থেকে বলা হয় এবার তাদের ১০০ শিক্ষার্থী চান্স পেয়েছে। কোন প্রকার যাচাই-বাছাই না করেই শুধুমাত্র বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই ওইসব কোচিং কর্তৃপক্ষের মিথ্যা পরিসংখ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদেরকে ভাল স্কুলে ভর্তির লক্ষ্যে কোচিংয়ে ভর্তি করান। তবে কোচিং কর্তৃপক্ষ যে পরিসংখ্যান দিয়ে থাকেন তাতে হিসাব করলে দেখা যাবে প্রতি বছর তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। অথচ খুলনা জিলা ও করোনেশন স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতি বছর ভর্তি হয় ২৪০ করে মাত্র ৪৮০ জন। দীর্ঘদিন ধরে কোচিং সেন্টারগুলোর এ পরিসংখ্যান বাণিজ্য চলে আসলেও এ ব্যাপারটি কেউ ভেবেও দেখেনি। যদিও কোচিং সেন্টার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক সরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা। যদিও নগরীর ৫২ নম্বর হাজী মহসিন রোডের চাইল্ড হ্যাভেন কোচিং সেন্টারের পক্ষে রনজিৎ নাথ বলেন, ক্যাডেট কলেজের সাফল্য সূচক ছবি বাণিজ্যের সাথে তার প্রতিষ্ঠান নয় অন্যান্য কোচিংগুলো জড়িত। কিন্তু কোন কোচিংয়ের নাম উল্লেখ করতে পারেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ দায়িত্ব সাংবাদিকদের'। অপরদিকে গত ২১ নভেম্বর দৈনিক পূর্বাঞ্চলে প্রকাশিত কোচিং নির্ভর শিক্ষার ১৫ পর্বের তথ্যের সাথে অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া গেছে গতকালকের নগরীর একটি সরকারি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায়। ওই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ১২টি প্রশ্নের মধ্যে অধিকাংশই মিলে গেছে মাত্র দু'দিন আগে মির্জাপুর রোডের একটি কোচিং সেন্টারের চূড়ান্ত মডেল টেস্টের প্রশ্নের সাথে। শুধুমাত্র প্রশ্ন নম্বরের অমিল রেখে হুবহু একই প্রশ্নে কিভাবে একটি কোচিং সেন্টারের চূড়ান্ত মডেল টেস্ট হল তা নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এসব বিষয় খাতিয়ে দেখা হলে স্কুলের সাথে কোচিং সেন্টারের হলুদ ও নীল খাম বাণিজ্য রোধ করা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন।

যদিও একটি কোচিং সেন্টারের পরিচালক গতরাতে এ প্রতিবেদককে বলেন, শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার আলোকে স্কুল পরীক্ষার অধিকাংশ প্রশ্নের সাথে মিল রেখে মডেল টেস্ট নেওয়া সম্ভব।

চাকুরী বিধি লঙ্ঘন করে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য, কর্তৃপক্ষ নীরব

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২৪

চাকুরী বিধির ১৭ ধারায় বলা হয়েছে "কোন সরকারি কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তার সরকারি কার্য ব্যতীত অন্য কোন ট্রেডে জড়িত হতে পারবেন না অথবা কোন চাকরী বা কর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না।" কিন্তু এ বিধি লঙ্ঘন করে খুলনার বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে অনায়াসে চালিয়ে যাচ্ছেন কোচিং ব্যবসা। কিন্তু এ ব্যাপারে অজ্ঞাত কারণে নীরবতা পালন করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বেসরকারি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার পাশাপাশি খুলনা মহানগরীর আযম খান কমার্স কলেজ, সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয়, সরকারি এম এম সিটি কলেজ, জিলা স্কুল, করোনেশন স্কুল, খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, বিএল কলেজসহ সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও দীর্ঘদিন ধরে কোচিং বাণিজ্যের সাথে জড়িত রয়েছেন। এর মধ্যে অনেকের আবার চাকুরী শুধুমাত্র সাইনবোর্ড হলেও মূল পেশা কোচিং ব্যবসা। এরকমই একজন শিক্ষক নগরীর তিনটি কোচিং সেন্টারের মালিক। একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক হয়ে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একাডেমিক এ তিন শ্রেণীর কোচিং কিভাবে পরিচালনা করেন তা' নিয়েও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট হলেও কারও যেন কোন তাপ-উত্তাপ নেই। যদিও উক্ত শিক্ষক এ প্রতিবেদককে বলেন, তিনি কোন কোচিংয়ের মালিক নন। তিনি ওইসব কোচিং সেন্টারে ক্লাশ নেন মাত্র। আর যেহেতু অফিসিয়ালি তিনি কোন কোচিংয়ের সাথে জড়িত নন সেহেতু এজন্য কর্তৃপক্ষীয় অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না বলেও তিনি জানান।

এছাড়াও বয়রাস্থ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের জনৈক শিক্ষকের ব্যবস্থাপনায় চলছে প্রফেসরস কোচিং। ওই কলেজের মোঃ মুসা, আশরাফ হোসেন, চঞ্চল, জীবন, রেজা, মনির হোসেন, আযম খান কমার্স কলেজের কামাল হোসেন, পাবলিক কলেজের গোলদার হোসেন, মাওলানা ভাসানি কলেজের নজরুল ইসলাম, করোনেশনের সঞ্জয় কুমার, আনোয়ারা বেগম, শ্রীবাস, গৌতম, আকতারুজ্জামান, হাফিজুর রহমান, সোনাডাঙ্গা প্রি-ক্যাডেটের প্রধান শিক্ষক হযরত আলী, সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন, রমেশ চন্দ্র, কামরুল ইসলাম, শেখর, রেজাউল হক, মিনু বেগম, তপন কুমার, হাসান ইমামসহ নগরীর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার অথবা ব্যাচ। আবার সরকারি বিএল কলেজের সামনে প্রায় অর্ধশত কোচিং সেন্টার গড়ে উঠলেও তার অধিকাংশের সাথেই রয়েছে ওই কলেজের অনেক শিক্ষকের সম্পৃক্ততা।

এসব ব্যাপারে কোচিং না থাকা শিক্ষকদের বক্তব্য হচ্ছে, যারা সরকারি চাকুরী বিধি লঙ্ঘন করে বছরের পর বছর কোচিং ব্যবসা করে অবৈধ টাকার মালিক হচ্ছেন তাদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও নিরীহ শিক্ষকদেরকে অনেক সময় রোষানলে পড়তে হয়। তাছাড়া অবৈধ কোচিং ব্যবসায়ীরাই ভাল শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি পান। পক্ষান্তরে কোচিংয়ের সাথে জড়িত না থাকা শিক্ষকরা ক্লাশে পড়া আদায় করতে গিয়ে কোচিং ব্যবসায়ীদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়। অবৈধ অর্থ আয়ের কারণে সংশ্লিষ্ট স্কুল অথবা কলেজ কর্তৃপক্ষকে যেহেতু কোচিং ব্যবসায়ী শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে তুষ্ট করে থাকেন সেহেতু কোচিং না করা শিক্ষকরা শুধুমাত্র বেতনের ওপর নির্ভর করে চলার কারণে তাদেরকে কর্তৃপক্ষীয় অবহেলায় থাকতে হয়। এসব ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষক সমাজ। যদিও খুলনার জেলা প্রশাসক মোঃ জমসের আহাম্মদ খন্দকার বলেন, তাকে যেহেতু জেলার সার্বিক বিষয় দেখতে হয় সেহেতু শুধুমাত্র কোচিংয়ের ওপর নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সজাগ হওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনার উপ-পরিচালক টিএম জাকির হোসেন বলেন, যেসব শিক্ষক চাকুরী বিধি লঙ্ঘন করে কোচিং ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কারিগরি শিক্ষায়ও কোচিং বাণিজ্য, ঝরে পড়ছে সিংহভাগ শিক্ষার্থী

কোচিং নির্ভর শিক্ষা-২৫

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায়ও চলছে কোচিং বাণিজ্য। সাইনবোর্ডধারী কোন কোচিং না থাকলেও শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে প্রাইভেট পড়ানো হয়। আর যারা প্রাইভেট না পড়বে তারা এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগেই ঝরে পড়ে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্র পরিদপ্তর পরিচালিত ও ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড নিয়ন্ত্রিত দেশের ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুলনায় দু'টি রয়েছে। এর একটি নগরীর ফুলবাড়ী গেটে অপরটি নগরীর গল্লামারিতে অবস্থিত। ফুলবাড়ী গেটের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা টিটিসিতে ১৭টি ট্রেড চালু থাকলেও গল্লামারী অগ্রণী ব্যাংক টাউন সংলগ্ন সরকারি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনিস্টিটিউটে তিনটি ট্রেড চালু রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮ম শ্রেণী পাশের সনদপত্র নিয়েই ভর্তির সুযোগ রয়েছে। মাত্র দু'বছরের মাথায় এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও নবম শ্রেণী থেকেই অনেক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার নজির লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, বিনা বেতনে শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে ভর্তি হলেও গুটিকয়েক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ভালো ফলাফল করা যায় না। যে কারণে নবম শ্রেণী থেকেই অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে ঝরে পড়তে হয়।

এসব বিষয় বস্ত্র পরিদপ্তরের দৃষ্টিগোচর হলে গত বছর ১৩ সেপ্টেম্বর বস্ত্র দপ্তরের পরিচালক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ জারি করা হয়। ওই আদেশ বলা হয় "ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষক/কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়ান এবং জোরপূর্বক প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন। ব্যবহারিক ও ধারাবাহিক পরীক্ষায়ও টাকা আদায় করেন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট ও শিক্ষার পরিবেশ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। ইতোপূর্বেও শিক্ষক/কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট না পড়ান সে বিষয়ে বলা হয়েছে। তা' উপেক্ষা করে ইদানীং শিক্ষক/কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়ান। যার ফলে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট না পড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। এর পরেও যদি প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তাহলে সরকারি বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে"।

ওই অফিস আদেশ পাওয়ার পরও গল্লামারী টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের দু'জন শিক্ষকের কোচিং বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে বলে যানা যায়। যে কারণে এ প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর নবম শ্রেণীতে ৯০জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলেও এ বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ২২জনে।

৯০টি সিটের মধ্যে মাত্র ২২জন পরীক্ষার্থী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্ট

মোঃ নিজাম উদ্দিন বলেন, শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত ও গরিব হওয়ায় তারা অন্যান্য কাজে জড়িয়ে পড়ে। যে কারণে এসএসসিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যায়। তাছাড়া বস্ত্র দপ্তরের উক্ত অফিস আদেশের বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবহিত নন বলেও উল্লেখ করেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের কোন শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট পড়ান কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ক্লাশ সময়ের বাইরে কেউ কোথাও প্রাইভেট পড়ালে সেগুলো তার জানার কথা নয়।

এভাবে সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা কোচিং নির্ভর হওয়ার পাশাপাশি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে খুলনায় যে কোচিং ব্যবসা চলে আসছে তা আদৌ বন্ধ হবে কি না সে বিষয়েও রয়েছে নানা সংশয়। এজন্য কোচিং ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের তীব্র প্রতিযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিরবতাই যে অনেকাংশে দায়ী সে মন্তব্যও করেছেন অনেকে। তবে বেকার যুবকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কোচিং ব্যবসা বন্ধ না হলেও সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের কোচিং ব্যবসা বন্ধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগই যথেষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। এ ক্ষেত্রে আগামী ১৯ ও ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য খুলনার চারটি সরকারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় গার্ড নির্ধারণের ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে বলেও সচেতন অভিভাবকমহল মনে করেন। অভিভাবকদের ওই সূত্রটি জানায়, ভর্তি পরীক্ষার সময় সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের গার্ড না দিয়ে অন্য কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করানো হলে কোচিং বাণিজ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যিনি কোচিং মালিক তিনিই আবার স্কুল শিক্ষক হিসেবে গার্ড দিয়ে নিজ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে থাকেন। কখনও আবার একই কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের একসাথে ফরম কিনিয়ে এক স্থানে বসানোর ব্যবস্থা করে সহকর্মী শিক্ষকদের দিয়ে নিজ কোচিংয়ের শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল করিয়ে নিতে সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

অপরদিকে গত ৩ নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত দৈনিক পূর্বাঞ্চলে কোচিং নির্ভর শিক্ষার ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর অভিভাবক ও কোচিং সেন্টারগুলোতে আলোচনার ঝড় উঠলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যেন এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মূল বিষয়টিকে অন্যদিকে প্রবাহের চেষ্টা চলছে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে। এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে নগরীর গগনবাবু রোডের সবুরননেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ওই স্কুল সম্প্রতি একটি কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে মডেল টেস্ট নেওয়ার খবর দৈনিক পূর্বাঞ্চলে প্রকাশ হলে বিষয়টি অন্য এক শিক্ষকের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির উপস্থিতিতে গত পরশু অনুষ্ঠিত এক রুদ্ধ দ্বার সভায় স্কুল ভাড়া দেওয়ার জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষককে দায়ী করা হয়। যা নিয়ে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে নানা গুঞ্জন। স্কুল রোডের একটি কোচিং সেন্টারের মালিকের ইন্ধনেই বিষয়টি অন্যদিকে চাপানোর চেষ্টা চলছে বলেও জনশ্রুতি রয়েছে।

টিআইবি'র কার্যক্রম

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি এবং জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুনের কার্যকর প্রয়োগের চাহিদা সৃষ্টি ও সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি নাগরিক সম্পৃক্ততা বিশেষ করে গণমাধ্যমকর্মীদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় উৎকর্ষ সাধন ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদানসহ বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে 'টিআইবি'র পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন ২০০৬-২০১০' শীর্ষক সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

ISBN: 978-984-33-7980-1

9 7 8 - 9 8 4 3 3 7 9 8 0 1